সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রিচত্বারিংশ ভাগ

—— ∘ ——

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

—— ∘ ——

কলিকাতা
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩৪৩

ত্রিচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ত্রিচত্বারিংশ ভাগ]

মারাঠা জাতির অভ্যুদয় *

আমাদের এই বাঙ্গালার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের সম্বন্ধ একটি আশ্চর্য জিনিষ। দেশ দুটি ভারতের বিপরীত দিকে স্থিত। ভাষা ও সাহিত্যে তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বাঙ্গালীরা মাছ, মাংস খায়, শাক্ত ব্রাহ্মণ পর্যন্ত; কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে মাংস ত দূরে থাকুক, মাছ পর্যন্ত খাইলে সে বাড়ীতে জলাচরণীয় চাকর থাকিবে না। একমাত্র মারাঠা অর্থাৎ কৃষি বা অসিজীবী জাতের হিন্দুদের মধ্যে পাঁঠার মাংস এমন কি মনু-নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস পর্যন্ত খাইবার প্রথা আছে, কিন্তু ভদ্রভোজ ও সার্ব্বজনীন নিমন্ত্রণে নিরামিষ খাদ্য বিনা চলে না।

অথচ বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তেমন অন্য কোন দুই প্রদেশের মধ্যে হয় নাই। নবাবী আমলে বর্গীর হাঙ্গামা ঝড়ের মত বাঙ্গালার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল ও চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মতিলাল ঘোষ ও তিলকের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, বা বঙ্গীয় শিক্ষিত জনমতের উপর গোখলের রাজত্ব না ধরিয়া, এখানে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই দুই জাতির সমন্বয় একটু ভাবিয়া দেখুন। রাজপুতানার পরই মহারাষ্ট্র-ইতিহাস বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রমেশ দত্ত রাজপুত-জীবনসন্ধ্যার পরই মারাঠা-জীবনপ্রভাতের কিরণ দেখিয়া উৎফুল্ল হন। বঙ্গীয় কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

> মহারাষ্ট্র জাতি—শয়নে ও যার
> শিয়রে তুরঙ্গ, কটিবন্ধে অসি,
> যুবরাজ, আজি সে জাতি কোথায়?

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বৃহৎ সাহিত্য-প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তে কারওয়ার বন্দরে সেই "তোমায় চিনি ওগো বিদেশিনী"-কে দেখিয়াছিলেন, গুজরাতের আহমদাবাদের শাহীবাগের পুরাতন প্রাসাদে ক্ষুধিত পাষাণের মধ্যে অতীতের জীবন্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া "সব ঝুঁঠা হ্যায়" এই সত্য বুঝিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের কর্মজীবন একটি মারাঠী রাজ্যেই অবশেষ হয়। আর বঙ্কিমের অনুবাদক ও অনুকারিগণ মারাঠা

---

* ১৩৪২, ৬ই চৈত্র তারিখে সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়বক্তৃতা মালার প্রথম বক্তৃতা।

সাহিত্যে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। অল্পদিন আগে পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে বাঙ্গালীর বড় আদর ছিল, যেমন ৩০ বৎসর পূর্বে পঞ্জাবে ছিল।

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের শেষে মারাঠা জাতির রাজনৈতিক আবির্ভাব ও শক্তিবিস্তার একটি অতুলনীয় ঘটনা। আমরা সাধারণতঃ শিখ স্বাধীনতা ও মারাঠা শক্তির উদয়কে এক রকম ঘটনা বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী। শিখেরা একটি মাত্র প্রদেশে আবদ্ধ ছিল, তাহাদের সংগ্রাম মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে হয় নাই, আফগান দুর্‌রাণী রাজের সঙ্গে হয়; এবং শিখ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীনতা অর্ধ শতাব্দীরও কম সময় স্থায়ী ছিল। অপর পক্ষে, মারাঠা শক্তি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুঝিয়া অবশেষে দিল্লীতে রাজার উপর রাজা হইয়া বসে; এই শক্তির প্রভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করে; আর মারাঠা স্বাধীন রাজত্ব ১৬৬৭ হইতে ১৮১৭ পর্যন্ত ১৫০ বৎসর ব্যাপিয়া জীবিত ছিল। বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে সত্যই গর্ব করিয়াছেন "মারাঠারা তাহাদের বিজয়দুন্দুভি আটক হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বাজাইয়াছিল।" ভারতের অন্তিম উত্তর-পূর্বে বঙ্গ, দক্ষিণ-পশ্চিমে গোয়া পর্যন্ত মারাঠা-শক্তির তেজ অনুভব করিয়াছিল।

তাহা ভিন্ন, আর একটা পার্থক্য আছে। শিখসংগঠন একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মাত্র কাজ, মারাঠা রাষ্ট্র একটি জাতি বা নেশনের সৃষ্টি, ইহা সর্ব ধর্মের, সর্ব জাতের অর্থাৎ বর্ণের মিলনের ফল। আর রাষ্ট্র-নীতি-শাস্ত্রের দিক দিয়া দেখিলে মারাঠী শাসন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শিখদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক উচ্চ দরের ও অধিক কর্মক্ষম। ফলতঃ শিখেরা যোদ্ধামাত্র ছিল, শাসনকর্তা নহে, কিন্তু মারাঠারা এ উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

কিন্তু যদিও মারাঠাদের উদয় মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির শেষ যুগে মাত্র ঘটিয়াছিল, তথাপি উহারা অখ্যাত নগণ্য নবীন ভূঁইফোড় জাতি নহে। এই জাতির গরিমাময় অতীত ইতিহাস ছিল। সম্ভবতঃ অশোক এবং খরবেলের শিলালেখের রাষ্ট্রি জাতি এই মহারাষ্ট্র-বাসিগণ। তাহার পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রকূট রাজগণ নিজেদের বিখ্যাত রাজ্য স্থাপন করিয়া উত্তর-ভারত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারও পরে, যাদব বংশ মহারাষ্ট্র দেশ ব্যাপিয়া শেষ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন, এবং এই বংশ মুসলমান আক্রমণে নষ্ট হইলেও, ইহার অনেক শাখা নানা স্থানে জমিদারের মত বহুদিন পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকিয়া পূর্বপুরুষদের গৌরব-স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছিল। যাদব বংশের এইরূপ একটি শাখায় শিবাজীর মাতা জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই বলেন যে যাদব এবং বিজয়নগর এই দুইটি স্বাধীন কিন্তু তৎকালে বিধ্বস্ত বিখ্যাত হিন্দুরাজ্যের স্মৃতিই শিবাজীকে স্বাধীন স্বরাজ্য স্থাপন করিতে অনুপ্রাণিত করে। বিজয়নগরের প্রভাব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। তাহার সহিত শিবাজীর সম্বন্ধ যোজনা করা কঠিন।

যাহা হউক, মারাঠা জাতি ও মারাঠা সরদার—স্বাধীন রাজা না হইলেও—আবহমান কাল হইতে ঐ দেশে ছিল। মারাঠী প্রধানগণ, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজা বা সামন্ত পদ-বাচ্য, বহমানী সাম্রাজ্যের সময়ে এবং তৎপরে অহমদনগরের

নিজামশাহী সুলতানদের সেনা-বিভাগে কাজ করেন এবং জাগীর ভোগ করেন। কিন্তু এসব বিক্ষিপ্ত, অপ্রধান, প্রায় অবজ্ঞাত মারাঠা সরদারগণ রাজ্যগঠনে অক্ষম ছিলেন, এবং সেরূপ কাজের কল্পনাও করেন নাই।

মুসলমান যুগে মারাঠা সামরিক শক্তির আদর এবং বৃদ্ধি আরম্ভ হইল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে, ঠিক আকবরের মৃত্যুর পর, যখন জাহাঙ্গীরের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া মালিক অম্বর অশেষ বাধা ও বিপত্তি জয় করিয়া নিজামশাহী রাজবংশকে খাড়া করিয়া রাখিলেন। বিজাপুরের সুলতান প্রথম প্রথম তাঁহার সহায়ক ছিলেন; অম্বর মুঘলদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ করেন এবং এই সব যুদ্ধে মিতাহারী দ্রুতগামী হালকা মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য লাগাইয়া মুঘলদের ভারি বর্মাবৃত ধীরগামী বিলাসপ্রিয় অশ্বারোহী সৈন্যদের রোধ করিতে, তাহাদের রসদ লুটিতে এবং পথচলা বন্ধ করিতে সক্ষম হন। তখন মারাঠারা সেই নবীন যুগেও নিজেদের যে একটা সামরিক মূল্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিল। উচ্চ বেতন পাওয়ায় তাহাদের সরদারগণ নিজ নিজ অনুচর দলের সংখ্যাও ক্রমে বেশ বাড়াইলেন।

আর সেই সময়েই মারাঠা সরদারদের হাত করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য অহমদ-নগরের সুলতান এবং মুঘল বাদশার স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে নিলাম চলিতে লাগিল। শাহজীর শ্বশুর, শাহজীর খুড়া প্রভৃতি, এবং পরে স্বয়ং শাহজী একবার এপক্ষে যোগ দেন, আবার বেশী জাগীর ও টাকার প্রলোভনে ওপক্ষে সৈন্যদল লইয়া পার হন। এইরূপ কাজ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালময় চলিয়াছিল। ফলে মারাঠা নেতা ক'জন অত্যন্ত বড় এবং দেশমান্য হইয়া উঠিলেন, শাহজী তাহারই চরম সীমায় পৌঁছিয়া, মালিক অম্বর ও তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর অহমদনগরের বিনষ্ট-প্রায় রাজবংশে 'কিং-মেকার' অর্থাৎ ইচ্ছামত রাজ-পুত্তলিকা-সৃষ্টিকর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন; ঠিক মালিক অম্বরের পর শাহজীর মত কোন প্রবল ও প্রধান শত্রু মুঘলদের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে মাথা তুলে নাই। সমস্ত দেশটা তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত।

শাহজীর এই মহত্ত্ব ১৬২৯ হইতে ১৬৩৬ পর্যন্ত সাত বৎসর মাত্র ছিল। তাহার পর বাদশাহ শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, তিনটি বৃহৎ সুচালিত সেনাদলের মিলিত চেষ্টার ফলে সব শত্রুকে দমন করিয়া, শাহজীকে প্রায় পথের ভিখারীর মত দশায় আনিয়া মহারাষ্ট্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার মহারাষ্ট্র দেশে রাজা হইবার আশা সমূলে নষ্ট হইল। তিনি পুণা জেলার জাগীর পুত্রকে দিয়া নিজে নিজামশাহী-রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিজাপুর রাজের চাকরি লইলেন, এবং মহারাষ্ট্র হইতে অতিদূরে কর্ণাটক প্রদেশে—অর্থাৎ মহীশূর, আর্কট জেলা এবং বেলগাঁও অঞ্চলে, জাগীর অর্জন করিলেন। তিনি বিজাপুর রাজ্যে সর্বপ্রধান হিন্দু সামন্তের পদে উঠিলেন বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহার কোন ক্ষমতাই রহিল না। স্বদেশে স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যদি তাঁহার কখন ছিল, তবে তাহা ১৬৩৬ সালে একেবারে দূর হয়। এরূপ স্বরাজ্য-স্থাপন তাঁহার পুত্র শিবাজীর কীর্তি, সে কাহিনী আর একদিন বলিব।

কিন্তু মারাঠা জাতীয় অভ্যুদয়কে শুধু কোন মহাপুরুষের কর্ম বলিলে অসত্য হইবে। একথা মানি যে, মহাপুরুষ না জন্মিলে এই কার্য সফল হইত না, এবং যখন মহারাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে মহাপুরুষের অভাব হইল তখনই মারাঠা স্বাধীনতা অস্ত গেল। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে জাতীয় জন-সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি গুণ না থাকিলে, সমস্ত দেশময় একটা জাগরণ দেখা না দিলে, প্রবল মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠাদের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ এবং সাম্রাজ্য-স্থাপন সম্ভব হইত না। দেড় শ বৎসরের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব শক্তি শুধু একজন মানুষের উপর, মাত্র একপুরুষব্যাপী কর্মীর উপর, নির্ভর করিয়া টিঁকিতে পারে না,—যেমন রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল, কারণ শিখরাজ্য শুধু ব্যক্তিগত সৃষ্টি ছিল।

সুতরাং মারাঠাদের রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের বীজমন্ত্র হইতেছে মারাঠা জাতীয় চরিত্র। ইহাই আমরা এখানে ভাল করিয়া দেখিব। মারাঠা চরিত্রে আত্মনির্ভরতা, সাহস, অধ্যবসায়, কঠোর আড়ম্বর শূন্যতা, সাদাসিদে ব্যবহার, সামাজিক সাম্য এবং প্রত্যেক মানবেরই আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এই সব মহাগুণ জন্মিয়াছিল। তের শ বৎসর আগে চীনা পর্যটক ইউয়ান চুয়াং মারাঠা জাতিকে এইরূপই চক্ষে দেখিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—'এই দেশের অধিবাসীরা তেজী ও যুদ্ধপ্রিয়; উপকার করিলে কৃতজ্ঞ থাকে; অপকার করিলে প্রতিহিংসা খোঁজে। কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিলে তাহারা তজ্জন্য ত্যাগস্বীকার করে, আর কেহ অপমান করিলে তাহাকে বধ না করিয়া ছাড়ে না।'

"মারাঠা সৈন্যগণ সাহসী, বুদ্ধিমান্ এবং পরিশ্রমী, রাত্রে নিঃশব্দে আক্রমণ করা, অথবা শত্রুর জন্য ফাঁদ পাতিয়া লুকাইয়া থাকা, সেনাপতির মুখ না চাহিয়া নিজ বুদ্ধিবলে নিজকে বিপদ হইতে মুক্ত করা, এবং যুদ্ধের অবস্থা বদলানর সঙ্গে সঙ্গে রণ-প্রণালী বদলানর ক্ষমতা—একাধারে এই গুণগুলি একমাত্র আফগান এবং মারাঠা জাতি ভিন্ন এশিয়া মহাদেশে অন্য কোন জাতির নাই।...স্ত্রী স্বাধীনতার ফলে মহারাষ্ট্র দেশে জাতীয় শক্তি দ্বিগুণ হইল এবং সামাজিক জীবন অধিকতর পবিত্র ও সরস হইল। দেশের ধর্মও এই সামাজিক সাম্যভাব বাড়াইয়া দিল। এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা গেল যে মহারাষ্ট্র দেশে ভাষায় ধর্মে চিন্তায় জীবনে এক আশ্চর্য একতা ও সাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু রাষ্ট্রীয় একতার অভাব ছিল; তাহাও পূরণ করিলেন শিবাজী।"

উপরের কথাগুলি দ্বারা আমি অনেক পূর্বে এক গ্রন্থে মারাঠা চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করি। এ কথাগুলি এখনও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের মত গুরুতর কার্যের পক্ষে এইসব ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আরও মূল্যবান্ কয়েকটি সুবিধা আবশ্যক; তাহা ছিল বলিয়াই মারাঠারা সফলতায় পৌঁছিতে পারিয়াছিল। সেই সুবিধাগুলির প্রথমে ইংরাজী নাম দিয়া পরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব—**self-sufficing villages, experience of communal labour, local autonomy** অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে প্রত্যেক গ্রামে নানা বর্ণের নানা ধর্মের অধিবাসীরা একত্র মিলিয়া কর্মবিভাগ করিয়া লইয়া সমস্ত গ্রামের যাবতীয়

ব্যাপার সম্পন্ন করিত; রাজাকে গ্রামের মোট খাজানা দিয়াই তাহারা খালাস, আর সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপার তাহারা নিজেরাই সর্বোচ্চ অধিকারী রূপে নির্বাহ করিত, বাহিরের কাহারও মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত না, বাহিরের কেহ গ্রামের জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। এইগুলিকে Indian Village Communities বলা হয়, ইহার প্রত্যেকটি একটি ছোট প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের মত, a petty republic. ইউরোপে মধ্যযুগের মাঝামাঝি এইরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়; ইটালিতে এইরূপ নাগরিক গণতন্ত্র প্রচুর খ্যাতিলাভ করে, কিন্তু সেগুলি আকারে জন-সংখ্যায় এবং যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষমতায় ছোট ছোট রাজ্যের সমান ছিল। মহারাষ্ট্রে প্রতি গ্রামে গ্রাম্য কর্মচারিগণের পদ পুরুষানুক্রমে চলিত, কখন কখন বা বিক্রয় হইত। কিন্তু তাহাতে গ্রামের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটিত না। গ্রামবাসীরাই জুরী হইয়া ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করিত এবং জুরীর সিদ্ধান্তে সকলে সহি বা ঢেড়া দিয়া (নিরক্ষর লোকের পক্ষে লাঙ্গল বা ছোরার ছবি আঁকিয়া) তাহা দলিলে পরিণত করিত। এগুলির ফার্সী নাম মহজর-নামা। মধ্যযুগের ইংলণ্ডের গ্রাণ্ড জুরীর মত, কোন কোন মারাঠী মহজরে ৫০।৬০ জন লোকের স্বাক্ষর বা টীপ আছে।

সুতরাং প্রতি গ্রামই বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ত্যাগ করিয়া নিজ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাকিয়া পুরুষানুক্রমে সময় কাটাইত। গ্রামের লোকজন দৈনিক স্বায়ত্তশাসন করিয়া করিয়া পাকা হইয়া গিয়াছিল। জনসঙ্ঘ একত্র হইয়া সাধারণের হিতকর কার্যগুলি কিরূপে করিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা এই জাতির গ্রামবাসীদের মজ্জাগত হইয়াছিল। সংগঠন বলিয়া যে একটা কথা আজকাল আমরা শুনিতেছি, তাহা মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে অতি পুরাতন, অতি অভ্যস্ত জিনিষ ছিল। রাষ্ট্রশাসন ও নেশন-গঠনের পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ। মহারাষ্ট্রে ইহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর ইউরোপে এইরূপ কমিউন্ উদ্ভব হয়, তাহার বিবরণ Vinogradoffএর লেখায় সকলে জানিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা মহারাষ্ট্রের মত বহু শতাব্দী ধরিয়া টেঁকে নাই।

এইরূপে মহারাষ্ট্রে সমাজ, নীচু হইতে গঠিত হইয়া উঠে। এইরূপ গঠনই স্থায়ী এবং লোকহিতকর। উপরের সর্বশক্তিমান্ কর্তা কোন মুসোলিনী বা আলাউদ্দীন খিলজী, হুকুম দিয়া সমস্ত দেশবাসীদের ক্রীতদাসের মত একটি পথবিশেষে চালাইলেন, ইহাতে নেশন গঠিত হয় না, এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না—উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ। সে দুর্ভাগ্য মারাঠা জাতির হয় নাই; তাই আজ ব্রিটিশ বিজয়ের পরও মারাঠা জাতি ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রসর জাতির সমকক্ষ হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত জনশক্তি ও সঙ্ঘপ্রাণ কখনও বিলোপ পায় না।

এই ত গেল ঐ লোকদের জাতীয় চরিত্র, এখন ইতিহাসে ইহার ফল দেখা যাক্। অতি আধুনিক মারাঠা লেখকগণ বলেন যে মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দু স্বরাজ বা স্বাধীন মারাঠী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা ও চেষ্টা শাহজী হইতে আরম্ভ হয়, এবং শিবাজী পিতার এই নীতিটি

চুরি করিয়া তাঁহারই আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু শাহজীকে এই গৌরব দিতে ইতিহাস অস্বীকার করে। তিনি কোন বিষয়েই শিবাজীর পথ-প্রদর্শক ছিলেন না এবং অনেক বিষয়ে ঠিক বিপরীত। শিবাজীর কীর্তির মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রহিবে।

এখন দেখা যাউক, এই মারাঠা জাতিকে লইয়া শাহজী কি করিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে তিনি অহমদনগরের সুলতানদের কর্মচারী মাত্র ছিলেন, এবং সেই রাজবংশে অবনতি ধরিবার পর মালিক অম্বর যেমন একটা রাজপুত্তলিকা খাড়া করিয়া নিজে নামে রাজপ্রতিনিধি থাকিয়া কার্যতঃ সমস্ত রাজশক্তি চালাইতেন, সেই মত মালিক অম্বরের মৃত্যু হইলে শাহজীও অপর এক রাজপুত্রকে খাড়া করিয়া তাহার মাথায় রাজছত্র ধরিয়া, নিজে দেওয়ানরূপে যতটা পারিলেন দেশ শাসন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তিনি কখনও নিজেকে রাজা বা স্বাধীন শক্তি বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, সর্বত্রই পরের চাকর এই আখ্যা দেন। আর তাঁহার জীবনের এই প্রথম অংশে (১৬২৯-৩৫) তিনি মালিক অম্বরের মতই বিজাপুররাজ হইতে অনেক সাহায্য পান, এবং সেই সহায়তার বলেই নিজ নবজাত ক্ষুদ্র শক্তিকে মুঘল বাদশার বিরুদ্ধে খাড়া করিতে সাহসী হন।

শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, মারাঠা নেতার এই চেষ্টা সমূলে নষ্ট করিয়া, তাঁহাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত ও কর্ণাটকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য সন্ধি করান (১৬৩৬ খৃঃ)। এই শেষ জীবনে (১৬৩৬-৬৪) শাহজী বিজাপুরের জাগীরদার মাত্র থাকিয়া প্রভুর নামে কর্ণাটকের নানা স্থান (তাঞ্জোর নহে—তাঁহার কর্তৃক তাঞ্জোর জয় হয় এটা পুরাতন ভ্রান্তবিশ্বাস) জয় করিয়া তাহার কিয়দংশ নিজ জাগীররূপে পান। কিন্তু এখনও তিনি চাকর মাত্র, স্বাধীন রাজা নহেন। এই সময়ে তাঁহাকে ঠিক গোলকুণ্ডার দেওয়ান মির জুমলার সমান পদস্থ বলিয়া বর্ণনা করিলে সত্য হইবে।

ফলতঃ, যদিও শাহজী শেষ বয়সে খুব ধনী ও ক্ষমতাশালী হন, যদিও মুরার জগদেবের মৃত্যুর পরে বিজাপুর সুলতানের রাজ্যে শাহজীই হিন্দু জাগীরদারদের মধ্যে সবপ্রথম বলিয়া গণ্য হন, যদিও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র একোজী তাঞ্জোর রাজ্যের রাজা হন, তথাপি শাহজীকে হিন্দু-স্বরাজের প্রতিষ্ঠাতা, ছত্রপতিত্বের আদর্শ, বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

বিখ্যাত বিজয়নগর সাম্রাজ্য ১৫৬৫ সালের পর আরও সত্তর বৎসর হীন-প্রভায় ও খণ্ডাকারে চলিতেছিল, কিন্তু ক্রমেই উহার রাজশক্তির দুর্বলতা, মণ্ডলদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রভৃতি বাড়িয়া গিয়া উহার রক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং যখন শাহজহান ১৬৩৬ সালের সন্ধি দ্বারা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের উত্তর ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন এই দুইটি মুসলমান রাজার পক্ষে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অভিযান পাঠাইয়া কর্ণাটক জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় রহিল না। অর্থাৎ ভূতপূর্ব বিজয়নগর রাজ্যের খণ্ড প্রদেশগুলি লইয়া এই দুই সুলতানের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি এবং প্রভু মুঘলবাদশার নিকট কাঁদিয়া নালিশ করা আরম্ভ হইল। এই সব অভিযান ১৬৩৭ সাল হইতে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত বেগে

চলিয়াছিল। তাহার পর বিজাপুর রাজশক্তিতে ঘুণ ধরিল, আদিলশাহী ক্ষমতা-বিস্তার মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়া শেষে থামিয়া গেল; শুধু শাহজী মহীশূরে এবং অপর ক'জন সরদার পূর্ব-কর্ণাটকে অর্থাৎ আর্কট জেলা দুইটিতে কোন কোন স্থান জয় করিয়া জাগীর স্থাপন করিলেন। গোলকুণ্ডা রাজ্যেও মিরজুমলার কর্মত্যাগ (১৬৫৬), কুমার আওরংজীবের আক্রমণ এবং রাজপরিবারে কলহের ফলে বিজয়বাহিনী থামিয়া গেল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শাহজী কর্তৃক হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা ত হয়ই নাই, বরং তিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ লুঠ ও ভাগাভাগি কাজে সুলতানদের অন্যান্য কর্মচারিগণের সহিত প্রচুর সহায়তা করেন। ইহাকে শিবাজীর জীবনের আদর্শ বলা যাইতে পারে না।

নিজ মহারাষ্ট্র দেশের সঙ্গে শাহজীর সম্বন্ধ প্রথম সামান্য মাত্র—অর্থাৎ মুসলমান সুলতানের ভৃত্যরূপে ছিল; এবং ১৬৩৬ হইতে এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। তাঁহার জন্মভূমিতে শুধু দেড় লাখ টাকার জাগীর মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহা তিনি পুত্র শিবাজীকে দিয়া চলিয়া গেলেন। জন্মভূমিতে তিনি কখনও নিজ মাথার উপর রাজছত্র ধারণ করেন নাই, জমিদার মাত্র ছিলেন; পুণা, চাকণ, সুপা, বারামতী এই গ্রামগুলি তাঁহার থানা মাত্র ছিল, ১৬২৯—১৬৩৫ সালের মধ্যে তাঁহার অধিকার করা সব দুর্গ মুঘলেরা কাড়িয়া লইয়াছিল।

শাহজী ও শিবাজী যে এক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হন নাই, তাঁহাদের জীবনের কাজ যে পৃথক পৃথক্ শ্রেণীর, তাহা একটি বিষয় ভাবিলেই সুস্পষ্ট হইবে। ১৬৫৪ সালের পর হইতে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক গগনে মুঘল সূর্য অসহ্য দীপ্তিতে বিরাজমান ছিল, ছোটবড় সকলেই বুঝিল যে দিল্লীর বাদশাহই আমাদের সর্বেসর্বা প্রভু, নামে অন্য কেহ সুলতান হউন না কেন। শাহজী ১৬৩৬ সালের পর হইতে কখনও মুঘলদের সংঘর্ষে আসেন নাই, এমন কি বিজাপুর সুলতানেরও বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়ান নাই। এরূপ রাজভক্ত জাগীরদার কিরূপে বিদ্রোহী স্বাধীন শিবাজীর পথ-প্রদর্শক হইবেন?

সুতরাং "হিন্দবী স্বরাজ" শিবাজীর নিজস্ব কল্পনা, একমাত্র শিবাজীর সফল প্রচেষ্টা। তাহা শিবাজীর জীবন সম্যক্ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব।

শ্রীযদুনাথ সরকার

শিবাজী *

মহারাষ্ট্র দেশের সর্বজনপূজ্য সাধু রামদাস স্বামী নিজ দীর্ঘ জীবনের অন্তে তাঁহার শেষ পত্রে লিখিয়াছিলেন—

শিব রাজার রূপ স্মরণ কর,
শিব রাজার দৃঢ় সাধনা স্মরণ কর,
শিব রাজার কীর্তি স্মরণ কর,
ভূমণ্ডলে।
সকল সুখ ত্যজিয়া,
যোগ সাধন করিয়া,
রাজ্য সাধনায় তিনি কেমন
দ্রুত অগ্রসর হন।
শিব রাজাকে স্মরণ রাখিও,
জীবনকে তৃণ সমান মনে করিও,
[তবেই] ইহলোকে পরলোকে তরিবে,
কীর্তিরূপে।

আড়াই শ বৎসরেরও অধিক কাল হইল এই কথাগুলি লিখিত হয়, কিন্তু আজও বিপুল মারাঠা জাতীয় জনসমাজে ইহা জপ-মন্ত্র স্বরূপ হইয়া আছে। অন্যপ্রদেশীয় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকও ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলতঃ যদি আমরা শিবাজীর আরম্ভের পুঁজিপাটার সহিত তাঁহার জীবনশেষে সঞ্চিত কীর্তিকলাপ তুলনা করি, অথবা তাঁহার দেহত্যাগের পরও তাঁহার মৃত্যুহীন আত্মা ও স্মৃতির জীবন্ত প্রভাব স্মরণ করি, তবে জগৎ ইতিহাসের সর্বোচ্চ কয়েকজন মহাপুরুষের মধ্যে তাঁহাকে স্থান দিতেই হইবে।

মারাঠাজাতির মধ্যে শিবাজীর স্মৃতি দেবতুল্য সম্মানের সহিত পূজা করা হয়। তাঁহার জাত্ অর্থাৎ বর্ণ ছিল মারাঠা; যদিও মারাঠাদের বড় লোকেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে, তথাপি ইহাদের অনেকে কৃষিজীবী বা প্রহরীর কাজ করিয়া দিন কাটায়, এবং মারাঠা জাতের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের কুন্‌বী অর্থাৎ কৃষকের সমান বলিয়া সমাজে গণ্য করা হয়, এবং এই দুই জাতের আচার ব্যবহার প্রায় এক মতই।

ইহা সত্ত্বেও শিবাজীর কীর্তিকলাপ এত মহান্ যে এ প্রদেশের অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ জাতও তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন; তাঁহার তিরোধানের সময় অকালে সূর্যগ্রহণ ভূমিকম্প প্রভৃতি ঠিক যীশুর তিরোধানের মত, নৈসর্গিক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। মহারাণা প্রতাপসিংহের মতই শিবাজী এবং তাঁহার প্রধান অনুচরগণ শত শত নাটক নভেল প্রণোদিত করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। জাতীয় বীর, রাষ্ট্রনেতা, নেশান-গঠনকারী আদিপুরুষ, এই অভিধেয়ের প্রত্যেকটিই তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

---

* ১৩৪২, ৭ই চৈত্র তারিখে পরিষদ-মন্দিরে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতা।

তাঁহার কার্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই যুগের ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা চিন্তা করিলে, তবে তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ পুরুষকার কিরূপে ইতিহাসকে বদলাইয়া দিতে পারে, জনসঙ্ঘকে নূতন পথে চালাইয়া দিতে পারে, ভারতে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শিবাজী।

শিবাজীর ইতিহাসের কাঠামো অনেকদিন হইল আমাদের জানা আছে। গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই এতদিন নানা ভাষায় অনুবাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু গত উনিশ বৎসরের গবেষণার ফলে আমরা শিবাজীকে আরও সত্য, আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিয়াছি। এখন আর গ্রাণ্ট ডফের কাহিনীতে সন্তুষ্ট থাকা চলে না। গ্রাণ্ট ডফের অজানিত কতকগুলি প্রথমশ্রেণীর মৌলিক উপাদান অতি অল্পদিন হইল আমাদের হস্তগত হওয়ায়, তাঁহার রচিত শিবাজী-চরিতে বিপ্লব-সমান পরিবর্তন ঘটাইয়া দিয়াছে। প্রথম আবিষ্কার, জয়পুরের মীর্জারাজা জয়সিংহের সমস্ত চিঠি-পত্র ; ইহাতে ১৬৬৫-১৬৬৭ পর্যন্ত শিবাজীর কার্যকলাপ অতি বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় আমরা জানিয়াছি। দ্বিতীয়, কুমার আওরংজীবের মুন্সী কাবিলখাঁর রচিত আদাব্-ই-আলমগিরিতে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত এই মুঘল রাজকুমার এবং শাহজী ও শিবাজীর পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণিত আছে। শিবাজী এবং তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারীর ফার্সী পত্র বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক হস্তলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। বিজাপুরের সভাপণ্ডিত জহুর-বিন-জহুরীর মুহম্মদনামা এবং অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত ফার্সী ফর্মান ও সনদ আবিষ্কার হওয়ায়, শাহজী এবং তরুণ শিবাজীর ইতিহাস এখন সমসাময়িক দলিলের দৃঢ় ভিত্তিতে খাড়া করা যায়। পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ (Francois Martin)এর দিনলিপি হইতে মারাঠা বীরের কর্ণাটক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ এবং তাঁহার শিবিরের চাক্ষুষ বর্ণনা আমরা পাইয়াছি (প্যারিস হইতে নকল আনিয়া ১৯২৪ সালে আমি ইহা প্রথম প্রকাশ করি)। পর্তুগীজ ভাষায় গোয়া নগরে যে সব কাগজপত্র আছে তাহা নিঃশেষে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ছাপিয়া, শ্রীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ পিস্থুর্লেঁকর মহাশয় শিবাজীর জীবনের এই দিকটার উপর অনেক নূতন আলোক পাত করিয়াছেন। আর মারাঠী ভাষায় লিখিত জেধে বংশের শকাবলীতে আমরা সে সময়ের অনেক ঘটনার সঠিক তারিখ এবং সূক্ষ্ম বিবরণ—যদিও অল্প কথায়—পাইয়াছি। ইহা অমূল্য উপাদান। সংস্কৃতভাষায় তৎকালে লিখিত শিবভারতম্ পর্ণালপর্বতগ্রহণাখ্যানম্ এবং শিবরাজরাজ্যাভিষেককল্পতরু এই তিনখানি ইতিহাস অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। আর ফার্সী ভাষায় মাসির্-এ-আলমগীরী নামক সরকারী ইতিহাস ডফ্ সাহেবের অজ্ঞাত ছিল।

এই ত গেল নূতন আবিষ্কার। তাহার পর ডফের জানিত উপকরণ অধিক যত্নের সহিত নিঃশেষে ব্যবহার করিয়া, তিনি যাহা ছাড়িয়াছেন এরূপ অনেক কাজের কথা ও তারিখ পাওয়া গিয়াছে। এই উপকরণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বন্দরের ইংরাজ ও ওলন্দেজ কুঠীর পত্র, ভীমসেনের ফার্সী আত্মকাহিনীর মূল গ্রন্থ প্রভৃতি প্রধান। তথাকথিত "রায়গড় লাইফ্ অব্ শিবাজী" অর্থাৎ মালকরে বখর্ ; এটা এখন অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে আমরা আগাগোড়া সংশোধন করিতে পারি। ইহার ফলে শিবাজীর ইতিহাস

একেবারে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার সত্যস্বরূপ এতদিনে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু ইতিহাস ও জীবন কাহিনী একজন মানুষের বাহ্য আকার ও কর্মগুলি মাত্র আমাদের দেখায়। তাঁহার চরিত্র ও জীবনীশক্তির ক্রিয়া বুঝিতে হইলে এই সব বাহ্য ঘটনার উপর ঐতিহাসিক দর্শন, যাহাকে Philosophy of History বলে, তাহার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

শিবাজীর চরিত্রের যে বর্ণনা আমি পূর্ব এক গ্রন্থে করিয়াছি, তাহাই সম্মুখে রাখিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিব—

"আশ্চর্য সফলতা ও অতুলনীয় খ্যাতিতে মণ্ডিত হইয়া শিবাজী সেই যুগের ভারতে সর্বত্রই হিন্দুদের চক্ষে এক নূতন আশার উষাতারারূপে দেখা দিলেন। একমাত্র তিনিই হিন্দুদের জাত ও তিলকের, শিখা ও উপবীতের রক্ষক ছিলেন। ·তাঁহার চরিত্র নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল। তাঁহার মাতৃভক্তি, সন্তানপ্রীতি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মানুরাগ, সাধু-সন্তের প্রতি ভক্তি, বিলাস-বর্জন, শ্রমশীলতা এবং সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উদারভাব সে যুগে অতুলনীয় ছিল। ··তিনি সর্ব ধর্মের মন্দির ও শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতি সম্মান এবং সাধু সজ্জনের পোষণ করিতেন। ··সর্ব জাতি, সর্ব ধর্মসম্প্রদায়, তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান সুযোগ পাইত। দেশে শান্তি ও সুবিচার, সুনীতির জয় এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাঁহারই দান।

"তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি ছিল চুম্বকের মত—দেশের যত সৎ দক্ষ ও মহৎ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিত। ··সৈন্যদের সঙ্গে সদাসর্বদা মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের দুঃখকষ্ট বিপদের ভাগী হইয়া, ফরাসী সৈন্য মধ্যে নেপোলিয়নের ন্যায় তিনি তাহাদের একাধারে বন্ধু ও উপাস্য দেবতা হইয়া পড়েন।

সৈন্যবিভাগের বন্দোবস্তে, শৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা, সব বিষয়ের সূক্ষ্মাংশের প্রতি দৃষ্টি, স্বহস্তে কর্মের নানা সূত্র একত্র ধরিবার ক্ষমতা, প্রকৃত চিন্তাশক্তি এবং অনুষ্ঠান-গঠনে নৈপুণ্য—এই সকল গুণের পরাকাষ্ঠা তিনি দেখান।··· ··

তাঁহার বংশধরগণ আজ জমিদার মাত্র। কিন্তু মারাঠা জাতিকে নবজীবন দান তাঁহার অমর কীর্তি।

ফলতঃ শিবাজী হিন্দু জাতির সর্বশেষ মৌলিক গঠন-কর্তা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবীর।" [আমার রচিত "শিবাজী", ২৫৯—২৬২]। এখানে এই পুনরাবৃত্তি শেষ করিলাম।

শিবাজীর কার্যগুলি এবং সেই যুগে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের প্রথম আশ্চর্যের বিষয় হয় শিবাজীর দৃষ্টিশক্তি। তখন রাজনৈতিক গগন অন্ধকার, চারিদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, অথচ তিনি যেন দৈবজ্ঞানে বুঝিতে পারিতেন কোন্ ঘটনার কি ফল হইবে, শক্তিগুলির মিলন বা সংঘর্ষ কোন্ দিকে গড়াইবে। তিনি কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় তরুণ যুবক ছিলেন, কোন বড় শহর বা রাজসভা দেখেন

নাই; ছোট খণ্ড খণ্ড জাগীরে আমলাগিরি করিয়া শাসন ও যুদ্ধের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এমন কি পুস্তক পড়িবার বিদ্যাও শিক্ষা করেন নাই, তাহার জন্য অবসরও পান নাই। তথাপি তিনি চারিদিকে প্রবল পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতে, অথবা সময় বুঝিয়া মৈত্রী করিতে, দ্বিধা বোধ করেন নাই। কোন ভুলের চাল চালেন নাই। লোকে ভাবিত ইহা তাঁহার ইষ্টদেবী ভবানীর মন্ত্রণা বা স্বপ্নাদেশের ফল। আমরা বলিব ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা। জগতের সব দেশেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মবীরগণ এই নির্ভুল দূরদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন; সাধারণ প্রতিভার লোক, হাজার সুবুদ্ধি সৎ বা কর্মঠ হউক না কেন, এই মহাশক্তিতে বঞ্চিত। অর্থাৎ ইংরাজীতে genius এবং talentএর মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা ইহাই।

তাহার পর, প্রকৃত রাজার, সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকনায়কের প্রধান চিহ্ন, লোক চিনিবার শক্তি, অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের ঠিক চরিত্র এবং কর্মকুশলতা অথবা বিশেষ গুণগুলি অতি অল্প সময়ে দৈবজ্ঞের মত ঠিক বুঝিয়া লইতে পারা। এই গুণে শিবাজী এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আওরংজীব বাদশাহ অতুলনীয় ছিলেন। এইরূপে লোকচরিত্র নির্ভুল বিচার করিয়া তিনি প্রত্যেক কর্মচারীকে তাহার ব্যক্তিগত উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিতেন, অর্থাৎ ইংরাজী উপমায় যে বলে গোল খুঁটোকে চৌকোণা গর্তে বসাইও না, শিবাজী কখনও সেরূপ ভুল করিতেন না। ইহাও একটি দৈবশক্তি এবং জগতে সফলতা লাভের একটি প্রধান মন্ত্র।

প্রভুর পক্ষে সফলতার আর একটি মন্ত্র এই যে, সব শ্রেণীর কর্মচারীর শ্রমের সামঞ্জস্য করিয়া, তাহাদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত চেষ্টাকে সমবায়ের সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া, সেই সূত্র সর্বদা নিজ হাতে রাখিয়া অতি অল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প বাধাতে কাজ হাসিল করা। শিবাজী সব শ্রেণীর সেবকের নিকট হইতে প্রফুল্লবদনে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সেবা ও শ্রম আদায় করিবার গোপনীয় মন্ত্রটি জানিতেন। যিনি প্রকৃত লোকনেতা কেবল তিনিই এইরূপ করিতে পারেন। তিনি নিজে খাটেন এবং অন্যকে খাটাইতে জানেন, নিজে খাটেন সর্বদা সজাগ পর্যবেক্ষণে এবং ভৃত্যদের কাজের সমন্বয়ে—ভৃত্যদের কাজ নিজ হাতে করিয়া নহে। শেষোক্ত ভুলটি অর্থাৎ সব কাজ নিজে করিব বা চালাইব, স্থানীয় প্রতিনিধির হাতে কিছুমাত্র দায়িত্ব দিব না, এই মহাভ্রান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণের ফলে দ্বিতীয় ফিলিপ, আওরংজীব এবং আমাদের বড়লাট লর্ড কেনিংএর শাসন বিফলতার মধ্যে ডুবিয়া যায়, অথচ তাঁহারা প্রত্যেকেই সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্ এবং শ্রমী শাসক ছিলেন। শিবাজী কিন্তু নিজের কোন ভৃত্যকে তাঁহার উপর প্রভু হইয়া বসিয়া তাঁহার কার্য পরিচালনা করিতে দিতেন না, কারণ তিনি নিজেই সর্বত্র কর্তা, সর্বত্রই পরিদর্শক হইয়া থাকিতেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ফিরিঙ্গী সেনাপতিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার প্রভু হইয়া দাঁড়ায়, কারণ দৌলত রাও নিজে অকর্মণ্য নির্বোধ অলস। শিবাজী ইহার বিপরীত ছিলেন। তিনি আশ্চর্য প্রতিভাবলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রদেশের সেনানী ও আমলাকে খাটাইতেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রেশারেশী সংঘর্ষ বা স্ব স্ব প্রধানতা প্রবল

হইতে দিতেন না। দেশস্থ, কর্হাড়ে, শেনবী, চিৎপাবন এই চারি শ্রেণীর পৃথক ব্রাহ্মণ, মসীজীবী প্রভু-কায়স্থগণ, জাত মারাঠাগণ, এমন কি নাপিত, বণিক্, গুজর, এবং মুসলমান পর্যন্ত তাঁহার শাসনবিভাগে ও সৈন্যদলে কাজ করিত, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া এবং প্রভুকে মানিয়া চলিয়া। তাঁহার পরবর্তী যুগে যখন মারাঠা রাজ্যে কর্মচারীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইল, প্রভুর শক্তি অবহেলা ও অগ্রাহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, তখন সেই সোনার রাজত্ব ভাঙ্গিয়া গেল। অরাজকতা উপর হইতে নীচে আসিয়া পৌঁছিল—ঠিক যেমন রণজিৎ সিংহের অযোগ্য পুত্রদের সময়ে পঞ্জাবে ঘটিয়াছিল।

সবার উপর শিবাজীর রাজনৈতিক অনুভব-শক্তিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। নব্য ইটালীর একতা-বন্ধনের এবং স্বাধীনতা-লাভের পুরোহিত কাউণ্ট কাভুর বলিতেন যে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ কর্মবীরের লক্ষণ হচ্ছে এই যে কোন্ কাজটা সম্ভব তাহা দৈবজ্ঞের মত বুঝিতে পারা—বিনা তর্কে, বিনা চিন্তায়, স্বভাবসিদ্ধ শক্তির দ্বারা,—যেমন হাঁসের বাচ্চা জন্মিয়াই সাঁতার দিতে পারে। এই শক্তির অভাবে অনেক নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সাধু শাসক, মহারথী তলাইয়া যান, প্রকৃত কার্যক্ষেত্রের পরীক্ষায় হার মানেন। এই দিক্ দিয়া দেখিলে শিবাজীকে প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ অথবা ষ্টেটস্ম্যান বলিতে হইবে। আপনারা জানেন জিনিয়াস্ এবং ট্যালেণ্ট এই গুণ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, ঠিক সেই পার্থক্য ষ্টেটস্ম্যান এবং পলিটিশিয়ানের মধ্যে আছে। শিবাজী প্রকৃতই ষ্টেটস্ম্যান ছিলেন—যেমন ফরাসী রাজা চতুর্থ হেনরী অথবা ইংলণ্ডের প্রথম এডওয়ার্ড ও এলিজাবেথ।

আবার প্রকৃত কর্মবীরের মত তিনি কোন নূতন কাজ বা নূতন অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বে জমি পরিষ্কার করিয়া পথ বাঁধিয়া তবে অগ্রসর হইতেন; এই যেমন সুরট বন্দর লুটিবার অথবা বেরার প্রদেশ প্রথমবার আক্রমণ করিবার পূর্বে। তিনি অনেক মাস ধরিয়া সেই সেই স্থানে চর পাঠাইয়া সব গোপনীয় তথ্য ও পথঘাট জানিয়া, এবং সেখানে উপস্থিত হইবার পর তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগে হইতে গুপ্ত প্রতিনিধি বসাইয়া রাখিয়া, তবে নিজ দেশ হইতে যাত্রা করিতেন, এবং এইরূপ স্থানীয় জ্ঞান ও সহায়কের যোগাযোগে তাঁহার কর্মঠ মিতাহারী আস্‌বাববিহীন অশ্বারোহী দল লইয়া এত দ্রুত অগ্রসর হইতেন যে শত্রুগণ তাঁহার পৌঁছার পূর্বে সতর্ক হইতে পারিত না, ভাবিত যে শিবাজীর বর্গীরা আকাশ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। বেরারের সর্বাপেক্ষা ধনশালী শহর কারঞ্জা যখন শিবাজী প্রথম লুঠ করিলেন, তখন অতি প্রত্যূষে শহরবাসীরা ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল যে যাহা কোনদিন শুনে নাই, ভাবে নাই সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, মারাঠা সৈন্যের উপস্থিতি ২০০ মাইলের মধ্যেও শুনা যায় নাই, অথচ তাহারা রাতারাতি পৌঁছিয়া ঐ শহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

ফলতঃ শিবাজীকে শুধু বীর যোদ্ধা বা বিচক্ষণ সেনানায়ক ভাবিলে ভুল হইবে। তিনি এই মহাগুণের সঙ্গে সঙ্গে দৌত্যকুশলতা এবং শাসন-দক্ষতা এই দুটি বিপরীত শ্রেণীর গুণেও ভূষিত ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ক্রমওয়েল ও মার্লবরো, ওয়েলিংটন এবং পঞ্চম হেনরী মাত্র এই আশ্চর্য গুণ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। ভারতে আকবর।

এইত শিবাজী চরিত্রের বিশ্লেষণ। এখন দেখা যাউক তাঁহার কীর্তিগুলি কি কি। আমি এখানে তাঁহার জয়-পরাজয়, ধন-দৌলত বা রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দিব না, তাহা আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর জানেন, এবং আমি এক বাঙ্গালা গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। আজ দেখাইব তিনি মারাঠা জাতির জন্য নূতন কি করিলেন, তাঁহার দান কি কি।

শিবাজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে মারাঠাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা, তাহাদিগকে একতার সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া নেশান্-সৃষ্টির আরম্ভ করা। এরূপ কার্য জগতের ইতিহাসে প্রায়শঃ নূতন ধর্মপ্রবর্তকেরাই করিয়া থাকেন, কচিৎ কোন কোন দেশে এক একজন মহাপুরুষ নেতা বা অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভাশালী পুরুষ করিতে পারেন। শিবাজী এই শ্রেণীর নরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আজও তাঁহার নাম মহারাষ্ট্রে এবং মারাঠাজাতির গুণগ্রাহী অন্য প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে দেবতার সমান পূজা করা হয়। তাই আজও তাঁহার সৃষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে লোকে এত যত্নের সহিত আলোচনা করে এবং অনেকে আদর্শ বলিয়া অনুসরণ করিতে চায়। তিনি প্রথমে মারাঠাদিগকে বুঝাইলেন "মানুষ আমরা, নহি ত মেষ", কার্যদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে তাহারা এই নবাযুগেও রাজ্যগঠন করিতে, শাসন চালাইতে, প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হইতে পারে, তাহাদের উন্নতি সম্ভব এবং সে উন্নতিলাভ করা তাহাদেব নিজেব হাতেই। যুগ যুগ বহিয়া অধীনতা ও জাতীয় অবসাদের ফলে যে নৈরাশ্য জন্মে তাহা দূর করিয়া একটা রাষ্ট্রের মৃতদেহে নবীন প্রাণ সঞ্চার করাব মত বড় কাজ জগতে আর নাই। শিবাজী তাহাই করেন, এবং তিনি মারাঠা জাতির মধ্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও চলিতেছে—সমগ্র ভারতের চক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

চলিত কথায় বলা যাইতে পারে যে শিবাজী প্রথমে মারাঠা জাতির—এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্য প্রদেশের হিন্দু প্রজাদেরও ভয় ভাঙ্গাইলেন। তিনি যখন ক্ষুদ্র জমিদাব হইয়াও স্বাধীনতার পথে প্রথম পা ফেলিলেন (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) তখন তাঁহার উপরের শক্তি, অর্থাৎ বিজাপুর-রাজ, বাহ্যতঃ অক্ষুণ্ণ প্রতাপে, আর রাজার উপর রাজা অর্থাৎ দিল্লীর বাদশাহ মধ্যাহ্নের সূর্যের মত সমস্ত ভারতকে উত্তপ্ত করিতেছিল। এই মুঘল রাজশক্তির সমক্ষে ভারতের সব হিন্দু-মুসলমান রাজ্যগুলি হার মানিয়াছিল, এমন কি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার এতদিনকার স্বাধীন মুসলমান সুলতান দুটিও দিল্লীশ্বরের নিকট মাথা নত করিয়া নিজদের তাঁহারই সামন্ত মাত্র বলিয়া মানিয়া লইয়া, দিল্লীর বাদশাহের নাম নিজ নিজ রাজধানীতে খুৎবা পাঠের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছিলেন, আর অহঙ্কারী দিল্লীশ্বর এই দুই সুলতানকে চিঠি-পত্রে শাহ্ অর্থাৎ রাজা না বলিয়া খাঁ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত প্রজা এই নাম দিয়া লিখিতেন,—আদিল খাঁ, কুতব খাঁ, ঠিক যেন মুঘল সরকারের চাকর খাঁ জহান বা খাঁ দৌরানের মত।

অথচ এই মুঘল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রথম দাঁড়াইলেন, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিলেন, কে ? একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, পরাজিত, নির্ব্বাসিত জাগীরদারের ছেলে, যাঁহার আয় তখন তিন লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। সমস্ত ভারত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিল। ইহা শিবাজীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

এইরূপ দুরূহ, প্রায় অসাধ্য, কাজে সফল হওয়াই তাঁহার দেবদত্ত প্রতিভার প্রমাণ। জগতে নূতন পথ, নূতন দেশ আবিষ্কারকের যে মান, রাজনৈতিক ভারতে শিবাজীর তাহাই প্রাপ্য।

তাহার পর কখনও দুই শত্রুর, কখনও বা তিন শত্রুর—মুঘল, বিজাপুর, পোর্তুগীজ, ইংরাজ—ইহাদের একসঙ্গে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তিনি দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন—এই সব দ্বন্দ্বে তাঁহার কত বুদ্ধির স্থিরতা, হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং উপায় উদ্ভাবনে বিচিত্র মৌলিকতা দেখা গিয়াছিল, তাহা তাঁহার ইতিহাস পাঠকেরাই জানেন। ঠিক কখন বা কাহার সহিত মৈত্রী করিতে হইবে, অথবা যুদ্ধ আরম্ভ লাভকর হইবে, তাহা তিনি অব্যর্থভাবে বুঝিতে পারিতেন। ভারতে এরূপ চির-সফল সুবিধাবাদী unfailing opportunist আর দেখা যায় না।

তাঁহার এই সুবিধার পন্থা দেখিয়া বাহির করিবার, রন্ধ্রে প্রহার করিবার দৈবশক্তি তাঁহার বিখ্যাত কর্ণাটক অভিযানে অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মারাঠী বখর-কার এই সেনাচালনকে "ছত্রপতির দক্ষিণ দিগ্বিজয়" নাম দিয়াছেন, এবং একজন ইংরাজ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বণিকের বর্ণনায় আছে যে "জুলিয়াস্ সিজারের মত শিবাজী সেই প্রদেশে আসিলেন, দেখিলেন ও জয় করিলেন", ইহাই তাহার যথার্থ বর্ণনা। কত রাজনৈতিক ফন্দী, সন্ধি পাতান, মুঘল সুবাদারকে ঘুষ দেওয়া, চর পাঠাইয়া সব খবর লওয়া, ঘাটিতে ঘাটিতে নিজ লোক আগে হইতে গোপনে প্রস্তুত রাখা, এই অভিযানের পূর্বে সম্পন্ন করিয়া তবে শিবাজী একপদও অগ্রসর হন, এবং এইরূপ দূরদর্শিতার সহিত বন্দোবস্তের ফলে তাঁহার গতি যে কেমন অবাধ ছিল, কাজটা কত শীঘ্র সম্পন্ন হইল তাহা শিবাজী-চরিতের এই অধ্যায়ে আপনারা অনেকেই পড়িয়াছেন।

শত্রুরা শিবাজীকে লুঠিয়াই বলুক, আর পার্বত্য মূষিকই বলুক, তাঁহার সফলতা ও শক্তিকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। স্বয়ং আওরংজীব ১৬৬৭ সালে তাঁহার 'রাজা' উপাধি অনুমোদিত করেন এবং ১৬৭৪ সালে শিবাজী মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক করিয়া সমগ্র ভারতের সম্মুখে নিজকে ছত্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন, নিজ নামে টাকা বাহির কবিলেন, এবং সেইদিন হইতে এক রাজ্যাভিষেক শক প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইহাই ত গেল তাঁহার গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠিবার পথের সোপানাবলী। তাহার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

তাঁহার শাসনপ্রণালী সে যুগের এবং সে দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, এবং ঐ দেশের পূর্ব সংস্কার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে গঠিত—বিদেশ হইতে কলে ঢালা দ্রব্যের আমদানী নয়—এজন্য উহা বেশ সুফল প্রদান করে এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত টেঁকে। পরবর্তী রাজাদের চরিত্রহীনতার এবং মন্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়ার ফলেই এই শাসন-প্রণালী পরে ভাঙ্গিয়া পড়ে—পরিকল্পনার দোষে নহে। শিবাজীর রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতিতে অষ্টপ্রধানদের পদ ও কার্যবিভাগ আপনারা জানেন।

শিবাজীর নূতন সৃষ্টি—প্রায় আমাদের বিশ্বাসের অতীত—তাঁহার নৌসেনাগঠন।

যখন তিনি কল্যাণ (বর্তমান থানা জেলা, বম্বে দ্বীপের ঠিক পূর্বে স্থিত স্থলভূমি) অধিকার করিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ গড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহা দেখিয়া গোয়া ও দামনে পর্তুগীজদের ভয় জন্মিল। আপনারা শুনিয়া বিশ্বাস করিবেন না যে শিবাজী ও বম্বের ইংরাজদের মধ্যে সর্ব প্রথম যে জলযুদ্ধ ঘটে তাহাতে ইংরাজের পরাজয় হয়।

শিবাজীর সৈন্যগঠন ও নেতৃত্বের প্রশংসা করা অনাবশ্যক, কারণ মারাঠা শক্তির অদম্য বিকাশ এবং ভারতব্যাপী প্রভাবই ইহার সাক্ষ্য। এই সৈন্যগণকে শুধু বর্গী ভাবিলে ভুল হইবে। একজন উত্তর-ভারতীয় মুসলমান ঐতিহাসিক মারহাট্টা শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন "মারকে হট্ গিয়া!" অর্থাৎ যাহারা হঠাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া দু চার ঘা মারিয়া দু চারটা জিনিষ লুঠ করিয়া, বিপক্ষ সৈন্য আসিতেছে শুনা মাত্র পলাইয়া যায়। কিন্তু শিবাজীর সময়ে মারাঠা সৈন্য ইহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর সামরিক শক্তি দেখায়। তাহারা মুঘল সেনাপতি ইখ্‌লাস খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করে, অনেক দুর্গ প্রকাশ্যে অবরোধ করিয়া জয় করে, এবং প্রবল দল লইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সহস্রাধিক মাইল পথ কুচ করিয়া যায়। এগুলি লুঠিয়ার কাজ নহে।

শিবাজীর রাজ-সভা দেশের—শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, সমস্ত ভারতের—গুণী জ্ঞানী শিল্পী ভক্ত জনগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। তাঁহারই অনুগ্রহে দেশে জ্ঞান ও ধর্ম আবার আলোক দিতে আরম্ভ করিল। ইহাও লুঠিয়ার কাজ নহে।

সর্বশেষে এই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু নরপতি সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি, সর্বধর্মের মন্দির ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি সম্মান, সর্বজাতির সাধু পুরুষদের আদর ও অর্থ এবং লাখরাজ জমি দান প্রভৃতি কাজের দ্বারা সেই যুগে এক অশ্রুতপূর্ব মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছিলেন। সে দৃষ্টান্তের অভাব আজ জার্মাণী অনুভব করিতেছে। শিবাজীর দর্শিত আদর্শকে ভুলিয়া যাইবার ফলে আজও ভারতে ধর্মের দোহাই দিয়া নরহত্যা ও গৃহদাহ চলিতেছে। তাই রামদাসের ভাষায় আজও বলা আবশ্যক—"শিবরাজাস্ আঠবাবেঁ"—

'শিবাজীকে স্মরণ রাখিবে'।

শ্রীযদুনাথ সরকার

শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা*

আমি পূর্বের দিন দেখাইয়াছি যে গ্রাণ্ট ডফ্-রচিত এবং এতকাল সর্বত্র গৃহীত শিবাজীর ইতিহাস-কাহিনীতে গত ১৯ বৎসরে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র—শম্ভূজী ও রাজারামের ইতিহাসেও, আধুনিক গবেষণার ফলে ঠিক সেই পরিমাণে অতি মূল্যবান সংশোধন আমরা এখন করিতে পারিয়াছি। আমাদের প্রাপ্ত, কিন্তু ডফের অজ্ঞাত অথবা যৎসামান্য ব্যবহৃত, উপাদানগুলি এই :—

(১) শম্ভূজী কর্তৃক সাষ্টি (Salsette) আক্রমণের পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত অতি দীর্ঘ বিবরণ; ইহার একটা ইংরাজী অনুবাদও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে আছে।

(২) আওরংজীবের পুত্র কুমার আকবর বিদ্রোহী ও পলাতক হইয়া মারাঠা রাজার আশ্রয়ে থাকিবার সময় তাঁহার লিখিত ফার্সী পত্রগুলি (লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ের হস্তলিপি)।

(৩) এই আকবর ও গোয়ার কর্মচারীদের মধ্যে যে পত্রের আদানপ্রদান হয় তাহা এবং পোর্তুগীজ সরকারী দলিলাদি খুঁজিয়া বাহির করিয়া গোয়া-নিবাসী গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরঙ্গ পিস্থুর্লেকর অল্পদিন হইল ছাপাইয়াছেন।

(৪) পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঁসোয়া মার্ত্যাঁর দিনলিপি; ইহাতে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ কর্ণাটকের বিস্তৃত সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনটি বৃহৎ ভলুমে অল্পদিন হইল ইহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) ঐতিহাসিক অর্মের নকল করা কতকগুলি খাতা। ইহাতে ইংরাজকুঠীর যে সকল কাগজ নকল করা হয় তাহার আসলগুলি অনেকস্থলে এখন লোপ পাইয়াছে। এই কাগজগুলি হইতে শম্ভূজীর রাজত্বের প্রথম দুই বৎসরের বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত বিবরণ এখন রচনা করা যায়। গ্রাণ্ট ডফ্ যে চিটনিস বখরের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া এই দুই রাজার ইতিহাস লেখেন, তাহা অতি আধুনিক এবং প্রবাদমূলক, ১৮০৯ সালে রচিত। উপরের বর্ণিত উপকরণ হইতে ডফ এবং চিটনিসের অসংখ্য ভুল ঘটনা ও তারিখ সংশোধন করিয়া ঐ সময়কার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস গঠন করা এখন সম্ভব হইয়াছে। এই সংশোধনের ফল আমার ইংরাজী আওরংজীব গ্রন্থের চতুর্থ ভলুমে (দ্বিতীয় সংস্করণে) পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি।

(৬) আওরংজীবের যুগের সমসাময়িক ফার্সী হস্তলিখিত ইতিহাস ও পত্রাবলীর সাহায্যে রাজারামের বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত ইতিহাস আমার আওরংজীব-গ্রন্থের পঞ্চম ভলুমে দিয়াছি। এই সব মালমসলা গ্রাণ্ট ডফের অজ্ঞাত ছিল, এবং এগুলির ব্যবহারের ফলে ১৬৮০ হইতে ১৭০০ এই বিশ বৎসরের মারাঠা ইতিহাস এক নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে।

---

* ১৩৪২, ৮ই চৈত্র তারিখে পরিষদ্‌মন্দিরে প্রদত্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার তৃতীয় ও শেষ বক্তৃতা।

তাহার পর, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়া, মারাঠা ইতিহাসের অতি বহুল সংখ্যক এবং অমূল্য প্রাথমিক উপাদান আমরা গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে পাইয়াছি; ইহার সবই গ্রাণ্ট ডফের পরে আবিষ্কৃত। এগুলি মারাঠী সরকারী চিঠি, অথবা দূত ও সেনাপতিদের রিপোর্ট এবং নিজস্ব পত্র। দাক্ষিণাত্যের আজন্ম ইতিহাস-সেবক রাজবাডে, সানে, পারসনিস, খরে, সরদেশাই প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রায় এক শত ভলুম ছাপিয়াছেন। তাহার পর, বম্বে গভর্ণমেণ্ট নিজহস্তে স্থিত পেশোয়া-দপ্তরের সব কাগজপত্র খুঁজিয়া বাছিয়া ৪৫ ভলুম ঐতিহাসিক পত্র ও হিসাব, সরদেশাই মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সব উপকরণ মারাঠী ভাষায় লিখিত। এ ভিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অনেক অপ্রকাশিত ফারসী ইতিহাস এখন আমাদের হাতে আসায়, উত্তর-ভারত ও রাজপুতানায় মারাঠা জাতির ক্রিয়াকলাপ এবং পাণিপথের শেষ যুদ্ধের বিষয়ে অনেক অমূল্য সমসাময়িক বিবরণ নূতন জানা গিয়াছে এবং সেই যুগের ইতিহাস পূর্ণতর হইয়াছে।

অনেকেই জানিতে চান যে, এই পেশোয়া-দপ্তরের মত সমুদ্র মন্থন করিয়া, সাতাইশ হাজার বাণ্ডিলের প্রায় তিন কোটি কাগজখণ্ড ঘাঁটিয়া যে ৪৫ ভলুম-ব্যাপী চিঠিপত্র ছাপান হইল, তাহাতে মারাঠা ইতিহাসের নূতন কি কি তথ্য পাওয়া গেল। এই প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া কঠিন; ভারত ইতিহাসের এই শাখা যাঁহারা বিশেষ ভাবে চর্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের কতকটা বুঝান যায়। আমি সংক্ষেপে ইহার আভাস দিতেছি :—

পেশোয়া-দপ্তরে এবং সেখানে আনীত সাতারা-রাজাদের কাগজপত্র হইতে শিবাজী বা তাঁহার দুই পুত্রের সময়কার কোন ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় নাই; দু চারিটা হুকুম বা স্থানীয় বিচারের রায় (মহজর-নামা) মাত্র মিলিয়াছে। সুতরাং ঐ দপ্তর পরীক্ষা আরম্ভ করিবার সময় যে একটি বড় আশা সকলের মনে জাগিয়াছিল, তাহা বিফল হইয়াছে। কিন্তু এই সব কাগজ হইতে পেশোয়া-যুগের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, মারাঠা ইতিহাস পূর্ণ ও নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট এতদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ছায়ার মত অস্পষ্ট ছিলেন; তাঁহার কার্যকলাপ, ক্রমোন্নতি এবং রাজার মনের উপর প্রভাব-বিস্তারের কাহিনী আমাদের ভাল জানা ছিল না। এসব কথা আমরা পেশোয়াদপ্তরের কাগজ হইতে সদ্য জানিতে পারিয়াছি। আরও জানিয়াছি যে, বালাজী প্রথমে নগণ্য লোক ছিলেন না, তাঁহার অভ্যুদয় যে সালে আরম্ভ হয় বলিয়া এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহার অনেক বৎসর আগেই তিনি স্বদেশের রাজকার্যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন—সেনাকর্তা, জেলাশাসক প্রভৃতির কর্ম করিতেছিলেন। ক্রমে আরও বড় হইয়া, অবশেষে প্রধান মন্ত্রী মুখ্যপ্রধান-এর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রতি অন্য মন্ত্রীদের বা সর্দারগণের ঈর্ষ্যা ও বাধা দিবার চেষ্টা এই নূতন কাগজ হইতে বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর, দ্বিতীয় পেশোয়া বাজী রাও-এর উত্তর-ভারতে অভিযান, মালব-বিজয়, দিল্লীর দ্বার পর্যন্ত লুঠ, ভূপালের নিকট নিজামকে পরাজয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি, যাহা

এতদিন সংক্ষেপে জানা ছিল তাহার সম্বন্ধে অতিবিস্তৃত, দিনের পর দিন তারিখযুক্ত কাহিনী এই দপ্তর হইতে উদ্ধার হইয়াছে ও তাহার সাহায্যে এতদিনকার প্রচলিত ভুল কথা ও মিথ্যা তারিখ এখন সংশোধন করা যায়।

এই ৪৫ ভলুম মারাঠী উপকরণ বিশেষভাবে পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, এই পেশোয়াদের দপ্তর মারাঠা ইতিহাসের উপর যেমন নূতন আলোক পাত করে, দিল্লী সাম্রাজ্যের এবং নিজামের ইতিহাসের জন্যও তাহা অপেক্ষা কম মূল্যবান্ নূতন সংবাদ দেয় না। ফলতঃ হায়দরাবাদের নিজামদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পরিমাণের আদিম ঐতিহাসিক উপকরণ এই মারাঠী ভাষায় লিখিত কাগজগুলিতে আছে—এত ফারসী ভাষায়ও নাই, নিজামের দপ্তরখানাতেও নাই। ১৭২৭ হইতে ১৭৬৯ পর্যন্ত বারম্বার নিজাম-পেশোয়া সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও সন্ধির, অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই মারাঠী কাগজ হইতেই রচনা করা সম্ভব।

সেই মত মাদ্রাজ কর্ণাটকে মারাঠাদের অভিযান,—যাহাতে ক্লাইভের অভ্যুদয় হইল, এবং যাহার এক তরফা অর্থাৎ ইংরাজপক্ষের উক্তি-মাত্র আমরা এতদিন জানিতাম,—তাহার সম্বন্ধে মারাঠা পক্ষের সাক্ষ্য এবং নূতন তথ্য এই দপ্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পোর্তুগীজ-পেশোয়া সংঘর্ষগুলিরও সেই মত মৌলিক বিস্তৃত মারাঠী চিঠিপত্র পাইয়া আজ আমরা এতদিন পর্যন্ত জ্ঞাত পোর্তুগীজ ভাষায় লেখা ইতিহাসের ফাঁকগুলি পূরাইতে, ভুলগুলি সংশোধন করিতে পারিতেছি।

মারাঠা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক বিষয় হইতেছে ১৭৬১ সালের জানুয়ারি মাসে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং তাহার পূর্ববর্ত্তী উত্তর ভারতীয় অভিযানগুলি। মারাঠী ভাষার কাগজপত্রে ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে অতি যৎসামান্য নূতন খবর অধুনা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ১৭৫৪ হইতে ১৭৬০ সালের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঐ মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত, মারাঠা সৈন্যদের গতিবিধি, নেতাদের মন্ত্রণা ও নীতি পরিবর্তন, অপরাপর শক্তিগুলির সহিত সন্ধি বিগ্রহ, দেশের দশা প্রভৃতি বিষয়ে অতি বিস্ময়জনক বিপুল নূতন খবর,—সবই সমসাময়িক ও লিখিত—আজ আমাদের হাতে আসিয়াছে। এই কাজ আরম্ভ করেন বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে, কয়েকটি মারাঠা ঐতিহাসিক পরিবারের দপ্তর মধ্যে আবিষ্কৃত কাগজপত্র ১৮৯৮ সালে প্রথমখণ্ডে এবং ১৯০৭ সালে ষষ্ঠখণ্ডে ছাপিয়া। গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই নিজের সম্পাদিত "পেশোয়ার দপ্তর হইতে বাছা কাগজপত্র" ৪৫ ভলুমে এই কাজ সম্পূর্ণ বিস্তৃত এবং সরকারী দলিলের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বর্গীর হাঙ্গামার পশ্চাতে মারাঠারাজদরবারের নীতি এবং এই সব অভিযানের ইতিহাস শুধু এই কাগজ হইতেই নূতন করিয়া লেখা সম্ভব।

তারাবাই ও আনন্দীবাই, অর্থাৎ ছত্রপতি রাজারাম এবং পেশোয়া রঘুনাথরাও দাদা, এই দুজনের স্ত্রী—অতি তুখোড় ফন্দিবাজ জঙ্গী নারী ছিলেন। তাঁহাদের অনেক বর্ষব্যাপী চিঠিপত্র আবিষ্কার হওয়ায় তাঁহাদের চরিত্র এবং সেই সেই যুগে রাজনৈতিক ঘটনার ভিতরে কিরূপে কল চলিত, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব এখন জানা যায়। সরদেশাই সম্পাদিত আরও

কয়েকটি ভলুমে পেশোয়াদের পারিবারিক জীবনের এবং সেকালকার সমাজের অতি উজ্জ্বল চিত্র পাইতেছি; ইহাও নূতন। সর্বশেষে, অনেকগুলি বিখ্যাত মারাঠা সরদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের বা প্রথম ২।৩ পুরুষের আদ্যন্ত বিবরণ এই দপ্তর হইতে সংকলন করিয়া প্রচলিত প্রবাদগুলি খণ্ডন করা গিয়াছে।

সুতরাং সকলে দেখিবেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত উপকরণগুলি কত মূল্যবান্, কত বিচিত্র, কত মনোরম। অন্য কোন প্রদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বর্তমান কালে এমন সৌভাগ্যজনক আবিষ্কার ঘটে নাই, ঘটিবার আশাও নাই।

এই ত গেল মারাঠা ইতিহাসের নূতন মালমসলা। এখন শিবাজীর পর মারাঠা রাষ্ট্রের ঘটনাস্রোত পর্যবেক্ষণ করা যাউক। আমি ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়া বা স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মত ইতিহাসের কঙ্কাল এখানে খাড়া করিয়া, আপনাদের বিরক্ত করিব না। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব, এই শিবাজীর পরবর্তী ১৩৭ বৎসর ধরিয়া স্বাধীন মারাঠা রাজ্যে ও রাজনীতিতে কি কি বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কোন্ কোন্ প্রভাবে ঘটনাগুলি সেই আকার ধারণ করিল, এবং জননেতাদের কি কি দোষগুণে মারাঠাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি বা পতন হইল।

শিবাজীর মৃত্যুর বিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল; দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাদশাহ নামে চক্রবর্তী সম্রাট্ হইলেন। মারাঠা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় বন্দী, না হয় পলাতক ক্ষুদ্র জমিদারের মত কাল কাটাইতে লাগিলেন। শিবাজীর দুই পুত্র, শম্ভুজী ও রাজারাম, ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজারামের মৃত্যুর পর (১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে) মারাঠা ইতিহাসের শিব-পশ্চাৎ যুগের প্রথম অংশ, অর্থাৎ রাজাদের কাল, শেষ হইল, এবং সাত বৎসর ধরিয়া (১৭০০-১৭০৭, আওরংজীবের মৃত্যু পর্যন্ত) অরাজকতায় কাটিল। কারণ, শম্ভুজীর পুত্র শাহু তখন মুঘল শিবিরে বন্দী, কোলাপুরে তারাবাই নিজ পুত্রকে রাজা বলিতেন, কিন্তু বেশী লোক তাহাকে স্বীকার করিত না; কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দেশ হইতে নির্বাসিত, এই হইল সেই দেশের দশা। সত্য বটে, আওরংজীবের মৃত্যুর চারি মাস পরে শাহু খালাস পাইয়া নিজ দেশে ফিরিলেন এবং পিতা-পিতামহের রাজ্য দখল করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত অবাধ্য সামন্তগণ এবং ভাগী অংশীদার (পিতৃব্যপুত্র, কোলাপুরের রাজা)-র সহিত যুদ্ধ করিতে হইল।

অবশেষে ১৭১৩ সালে শাহু রাজা হইয়া বসিলেন (সাতারার ছত্রপতি বংশ)। কিন্তু এখন হইতে পেশোয়াদের যুগ আরম্ভ হইল; কারণ, তাঁহার সিংহাসনের স্তম্ভ হইলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বা পেশোয়া। ছত্রপতি শাহু এই বিশ্বাসী এবং কার্যদক্ষ মন্ত্রীর হাতে সব শাসন কাজ ছাড়িয়া দিয়া, নিজে শুধু উপরে উপরে তত্ত্বাবধান এবং প্রধানদের মধ্যে ঝগড়া মিটান লইয়া ব্যস্ত থাকিলেন।

মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়া-যুগ অতি পরিষ্কার দুই ভাগে বিভক্ত; এই বিভাগের রেখা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের শেষ যুদ্ধ এবং তাহার অব্যবহিত পরে পেশোয়া বালাজী

বাজী রাওএর মৃত্যু এবং তাঁহার নাবালক পুত্র মাধব রাওএর সিংহাসন-প্রাপ্তি। এই দুটি কাল-বিভাগের মধ্যে ঘটনাস্রোতে, নেতা-চরিত্রে এবং রাষ্ট্রনীতিতে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, এই সব পেশোয়ারা স্বার্থপর প্রভুদ্রোহী চাকর ছিল। কিন্তু এটা ভয়ানক ভুল। কারণ, বন্ধুবান্ধবহীন নবাগত শাহুকে সিংহাসনে স্থিরভাবে বসাইলেন, এবং এইরূপে নবজীবনপ্রাপ্ত মারাঠা রাজশক্তিকে স্থায়ী এবং ভারতব্যাপী করিলেন পেশোয়ারা; এ কাজ শাহু করিতে পারিতেন না; আর পেশোয়ারা না উঠিলে মারাঠাজাতি কখনই গুজরাত মালব কর্ণাটক জয়, এবং দিল্লী পঞ্জাব বাঙ্গালা পর্যন্ত লুট করিতে পারিত না। কোলাপুরের রাজবংশের মত আর একটি স্থানীয় জমিদার সাতারায় স্থাপিত হইত মাত্র, এবং তাঁহার পক্ষে ছত্রপতি উপাধি হাসির বিষয় হইত।

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট কোন্ কোন্ বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজ প্রভুকে দেশের রাজা বলিয়া সকলের দ্বারা গৃহীত করিতে এবং স্থায়িভাবে সিংহাসনে বসাইতে আর কোলাপুরের রাজশাখাকে নীচে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার চরিত্রের গুণগুলি কত বিচিত্র এবং সাতারার রাজবংশের তিনি যে কত বেশী উপকারক ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ১৭০৭-১৭১২ সালে ঐ দেশ অরাজকতায় পূর্ণ, প্রত্যেক লোকই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কোন রাজাকে মানিতে বা কর দিতে অথবা স্বদেশের কাজে অন্যের সহিত মিলিতে সম্মত নহে। মুঘল-কারাগার হইতে প্রত্যাগত শাহুর না ছিল অর্থ, না ছিল লোকবল। তাহার উপর, তারাবাইএর নানাপ্রকার চক্রান্ত ও আক্রমণ-চেষ্টা। রাজার জমি সব নানা সামন্ত, পূর্বকর্মচারীদের পুত্রগণ, অথবা জবরদস্ত স্বার্থপর নূতন লোকে দখল করিয়া বসিয়াছে।

ইহা ভিন্ন, শাহুর পক্ষের অন্যান্য কর্মচারিগণ, বিশেষতঃ অষ্ট প্রধানদের অপর সাত জন, পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহার প্রাধান্য মানিতে অসম্মত, সব কাজে তাঁহাকে অপদস্থ ও নিষ্ফল করিতে ব্যগ্র। মারাঠা রাজ্যের সেনাপতি-উপাধিধারী "প্রধান" মারাঠা জাতের, তিনি ব্রাহ্মণ পেশোয়ার উপর হাড়ে হাড়ে চটা, এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পর্যন্ত অগ্রসর। এইরূপ রাজসভায় বালাজী বিশ্বনাথ যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন, ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাঁহারই চেষ্টায় দিল্লীর বাদশাহ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সনদ দিয়া শাহুকে শিবাজীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সর্-দেশ-মুখীর অধিকার দান করেন। শাহুর অধীনে প্রথম প্রথম কোন বড় সেনাপতি ছিল না। বালাজীর পুত্র বাজী রাও (১৭২০-১৭৪০ পর্যন্ত পেশোয়া) এই অভাব পূর্ণ করিলেন। বাজী রাওএর অদ্ভুত সামরিক দক্ষতা এবং আজন্ম নেতৃত্বশক্তির ফলে মারাঠাদের রাজা এই ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে প্রকৃতই ছত্রপতি হইলেন, মুঘল সাম্রাজ্য অন্ধকার করিয়া নানা প্রদেশে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন; আটক হইতে কুমারিকা পর্যন্ত লোকে মারাঠা নামে কাঁপিতে লাগিল। এরূপ কার্য শিবাজীও করিতে পারেন নাই। ইহাই পেশোয়াদের স্মৃতিস্তম্ভ।

বাজী রাও ঘরের পাশে নিজামের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ ও পরে সন্ধি করিয়া, অদম্য তেজে উত্তর-ভারত ও পোর্তুগীজ রাজ্য আক্রমণ করিলেন; রাজপুতানায় কর আদায়, মালব অধিকার, গুজরাত লুণ্ঠন (এবং তাঁহার পুত্রের সময় সম্পূর্ণ দখল) এবং বুন্দেলখণ্ডে ভাগ বসান প্রভৃতি তাঁহার সফলতার চিহ্ন। মারাঠাদের এই রাষ্ট্রীয় বিস্তার তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজী রাওএর সময়ে (১৭৪০-১৭৬১) চরমে পৌঁছে, এবং সেই সময়ই তাহার অবনতি আরম্ভ হয়। *প্রথমতঃ রাষ্ট্রের প্রধান নেতা শুধু যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদা মন দেওয়ায় শাসন কার্যে* অবহেলা হইতে লাগিল; প্রজাদের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া দাঁড়াইল; অবিচার, ঘুষ লওয়া, জনহিতকর কার্যে অবজ্ঞা, দেশের দৈন্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পেশোয়াদের দেনা এত বেশী হইয়া উঠিল যে, উত্তর-ভারত লুঠ করা ভিন্ন তাহা শোধ দিবার কোন পথ দেখা গেল না; অথচ উত্তর-ভারতে বৃহৎ অভিযান পাঠাইলে তাহার খরচেই সব আদায় করা কর এবং লুঠ করা ধন খাইয়া ফেলিত। এইরূপে যখন বাহ্যত মারাঠা শক্তি মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত সকলের মাথার উপর তাপ দিতেছিল, তখনই মারাঠা স্বরাজ প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য হইয়া জাতীয় ক্ষয়রোগের মৃত্যুবীজ নিজ দেহে পোষণ করিতে লাগিল। পাণিপথে পরাজয় এবং সেখানে যত বড় মারাঠা সরদার এবং অক্ষৌহিণী সৈন্যের মৃত্যু ইহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

তদপেক্ষা অধিকতর ভীষণ ধ্বংসের কারণ হইল পেশোয়া রাজবংশে এবং কর্মচারি-মণ্ডলে নৈতিক অবনতি এবং অন্তঃকলহ। তরুণ পেশোয়া মাধব রাও বল্লালের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের সর্বপ্রকার অনিষ্টই করিলেন, জাতীয় সকল শত্রু (নিজাম, ইংরাজ প্রভৃতির) সহিত বারম্বার যোগ দিলেন। মাধব রাওএর অকালমৃত্যু (১৭৭২) এবং নারায়ণ রাওএর খুন (১৭৭৩) এত কাছাকাছি ঘটিয়া মারাঠা-রাজকে একেবারে বজ্রাহত করিল। সেই সুযোগে ইংরাজেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ব্যক্তি অপেক্ষা জাতি বা জনসমষ্টি অনেক শ্রেষ্ঠ; মারাঠাদের মধ্যে এই সজ্যপ্রাণ, জাতীয় শক্তি এত অধিক ছিল যে, "বারা ভাই" জুটিয়া এই মহাবিপদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বাঁচাইলেন; কুলাঙ্গার রঘুনাথকে পরাজিত করিয়া মাধব রাও নারায়ণের সিংহাসন বজায় রাখিলেন। এই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সময় নানা ফড়্‌নবিস্ দেশের শাসনক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ নিজগুণে অধিকার করিলেন, অর্থাৎ নাবালক পেশোয়ার রক্ষাকর্তা এবং পরে "পেশোয়ার পেশোয়া" হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার রক্ষণ অপেক্ষা গঠনের শক্তি অনেক কম ছিল, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি একেবারেই ছিল না; নানা মতের, নানা শ্রেণীর লোকদের মিলাইয়া মিশাইয়া আপোষে সমবেত চেষ্টায় দেশের জন্য বড় বড় কাজ করিবার যে আশ্চর্য শক্তি ইংরাজ জাতির আছে, নানা ফড়্‌নবিসের চরিত্রে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি সব কাজ নিজে করিতে চাহিতেন, সর্বত্রই স্বয়ং প্রভু, একমেবা-দ্বিতীয়ং হইতে চেষ্টা করিতেন।

এদিকে, এই শেষ যুগে মারাঠা শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র পূণা হইতে উত্তর-ভারতে সরিয়া আসিল, সিন্ধিয়া মালব, দিল্লী এবং রাজপুতানায় প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন, অথচ নানা ফড়্‌নবিস্ তাঁহার সহায়তা না করিয়া হিংসায় বাধা দিতে লাগিলেন। অপর প্রান্তে টীপু সুলতান[1]

অতি প্রবল হইয়া উঠায়, পুণার মারাঠারাজ ভীত, অনেকটা হতবীর্য হইয়া ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; অথচ কর্ণওয়ালিসের সময়ে অকপটভাবে ইংরাজের সহায়তা করিয়া টীপুকে নাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন। অতি-চালাক লোক নিজ চালাকির ফাঁদে পড়িয়া অবশেষে নিজেই মারা যায়। নানা ফড়্নবিসের বিফলতা এই সত্যই প্রমাণ করিতেছে।

তাঁহার মন্ত্রিত্বের শেষে পেশোয়ার অপঘাত মৃত্যু (কেহ বলে আত্মহত্যা), নচ্ছার রঘুনাথের ততোধিক অসার পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাওএর সিংহাসন প্রাপ্তি, সিন্ধিয়া-হোলকারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, এবং অবশেষে ইংরাজের দাসত্ব (১৮০২) এবং ইংরাজ কর্তৃক পেশোয়ারাজ্য জয় করা (১৮১৮) এ সব ঘটনা সকলেরই জানা ইতিহাস। এই সর্বশেষের ১৫ বৎসর (১৮০৩-১৮১৭) ধরিয়া মারাঠা ইতিহাস, পেশোয়ার পক্ষে তীব্র বিষসম এবং আমাদের পক্ষে অসীম লজ্জার ও শোকের বিষয়।

শ্রীযদুনাথ সরকার

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি

সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে অন্য একটি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্রের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা সঙ্গত মনে করি, কারণ এ-যাবৎ যাঁহারা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই এই মাসিক পত্রের অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন না; এমন কি অল্পদিন পূর্ব্বে যখন আমি 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯ সন পর্যন্ত), প্রকাশ করি তখনও আলোচ্য পত্রিকাখানির কথা আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল।

পত্রিকাখানির নাম "খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি"। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২২ সনের মে মাসে। এই "মাসিক সমাচার পত্র" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

> "এই সমাচারপত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রকাশিত হইবে ইহার মূল্য প্রতি কাগজ এক আনা লাগিবেক।"

খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের সহায়তাকল্পে পত্রিকাখানির সৃষ্টি হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

> "সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা করিবার বাসনা আছে অতএব যে কোন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচার প্রকাশের আবশ্যকতা বোঝেন তাহা এখানে পাঠাইলে এই পত্রে ছাপান যাইবেক।"

ইহার পর খ্রীষ্টিয়ানদের উদ্দেশ করিয়া লেখা একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা যাইবে :—

> "অন্য২ দেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিরদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে২ এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্ম্মজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ও মাস২ কিছু২ করিয়া দিবা ও প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করণার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর। যখন শ্রীযুত মেস্তর ম্যাক সাহেব ইগ্লণ্ড ছাড়িলেন তখন কতক গরিব চাকরেরা একত্র হইয়া বাঙ্গালি কোন কেতাব ছাপাইয়া বাঙ্গালি লোককে দিতে ৫ টাকা দিল তাহারা বাঙ্গালি লোকেরদিগকে প্রেম বোধ করিয়া টাকা দিল এই পাঁচ টাকার দ্বারা আমরা এক পুস্তক আরম্ভ করিব এবং এই ভরোসা করি যে তোমরা ক্রমে২ ইহা বৃদ্ধি করিবা।" (পৃ. ৫-৬)

"খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি" পত্রিকাখানির প্রত্যেক সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা পরিমাণ খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা থাকিত। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব বিষয়ে ইহা দ্বিতীয় মাসিক পত্র; এ-বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্র 'গস্‌পেল ম্যাগাজীন' ১৮১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার ফাইল।—

এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা:—১ খণ্ড। ১ সংখ্যা। মে, ১৮২২।
১ খণ্ড। ১০ সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩।
১ খণ্ড। ১৪ সংখ্যা। জুন, ১৮২৩।
২ খণ্ড। ১ সংখ্যা। জানুয়ারি, ১৮২৪।

'বঙ্গদূত' প্রকাশের তারিখ

'বঙ্গদূত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮২৯ সনের ৯ই মে, শনিবার, তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। এত দিন ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ ভ্রমক্রমে "১০ই মে, রবিবার" বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী—এই চারি ভাষায় 'বেঙ্গল হেরল্ড' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নং বাঁশতলা গলির সার্জন্ আর. মণ্টগোমারি মার্টিনকে ১৮২৯ সনের ৫ই মে তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 'বেঙ্গল হেরল্ড' কেবল ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইত; ইহার "সহচর" ছিল 'বঙ্গদূত'। 'বঙ্গদূতে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ ৯ই মে ১৮২৯ (শনিবার)। 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রের প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় উহার অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে 'বঙ্গদূত' সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাওয়া যায়:—

Prospectus of the *Bengal Herald* ... ...

A Native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character, will be subjoined, but distinct, and under the Superintendance of the most talented Hindoos; translations from whose contributions will be occasionally made.

The English portion of the *Herald* will contain *Sixteen Pages*, royal quarto, and the *Native Eight*, which will admit of separate subscription, the former at the rate of *Two* rupees and the latter *One*, monthly.

To be Printed and Published every Saturday night, for the Proprietors,

R. M. Martin, Rammohun Roy,
Dwarkanath Tagore, Neel Rutton Holdar, and
Prussuna Comar Tagore, Rajkissen Sing.

জানা গেল, 'বঙ্গদূত' প্রতি শনিবার রাত্রে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা যে ১৮২৯ সনের ৯ই মে, শনিবার, তারিখে প্রকাশিত হয় তাহার আর একটি প্রমাণ, তৃতীয় সংখ্যার তারিখ ১৮২৯, ২৩এ মে, শনিবার। এই সংখ্যাখানি কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ু চণ্ডীদাসের পদ

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পদগুলির পাঠান্তর দেওয়ায় বিশেষজ্ঞদিগের নিকট পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে। গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে,—"আমরা এ পর্য্যন্ত দুই জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্য জন শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী দীন চণ্ডীদাস। একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুই জন কবির পদ পৃথক্ করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন, 'চণ্ডীদাস' এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব ও রূপের পরিবর্ত্তনে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, এমন পদেরও অভাব নাই। এই সমস্ত আলোচনাপূর্ব্বক আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ যথাসম্ভব পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত করিয়াছি। ভণিতা নাই, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত হওয়া সম্ভব, এইরূপ কয়েকটী পদ বা পদাংশ ইহারই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত পদের রচয়িতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, যেগুলি বড়ু চণ্ডীদাস অথবা দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না, সেগুলি 'চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত' পর্য্যায়ে রক্ষা করিয়াছি, এবং তাহার পরিশিষ্টরূপে বিভিন্ন কবির ভণিতাযুক্ত পদগুলি সাজাইয়া দিয়াছি।" এই খণ্ডেই দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলার কয়েকটী অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেব যাঁহার পদাবলীর আস্বাদনে মাতোয়ারা হইতেন, তিনি বড়ু চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জের আদি-পিক। তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া কথিত শ্রীকৃষ্ণলীলার গানের খণ্ডিত পুথিখানি আমরা পাইয়াছি। তাহার অতিরিক্ত পদগুলির সন্ধানে সম্পাদকদ্বয় বিপুল পরিশ্রমে পদাবলী-সাহিত্য মথিত করিয়া মাত্র ২৪টী পদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" পদটী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও পাওয়া যায়। সম্পাদকদ্বয় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে তাঁহার রচিত পদাবলীর পরীক্ষায় কষ্টিপাথররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমিও এই কষ্টিপাথরের পরখে তাঁহাদের উদ্ধৃত বড়ু-চণ্ডীদাসের পদগুলি টিকিতে পারে কি না, দেখিব। দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞ যুগ্ম-সম্পাদক প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদপরিচয়ের সূত্রগুলি আমাদিগকে বলেন নাই। কাজেই আমি নিজের গবেষণায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদের বিশেষ লক্ষণ যাহা আবিষ্কার করিয়াছি, প্রথমে তাহাই বলিব।

সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান লক্ষণ ভণিতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে খণ্ডিত পদ-সমেত পদসংখ্যা ৪১৫টী। ইহার ৪০৯টী ভণিতাকে সংখ্যার অবরোহক্রমে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়াইবে—

১।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে সাধারণতঃ দশ অক্ষর ছন্দ ও ত্রিপদীতে	...	৭৫
২।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে	...	৫৭
৩।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে	...	৪৯
৪।	বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে	...	৪৯
৫।	বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে	...	২৯
৬।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে	...	২৭
৭।	বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে ত্রিপদীতে	...	২৪
৮।	বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে	...	১১
৯।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে	...	১০
১০।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী—পদের সর্ব্বশেষে পয়ারে	...	৭
১১।	—গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষ চরণে পয়ারের শেষাংশে	...	৪
১২।	বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—পদের সর্ব্বশেষে	...	৩
১৩।	বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—লঘু ত্রিপদীর শেষে	...	৩
১৪।	গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে—সর্ব্বশেষে	...	৩
১৫।	বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস—পদের সর্ব্বশেষে একাবলীতে	...	২
১৬।	বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে	...	২
১৭।	—গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলীচরণে—পদের সর্ব্বশেষে ত্রিপদীতে	...	২
১৮	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আই (আর্য্যা)—পদের সর্ব্বশেষে	...	২
১৯।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস—পদের সর্ব্বশেষে	...	২
২০।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী—পদের সর্ব্বশেষে	...	২
২১।	বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে	...	২
২২।	গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ দেবী বাসলীচরণে—পদের সর্ব্বশেষে	...	২
২৩।	—গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে বন্দিআঁ বাসলী চরণে—পদের সর্ব্বশেষে	..	২
২৪।	বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্ব্বশেষে	...	২
২৫।	বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—সর্ব্বশেষে	...	২

ইহার পর ৩৬টী ভণিতা কেবলমাত্র এক একবার পদের সর্ব্বশেষে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৬। অনন্ত নাম বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল দেবী বাসলীগণে।
২৭। মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥
২৮। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী বাসলী চরণে।
২৯। গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীগণে।
৩০। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।
৩১। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে।
৩২। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।
৩৩। দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।
৩৪। তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ।
৩৫। —বড়ু চণ্ডীদাস গাএ বন্দিআঁ বাসলীচরণে।
৩৬। বাসলী শিরে ধরি গাইল চণ্ডীদাসে।
৩৭। —বড়ু চণ্ডীদাসে গো গাইল বাসলী বরে।
৩৮। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে।

৩৯। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (কাহ্নাঞিঁ ল) দেবী বাসলী বরে।
৪০। বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।
৪১। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ।
৪২। বাসলীবরেঁ চণ্ডীদাস গাএ।
৪৩। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।
৪৪। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে।
৪৫। গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই।
৪৬। —গাইল চণ্ডীদাস দেবী বাসলীর বরে।
৪৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দী রাধা ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
৪৮। গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাসে।
৪৯। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ।
৫০। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীর বরে।
৫১। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শুন বড়ায়ি ল বাসলীগণে।
৫২। —বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল পাআঁ দেবী বাসলীর বরে।
৫৩। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল দেবী বাসলীগণ।
৫৪। বন্দিআঁ দেবী বাসলী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।
৫৫। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দিআঁ।
৫৬। বাসলী বন্দিআঁ এ বড়ায়ি গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।
৫৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস এ॥
৫৮। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী।
৫৯। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥
৬০। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ল।
৬১। বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস॥

এই সকল ভণিতা হইতে আমরা কয়েকটী সিদ্ধান্ত করিতে পারি,—(১) বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় কখন দ্বিজ বা কবি বা দীন উপাধি ব্যবহার করেন নাই। (২) বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় "কহে", "ভণে" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি "গাইল", "গাএ" এই দুইটী ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) তাঁহার ভণিতা পদের শেষ চরণে ব্যবহৃত; "চণ্ডীদাস গাএ শুন গোয়ালিনী কাহ্নাঞি করহ সার"—এইরূপ ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। (৪) কতকগুলি ভণিতা তাঁহার বিশেষ প্রিয়। পূর্ব্বোক্ত প্রথম ১০টী ভণিতায় ৪০৯এর মধ্যে ৩৩৮টী পদ সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষণ ভাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকটী বিশেষ বিষয় আছে, যাহা পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যে অজ্ঞাত। (ক) রাধার পিতামাতার নাম সাগর গোয়ালা এবং পদুমিনী। (খ) রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী। (গ) রাধার পূর্ব্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে। (ঘ) রাধার কোন সখীর নাম নাই। (ঙ) কৃষ্ণের কোন সখার নাম নাই।

তৃতীয় বিশেষ লক্ষণ ভাষা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রেম অর্থে সর্ব্বত্র নেহ, নেহা। এক বার মাত্র "পিরিতী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ।

মোর বোল সুণ অবণাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে॥ (১ম সংস্করণ, ৩২৮ পৃঃ)

বিনোদিনী, শ্যাম (কৃষ্ণ), জনু (যেন) প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অজ্ঞাত।

চণ্ডীদাস-পদাবলী

এক্ষণে এই বিশেষ লক্ষণগুলির সাহায্যে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া "চণ্ডীদাস-পদাবলী"তে উদ্ধৃত পদগুলির বিচার করিব।

১ম পদ।

ইহার ভণিতা—কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সহিত মিল নাই। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের বিপরীত। "জনু" শব্দের প্রয়োগ পরবর্ত্তী বিকৃতি বলিলে চলিবে না। শ্যামবর্ণ দেবা-তনু উপমা নাহিক জনু—এখানে "জনু" স্থানে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "জেন" বা "যেহ্ন" করিলে মিল থাকে না। অধিকন্তু প্রমাণ "বড়ু"র পাঠান্তর "এই" আছে।

২য় পদ।

ইহার ভণিতাসহ শেষ পদ—

ডাহুকি ডাকএ কোকিল কুহরে
চকর ছাড়এ নিস্বাষ।
বাসুলি চরণ সিরেত বন্দিয়া
কহে বড়ু চণ্ডিদাস॥

ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৭নং ভণিতার অনুরূপ। এই পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় এইরূপ হইবে—

ডাহুকী ডাকএ কোকিল কুহলে
চকোর ছাড়এ নিশাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দীআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

এই পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা-বিরহখণ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে হয়।

৩য় পদ।

ইহার আরম্ভ "দেখিলোঁ প্রথম নিশী"। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের পদ। ইহাতে সম্পাদকদ্বয়, মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে "নেহানিলোঁ" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ভ্রান্ত পাঠ; প্রকৃত পাঠ "নেহালিলোঁ"। পুথিতে "ন" ও "ল" প্রায় একরূপ বলিয়া মুদ্রিত পুস্তকের কয়েক স্থলে এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে।

৪র্থ পদ।

ইহার ভণিতা "বড়ু কহে বাসুলীচরণে"। বড়ু চণ্ডীদাসের কোন ভণিতায় কেবল বড়ু নাই। সুতরাং ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে।

৫ম পদ।

ভণিতা—"দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে শুনহ বচন।
দরশন দিয়া রাধা রাখহ জীবন॥"

এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। 'দ্বিজ' স্থানে 'বড়ু' বসাইলেও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া বুঝা যাইবে। ইহার ভাবও বড়ু চণ্ডীদাসের ভাব-বিরুদ্ধ। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কেবল কামজ্বালা, দৈহিক। এখানে বিরহ প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি, আধ্যাত্মিক। সুতরাং পদটী দ্বিজ চণ্ডীদাসের, বড়ু চণ্ডীদাসের নহে।

৬ষ্ঠ পদ।

সম্পাদকদ্বয় বলেন,—"পদটী নিঃসন্দেহভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের"। ভাব নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের অনুরূপ। কিন্তু ইহার ভণিতা—"বড়ু কহে বাসুলীর বরে। বাওন কি চাঁদ ধরে করে॥"—নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। পদটী জাল। সম্পাদকদ্বয়ের ধৃত পাঠ "বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী" ভ্রান্ত। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বীকৃত পাঠ "রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী" প্রকৃত পাঠ।

৭ম পদ।

ভণিতা—"দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাহি সবে এক জন॥"

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা নহে। পদটী দ্বিজ চণ্ডীদাসের।

৮ম পদ।

ভণিতা পদের শেষ চরণে—"কানু পরশিলে যাএ কহে চণ্ডীদাসে।" "কহে চণ্ডীদাসে" স্থলে "গাইল চণ্ডীদাসে" পাঠ থাকিলে পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারিত; কিন্তু এরূপ পাঠ পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান প্রমাণে ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তবে মূলে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ হইলেও হইতে পারে।

৯ম পদ।

ভণিতা পদের শেষ চরণে—"কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই।" এইরূপ ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হয় না। পাঠান্তরেও দেখিতেছি, "দ্বিজ" পাঠ আছে। সুতরাং ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ।

১০ম পদ।

ভণিতা সর্ব্বশেষ চরণে—"কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে"। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে" ভণিতার অনুরূপ। সম্ভবতঃ মূলে এই পাঠই ছিল। এই পদটী আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

১১শ পদ।

ইহার ভণিতা—"চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
পিরীতি-অমিয়া-রসে বধএ পরাণ॥"

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। ইহাতে 'প্রেম' অর্থে 'পিরীতি' শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে।

১২শ পদ।

ভণিতা ত্রিপদীর উপান্ত্য চরণে—

বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥"

এইরূপ ভণিতা কস্মিন্ কালে বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পাবে না। অধিকন্তু প্রমাণ এই যে, "বড়ু চণ্ডীদাসে কয়" ইহার পাঠান্তর "চণ্ডীদাসেতে কয়"।

১৩শ পদ।

ইহার ভণিতা পয়ারে পদের শেষ চরণে—

"সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে"।—ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ।

১৪শ পদ।

ইহার আরম্ভ—"হাহা প্রাণ-প্রিয় সখি কি না হৈল মোরে"।

সম্পাদকদ্বয় বলেন,—"এই সুন্দর পদটী অবিসংবাদিতভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের। কারণ, ইহার প্রথম চারিটী ছত্র শ্রীচৈতন্যদেবের সমক্ষে গীত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে।" ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বহু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য অকাট্য নহে। (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ৯৬-১০১)। তর্কস্থলে যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, চৈতন্যদেবের সমক্ষে ইহার চারি পংক্তি গীত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ত কোথায়ও বলেন নাই যে, ইহা চণ্ডীদাসের পদ। তাহার জন্য একমাত্র দলিল প্রমাণ—১১১১ সালের লিখিত একটি পাতড়া, যাহাতে সমস্ত পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহার ভণিতা পয়ারের শেষ চরণে—

"চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল"—কখনই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা, হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভাষা "হেদে রে", "অবলা" "কালা" (= কৃষ্ণ) বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। সুতরাং আমরা অবিসংবাদিতরূপে বলিতে পারি, পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। প্রথম চারি লাইন যদি বড়ু চণ্ডীদাসের হয়, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

১৫শ পদ।

ইহার ভণিতা পয়ারের শেষ চরণে—"চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া।" ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ভাষার দিক্ হইতে "আগি" (= আগুন) এবং

"পিরীতি" চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। আগি শব্দের পরিবর্ত্তে বড়ু চণ্ডীদাসের "আগুন" কিংবা "আগুনি" বসাইলে মিল ও ছন্দ থাকে না।

১৬শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—"বাসুলী আগেতে করি কহে চণ্ডীদাসে।"—ইহা ভ্রান্ত পাঠ। প্রকৃত পাঠ "বাসুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে" হইবে। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে ইহার ভণিতা—"বাসুলী আদেশে কহে কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসে।" যাহা হউক, ইহার কোনটীই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। বড়ু চণ্ডীদাস কোন ভণিতাতেই "বাসুলী আগেতে" কিংবা "বাস্থলী আদেশে" ব্যবহার করেন নাই। অন্য পক্ষে দীন চণ্ডীদাস কোন স্থলে বাসুলীর দোহাই দেন নাই। পদটী সম্ভবতঃ জাল কিংবা তৃতীয় চণ্ডীদাসের।

১৭শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—"বাসুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে।" পদকল্পতরুতে ইহার ভণিতায় "দ্বিজ চণ্ডীদাসে" আছে। ইহার ও পূর্ব্ববর্ত্তী পদের রচয়িতা একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

১৮শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—"বড়ু চণ্ডীদাস কহে যার যেবা ভায়।" ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহার ভাষাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহার প্রথম চরণে আছে—"পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।" "পিরীতি লাগিয়া" স্থানে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় "নেহাত লাগিয়া" বসান যায়। কিন্তু "নিছনি" শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ বসাইলে মিল থাকে না। বড়ু চণ্ডীদাস "নিছন" শব্দ একবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা উৎপাত অর্থে। যথা—

না জাইব আল রাধা মথুরা নগর।
পথে দুরবার কাহ্নাঞি নান্দের সুন্দর॥
নিছন লইআঁ কাহ্নাঞি থাকু এক বাটে।
আন পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে॥ [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—১ম সং, ১২০ পৃঃ]

সুতরাং পদটী জাল বড়ু চণ্ডীদাসের।

১৯শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষে—"দ্বিজ চণ্ডীদাস পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥"

ইহা স্পষ্টতঃ দ্বিজ চণ্ডীদাসের। পদরসসারে ভণিতা অন্যরূপ—

"কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
বলরামদাস বলে কি কৈল বিধাতা॥"

পদটি বলরামদাসের হইতে পারে।

২০শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষে—

"বাসুলী আদেশে বলে চণ্ডীদাস গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥"

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। এই ভণিতায় "বলে" স্থলে পদকল্পতরুতে পাঠান্তর "দ্বিজ" আছে, অন্য পুঁথিতে "কবি" আছে। পূর্ব্বের ১৬নং ও ১৭নং পদের রচয়িতা এই পদের রচয়িতা হইতে পারেন। ইহার ভাষাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। মরম, মরমী, উচাটন (চরণের শেষে), সম্বিত (চরণের শেষে), এই শব্দগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত। বড়ু চণ্ডীদাস একবার উছাটিণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কামের উচাটন বাণ সম্বন্ধে।

"স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে॥" (২৬৮ পৃঃ)

২১শ পদ।

ভণিতা—

"চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণনিধি আপনি মিলিবে॥"

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। সম্পাদকদ্বয়ও দেখাইয়াছেন যে, "এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে", এই "ছত্রে অক্রূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার ইঙ্গিত আছে। কৃ-কী-তে (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে) কিন্তু অন্যরূপ" ইত্যাদি। তবুও যে কেন তাঁহারা ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ-পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

২২শ পদ।

ইহার ভণিতা—

"কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর বরে।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে॥"

বড়ু চণ্ডীদাস কোন স্থলে পয়ারে পদের উপান্তে ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং এই পদ জাল। এই অনুমান পদকল্পতরুর পাঠদ্বারা দৃঢ় প্রমাণে পরিণত হয়। তাহার পাঠ—

"কত দূরে প্রাণনাথ আছে কোন দেশ।
চম্পতি-গতি বিনু তনু ভেল শেষ।"

সুতরাং ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে চম্পতির পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অথচ সম্পাদকদ্বয় বলেন,—"পদটী নিঃসন্দিগ্ধভাবে বড়ু চণ্ডীদাসেরই বলিয়া মনে হয়।" এমন কি, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরিশিষ্টে (৩২৫ পৃঃ) ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। আমরা জানি, অন্যান্য অনেক কবির পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়াছে।

২৩শ পদ।

ইহার ভণিতা—

"চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥"

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। "প্রীতি" শব্দের প্রয়োগও বড় চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে।

২৪শ পদ।

ইহার ভণিতা—

"চণ্ডীদাস কহে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয় জাগিয়া॥"

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহাতে দুই দুইবার "কালা" (=কৃষ্ণ) শব্দের প্রয়োগ বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। তবে "কাহ্ন" শব্দ স্থলে অনায়াসে "কালা" করা যাইতে পারে। কিন্তু "কানু" পাঠ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ভণিতা-প্রমাণে ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

পরিশিষ্টের পদ

পরিশিষ্টে সম্পাদকদ্বয় ছয়টী ভণিতাহীন পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের। ইহাদের মধ্যে ১, ২, ৩ সংখ্যক পদাংশ শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদিত বলিয়া কথিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আস্বাদিত হইলেই যে বড়ু চণ্ডীদাসের হইবে, তাহার প্রমাণ কি? কেহ বলিবেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদ শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু তিনি যে কখনও অন্যের পদ শুনিতেন না, এমন প্রমাণ কি আছে? চতুর্থ পদে চরণান্তে "বিনোদিনি" পদ আছে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। পঞ্চম পদাংশ সহ সম্পূর্ণ পদ পদরসসারে বংশীবদনের ভণিতায় মিলিতেছে। সুতরাং ইহা বংশীবদনের পদ। ষষ্ঠ পদে আছে, "বৃষভানু-সুতা-তনু ছুঁইলে রাখালে।" সুতরাং ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। সম্পাদকদ্বয় বলেন,—"বৃষভানুর উল্লেখ পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত"। কিন্তু পদকল্পতরুর কোনও পাঠে কিংবা অন্যত্র ইহার পাঠান্তর পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রক্ষেপের প্রমাণ কি?

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ

এই পর্য্যায়ে ৮৪টী পদ আছে। তন্মধ্যে ১৪ সংখ্যক পদটীর ভণিতা—"বড়ু চণ্ডীদাসে গায়"। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভণিতার অনুরূপ। কিন্তু ইহার ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে সাত্ত্বিক প্রেম আছে, মদনজ্বালা নাই। এই পদের প্রথম পয়ার—"সে যে নাগর গুণের ধাম। জপয়ে তোহারি নাম॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথায়ও "গুণের ধাম" বা "গুণধাম" ব্যবহৃত হয় নাই। সেখানে আছে "গুণনিধি"। কিন্তু এই পাঠে মিল থাকে না। সুতরাং ইহা জাল পদ।

চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদপর্য্যায়ের কোনও কোনও পদের ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাসের নাম থাকিলেও যে, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে বড়ু চণ্ডীদাসের নহে, এ বিষয়ে আমরা সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয়ের সহিত একমত।

বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন পদ

এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন পদগুলি পরীক্ষা করিব [দ্রষ্টব্য—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৯ ভাগ, ১৭৬-১৯৪ পৃঃ ; ৪০ ভাগ, ৪৩-৫৪ পৃঃ]

১ম পদ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৯শ ভাগ, ১৮০ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"[ন]ন্দের নন্দন কানু যুন।" ইহার ভণিতা "বা[সুলী] বন্দিয়্যা আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাশে॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দশ অক্ষরযুক্ত ছন্দের শেষ চরণে "গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।" এই ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু "বাসলী বন্দিআঁ আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥" এইরূপ ভণিতা নাই, সুতরাং ইহা জাল।

২য় পদ (১৮২ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"আমি দেব শ্রীহরি। মথো[রাতে] অবতরি॥" ইহার ভণিতা "বাষুলি বন্দিয়্যা [আশে]। গাইল বড়ু চণ্ডিদাশে॥" এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। সুতরাং ইহা জাল। ভাব এবং ভাষায়ও কৃত্রিমতার প্রমাণ আছে। "শ্যামের বচন শুনি। মান গেল বিনোদিনির॥" "তরুমূলে রাধাশ্যাম। দেখিতে সে অনুপাম॥" "[অলি সারি শুক তায়]। রাধা [কৃষ্ণ] গুণ গাএ॥" এইগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। "গোয়ালিনি'র স্থানে "বিনোদিনির" বিকৃত পাঠ কল্পনা করিতে পারা যায়। ইহাতে মিলও বজায় থাকে। কিন্তু "রাধাশ্যাম"এর আসল পাঠ এমন কিছু স্থির করা যায় না, যাহাতে ছন্দ ও মিল অক্ষুণ্ণ থাকে। এ স্থানে বলা বাহুল্য যে, "বিনোদিনী", "রাধাশ্যাম", এইরূপ পাঠ বড়ু চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত। শুকসারিকা রাধাকৃষ্ণের গুণ গান করে,—ইহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের প্রসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।

৩য় পদ (১৮৩ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি।" ইহার ভণিতা পদের সর্ব্বশেষে—"গাইল বাঁড়ু চণ্ডীদাস বাষুলির গন।" ইহা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা —"গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ"। আভ্যন্তরিক প্রমাণেও ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ বটে।

৪র্থ পদ (১৮৭ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে।" ইহার ভণিতা "বাষুলি বন্দিয়্যা বাঁড়ু চণ্ডীদাসে গান।" এই ভণিতা পদের সর্ব্বশেষে বড়ু চণ্ডীদাসের ধরণে; কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। যদি কেহ বলেন, এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের একক ভণিতা ত হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলিব, গান=গান করেন, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় অজ্ঞাত

এবং অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় ইহা "গাস্তি" হইবে। যদি প্রকৃত পাঠ "গাস্তি" বা "গাএ" কল্পনা করা যায়, তবে মিল রক্ষা হয় না। আভ্যন্তরিক প্রমাণও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। প্রথমে "বিনোদিনি" শব্দ; ইহা তত মারাত্মক নয়। কিন্তু "শ্রীশঙ্খক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে"—ইহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ভাব। সুতরাং পদটী জাল।

৫ম পদ (১৮৮ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—"আগো রাধে। সর্ব্বাঙ্গে যুন্দর তোঁহে।" ইহার শেষ অংশ নূতন। পদের ভণিতা—"এইখানে রশে রশে কহে বড়ু চণ্ডীদাশে গাইল জে বাবুলির বরে॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ ভণিতা নাই। কহে স্থানে "গাএ" কিংবা "গাইল" এরূপ পরিবর্ত্তনও সঙ্গত হইবে না। মূল পুস্তক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা খাপছাড়া ঠেকিবে। সুতরাং ইহা জাল।

৬ষ্ঠ পদ (১৯০ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—"বল করিতে চাহুঁ তোরে।" ইহার ভণিতা—"গাইল জে বোঁড়ু চণ্ডীদাশে॥" ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে" ভণিতার বিকৃতি মনে করা যাইতে পারে। "জে" ছন্দের বিরুদ্ধে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ।

৭ম পদ।

এই পদটী মণীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাস-পদাবলীর সম্পাদকদ্বয় ইহা মণীন্দ্রবাবুর আলোচিত পুথি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৩, ১৪ পৃঃ)। ইহার আরম্ভ—"এক কাল হইল মোর যমুনার জল।" ইহার ভণিতা পদের সর্ব্বশেষে—"আর কাল হইলা বটু চণ্ডীদাসে গায়ে"। পয়ারের শেস চরণে এইরূপ ভণিতা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুরূপ বটে। সুতরাং এই পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের হওয়া খুব সম্ভব।

'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'র পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় এই পরিশিষ্টে ১১টী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাঁচটী পদকে তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের বলিতে চাহেন। এক্ষণে এই পদগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

২ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—"রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥"

এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে "পীরিতি" শব্দ আছে,—"যাহার যেমন পীরিতি গাঢ়া"। "নেহা" শব্দ বসাইলে ছন্দ থাকে না। সুতরাং পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের নয়। মণীন্দ্রবাবুও ইহাকে সন্দেহজনক বলিয়া মনে করেন।

৩ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—"অধিক উল্লাসে সখিনী যায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়॥"

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। পদে আছে—সখীর মুখে রাইয়ের দশা শুনিয়া হরি বরজ-গমনে ইচ্ছা করিলেন। এই ভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে। সেখানে দূতী সখী নহে—'বড়ায়ি'; ব্রজের নাম নাই, আছে গোকুল। "সখিনী" শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। মণীন্দ্রবাবু যথার্থই ইহাকে সন্দেহজনক মনে করিয়াছেন।

৬ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—"সহচরী সনে ভণয়ে ভৎ‍র্সয়ে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস।"

ভণিতা "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস" হইলে বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারিত। কিন্তু আভ্যন্তরিক ভাব বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। "যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে, বলিও আমার কথা।" এই পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অজ্ঞাত। মণীন্দ্রবাবুও ইহাকে সন্দেহজনক মনে করেন।

৮ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—"বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখবিলাসে॥"

উপান্তে ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। বিশেষতঃ "বাশুলী আদেশে" বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার ধারা নহে। "অবলা" শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। "চণ্ডীদাস-পদাবলী"তে ইহাকে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদের পর্য্যায়ে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

৯ সংখ্যক পদ।

ইহার আরম্ভ—"ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।" ইহার সমালোচনা "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র বড়ু চণ্ডীদাসের ২২ সংখ্যক পদে করা হইয়াছে। সেখানে দেখান হইয়াছে যে, ইহা কবি চম্পতির রচিত।

উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নাই। আমরা তাঁহার যে সকল খাঁটি পদ পাইয়াছি. তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে। বড়ু চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত কবিতা হিসাবে পদাবলী রচনা করেন নাই। তাঁহার পদগুলি ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত।*

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

* ১৩৪৮।১৯এ ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' সম্পর্কে বক্তব্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র সম্পাদন-কার্যে নিযুক্ত হইয়া, আমরা যথাশক্তি "চণ্ডীদাস" এই নামে প্রচলিত পদসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক, "চণ্ডীদাস"-সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের উপস্থিত জ্ঞান-মত "চণ্ডীদাস-পদাবলী"-র শ্রেণী-বিভাগে প্রবৃত্ত হই। "চণ্ডীদাস"-রচিত বা ভণিতা-যুক্ত পদ আলোচনা করিয়া, একাধিক "চণ্ডীদাস"-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মত সুদৃঢ় হয়। আমাদের বিশ্বাস, অন্ততঃ তিন জন "চণ্ডীদাস" ছিলেন। ইঁহাদের উপনাম বা উপাধি অনুসারে ইঁহাদিগকে [১] "বড়ু", [২] "দ্বিজ" ও [৩] "দীন" নামে পৃথক্ রূপে পরিচিত করিতে হয়। "বড়ু" ছিলেন আদি বা প্রথম চণ্ডীদাস, এবং ইনি চৈতন্যদেবের পূর্বগামী ছিলেন, চৈতন্যদেব ইঁহারই রচিত পদ আস্বাদন করিতেন; সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৃহত্তোষণী টীকায় ইঁহারই নাম করিয়া গিয়াছেন। "দ্বিজ" ও "দীন" চণ্ডীদাসদ্বয় চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগের; ইঁহাদের মধ্যে "দীন" চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৩৩ সালের পৌষের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ও তদনন্তর ১৩৪২ সালের বৈশাখ-সংখ্যার "বঙ্গশ্রী"তে, এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ কর্তৃক ১৩৩৩ সনের চতুর্থ সংখ্যার "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"-তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় "দীন"-চণ্ডীদাসের পদ, প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলী হইতে নির্বাচিত করিয়া পৃথক্ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ("দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)। এরূপ চেষ্টা আমাদের আরব্ধ "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র সংস্করণেরও অঙ্গীভূত, আমাদের প্রকাশিত প্রথম খণ্ডেই তাহার সূচনা করিয়াছি। "দ্বিজ"-চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, এবং "চণ্ডীদাস-পদাবলী" সম্পাদন আরম্ভ করিবার কালে আমাদের অনুমান সম্বন্ধে আমরা আরও সন্দিগ্ধ ছিলাম বলিয়া, "দ্বিজ"-চণ্ডীদাস-রচিত পদ তথা অন্য কবির রচিত চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদ, "চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত" শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলাম।

এই তিন চণ্ডীদাসের মধ্যে "বড়ু"-কে পৃথক্ করার চেষ্টা আমাদের সংস্করণের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে আমরা "বড়ু"-চণ্ডীদাস-রচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থকে প্রমাণ বা কষ্টিপাথর স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের বক্তব্য-সমেত আমাদের সম্পাদিত সমগ্র "চণ্ডীদাস-পদাবলী", এক সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল; তাহা করিতে পারিলে পাঠক ও সমালোচকগণের পক্ষে সুবিধা হইত। সাধারণ পাঠক এই একাধিক চণ্ডীদাসের প্রস্তাবনায় একটু যে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্য বোধ হয়, আমাদের "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র তেমন উপযোগী সমালোচনা আমরা দেখি নাই। বিষয়টী যেরূপ জটিল, তাহাতে ইহার সম্যক্ আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণেরই অধিকার-ভুক্ত

থাকিবে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে সার্থক গবেষণা করিয়া অল্প যে কয়জন ব্যক্তি এই অধিকার লাভ করিয়াছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় যে চণ্ডীদাস-সমস্যার নিরসনে যে প্রয়াস আমরা করিয়াছি, শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রচলিত "চণ্ডীদাস"-পদাবলার পদগুলির মধ্যে যেগুলিতে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে "বড়ু"-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের সঙ্গে মিল আমরা পাইয়াছি, সেই মিল বিচার করিয়া পদাবলীর পদ-বিশেষ "বড়ু"-চণ্ডীদাস-রচিত কি না, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা আমাদের বিচার-পদ্ধতি অনুসারে, প্রচলিত সহস্রোর্দ্ধ পদ-মধ্যে মাত্র ২৪টীকে "বড়ু" চণ্ডীদাসের বলিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের পদ্ধতি আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। যাঁহারা "চণ্ডীদাস" নামে রামীর সাধন-সহচর কোনও সাধককে বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক দেবতা-রূপে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই পদ্ধতি অনুমোদন লাভ করিবে না, এবং প্রচলিত শত শত পদের মধ্যে মাত্র ২৪টী পদ আদি বা "বড়ু"-চণ্ডীদাসের বলিয়া তাঁহাদের সমক্ষে ভেট দিলে, এই সংখ্যাল্পতা তাঁহাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে; বিশেষতঃ যখন এই অল্প সংখ্যার মধ্যে তাঁহারা অনেকগুলি লোকপ্রিয় "চণ্ডীদাস"-রচিত পদ পাইবেন না। কিন্তু অপর পক্ষে. ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাদের প্রস্তাবিত এই চব্বিশটী পদের দুই একটী ভিন্ন অপরগুলিকেও "বড়ু"-চণ্ডীদাসের খাতে ফেলিতে নারাজ। এক হিসাবে, আমাদের পদ্ধতি তিনি আরও অনেক অধিক সতর্কতার সহিত চালাইতে চাহেন; সুতরাং পদ্ধতি তাঁহার অনুমোদন পাইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে হয়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে-সব আপত্তি তুলিয়াছেন, সেগুলি এই অতিসতর্কতা-প্রসূত, এবং একদেশদর্শী। তিনি ভণিতার উপরেই বড় বেশী জোর দিয়াছেন—বড় বেশী কেন, প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে অন্য কোনও ভণিতা পাইলে, তাহা মানিতে তিনি রাজী নহেন। অথচ প্রভূত পরিশ্রম করিয়া এই এক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতার যে তালিকা তিনি কষিয়া দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ৬১ রকম ভণিতা (অবশ্য প্রায় সর্বত্রই "চণ্ডীদাস", "বড়ু", ও "বাসলী"—এই নামগুলি আছে) পাওয়া যাইতেছে। এই ৬১ প্রকার ভণিতার বাহিরে আরও দুই পাঁচটী অন্য ধরণের ভণিতা যে ছিল না এবং পাওয়া যাইবে না, এরূপ বলা অযুক্তিযুক্ত। তাহার পর, ভণিতার বিশুদ্ধি আমরা সর্বত্র আশা করিতে পারি না। কীর্তনিয়াদের সুবিধা অনুসারে গানের সুর, তাল ও কথা সবই বদলাইয়া গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভণিতায় "বড়ু" হইয়া গিয়াছেন "দ্বিজ", "দ্বিজ" হইয়া গিয়াছেন "বড়ু"—বহু স্থলে এরূপ হইয়াছে। যদি পদটীর মধ্যে ভাবে, ভাষায়, বিষয়-বস্তুর অবতারণার প্রকারে, অলঙ্কারে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঐক্য পাই, তাহা হইলে ভণিতাকে গৌণ করিয়াই দেখিতে হয়। আমরা যে ২৪টী পদ "বড়ু"র বলিয়া মনে করিয়াছি, সে কয়টীর প্রত্যেকটীর নীচে কি কি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত সামঞ্জস্য আমরা পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি যখন শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব

প্রত্যেক পদটী লইয়া বিচার করিয়াছেন, আমরাও তাহা করিব। তবে "চণ্ডীদাস"-পদাবলীর হাজার বার শ' পদ আলোচনা করিয়া দেখিয়া ভণিতাকে আমরা একটী স্থান দিলেও, প্রধানতম স্থান দিতে রাজী নহি। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে "বড়ু"র রচিত যে কয়টী পদের স্থান পাওয়া সম্ভব হইয়াছে, সে কয়টী নিশ্চয়ই অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়ায়ই এইরূপ হইয়াছে; এবং লোকপ্রিয় পদের ভণিতা লইয়া যে কত গোলযোগ, তাহা আমাদের ধৃত "চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত" পদশ্রেণীর পারিশিষ্ট-রূপে প্রদত্ত পদগুলির ভণিতা আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভণিতা সম্বন্ধে যে একটী কথা বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। বড়ু চণ্ডীদাস যে কেবল "চণ্ডীদাস গাইল" বা "বড়ু চণ্ডীদাস গায়"—এইরূপ সামান্য বা নিরপেক্ষ উক্তিতেই নিজের পদ শেষ করিয়াছেন, বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে নিজের আত্মীয়তা প্রকট করেন নাই, অথবা রাধা বা শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহাদের উভয়ের কাহাকেও আহ্বান করিয়া বা উদ্দেশ করিয়া স্বনামে কিছু বলেন নাই, এ কথা ঠিক নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই একটী ভণিতায় বেশ বুঝা যায়, পরবর্ত্তী চণ্ডীদাস-পদাবলীর অনুরূপ ভণিতা বড়ু-ও ব্যবহার করিতেন। যথা—

কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএল,
পাআঁ দেবী বাসলীর বরে॥ (পৃঃ ২৮৮)

(এখানে "গাএ" ক্রিয়ার কর্ম্ম "কাহ্নের বিলাপ")।

সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।
জিআও রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে॥ (পৃঃ ২৮৬)

(এখানে "জিআও রাধাক" অক্লেশে চণ্ডীদাসের উক্তি বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি)।

এতদ্ভিন্ন, ভণিতার পরেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দুই এক ছত্র—যথা একটী পয়ার—পাইতেছি। ইহারই অবলম্বনে পরবর্ত্তী অনুলেখক বা কীর্ত্তনিয়ার হাতে মূল ভণিতার বিকৃতি ও বাহুল্য হইয়া থাকিতে পারে। যথা—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর।
তখনে রাধাক দিল মেলানি।
নাচিতেঁ গাইতেঁ বুলে চক্রপাণী॥ (পৃঃ ২৯২)

এতৎসম্পর্কে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" ইত্যাদিক পদটী (আমাদের বইয়ের তৃতীয় পদ) ও পরবর্ত্তী কালের পদাবলীতে রক্ষিত তাহার রূপান্তর, এই উভয়ের ভণিতাগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারা যায়। "রস" এই শব্দটী দ্বারা পরবর্ত্তী রূপান্তরগুলিতে ভণিতা পূর্ণ ও ছন্দোবিষয়ে নির্ভুলরূপেই পাইতেছি; প্রাচীন রূপে "রস গাইল" রূপ ছিল কি না, কে জানে।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব "বড়ু"-চণ্ডীদাসের পদ-নির্বাচনের দ্বিতীয় পথস্বরূপ এই সকল পদগত ভাব-আলোচনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঠিক "ভাব" ধরেন নাই—তিনি

থাকিবে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে সার্থক গবেষণা করিয়া অল্প যে কয়জন ব্যক্তি এই অধিকার লাভ করিয়াছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় যে চণ্ডীদাস-সমস্যার নিরসনে যে প্রয়াস আমরা করিয়াছি, শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রচলিত "চণ্ডীদাস"-পদাবলীর পদগুলির মধ্যে যেগুলিতে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে "বড়ু"-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের সঙ্গে মিল আমরা পাইয়াছি, সেই মিল বিচার করিয়া পদাবলীর পদ-বিশেষ "বড়ু"-চণ্ডীদাস-রচিত কি না, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা আমাদের বিচার-পদ্ধতি অনুসারে, প্রচলিত সহস্রোর্ধ্ব পদ-মধ্যে মাত্র ২৪টীকে "বড়ু" চণ্ডীদাসের বলিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের পদ্ধতি আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। যাঁহারা "চণ্ডীদাস" নামে রামীর সাধন-সহচর কোনও সাধককে বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক দেবতা-রূপে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই পদ্ধতি অনুমোদন লাভ করিবে না, এবং প্রচলিত শত শত পদের মধ্যে মাত্র ২৪টী পদ আদি বা "বড়ু"-চণ্ডীদাসের বলিয়া তাঁহাদের সমক্ষে ভেট দিলে, এই সংখ্যাল্পতা তাঁহাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে; বিশেষতঃ যখন এই অল্প সংখ্যার মধ্যে তাঁহারা অনেকগুলি লোকপ্রিয় "চণ্ডীদাস"-রচিত পদ পাইবেন না। কিন্তু অপর পক্ষে, ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাদের প্রস্তাবিত এই চব্বিশটী পদের দুই একটী ভিন্ন অপরগুলিকেও "বড়ু"-চণ্ডীদাসের খাতে ফেলিতে নারাজ। এক হিসাবে, আমাদের পদ্ধতি তিনি আরও অনেক অধিক সতর্কতার সহিত চালাইতে চাহেন; সুতরাং পদ্ধতি তাঁহার অনুমোদন পাইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে হয়।

// কিন্তু আমাদের মনে হয়, শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে-সব আপত্তি তুলিয়াছেন, সেগুলি এই অতিসতর্কতা-প্রসূত, এবং একদেশদর্শী। তিনি ভণিতার উপরেই বড় বেশী জোর দিয়াছেন—বড় বেশী কেন, প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে অন্য কোনও ভণিতা পাইলে, তাহা মানিতে তিনি রাজী নহেন। অথচ প্রভূত পরিশ্রম করিয়া এই এক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতার যে তালিকা তিনি করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ৬১ রকম ভণিতা (অবশ্য প্রায় সর্বত্রই "চণ্ডীদাস", "বড়ু", ও "বাসলী"—এই নামগুলি আছে) পাওয়া যাইতেছে। এই ৬১ প্রকার ভণিতার বাহিরে আরও দুই পাঁচটী অন্য ধরণের ভণিতা যে ছিল না এবং পাওয়া যাইবে না, এরূপ বলা অযুক্তিযুক্ত। তাহার পর, ভণিতার বিশুদ্ধি আমরা সর্বত্র আশা করিতে পারি না। কীর্তনিয়াদের সুবিধা অনুসারে গানের সুর, তাল ও কথা সবই বদলাইয়া গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভণিতায় "বড়ু" হইয়া গিয়াছেন "দ্বিজ", "দ্বিজ" হইয়া গিয়াছেন "বড়ু"—বহু স্থলে এরূপ হইয়াছে। যদি পদটীর মধ্যে ভাবে, ভাষায়, বিষয়-বস্তুর অবতারণার প্রকারে, অলঙ্কারে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঐক্য পাই, তাহা হইলে ভণিতাকে গৌণ করিয়াই দেখিতে হয়। আমরা যে ২৪টী পদ "বড়ু"র বলিয়া মনে করিয়াছি, সে কয়টীর প্রত্যেকটীর নীচে কি কি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত সামঞ্জস্য আমরা পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি যখন শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব

প্রত্যেক পদটী লইয়া বিচার করিয়াছেন, আমরাও তাহা করিব। তবে "চণ্ডীদাস"-পদাবলীর হাজার বার শ' পদ আলোচনা করিয়া দেখিয়া ভণিতাকে আমরা একটী স্থান দিলেও, প্রধানতম স্থান দিতে রাজী নহি। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে "বড়ু"র রচিত যে কয়টী পদের স্থান পাওয়া সম্ভব হইয়াছে, সে কয়টী নিশ্চয়ই অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়ায়ই এইরূপ হইয়াছে, এবং লোকপ্রিয় পদের ভণিতা লইয়া যে কত গোলযোগ, তাহা আমাদের ধৃত "চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত" পদশ্রেণীর পারিশিষ্ট-রূপে প্রদত্ত পদগুলির ভণিতা আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভণিতা সম্বন্ধে যে একটী কথা বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। বড়ু চণ্ডীদাস যে কেবল "চণ্ডীদাস গাইল" বা "বড়ু চণ্ডীদাস গায়"—এইরূপ সামান্য বা নিরপেক্ষ উক্তিতেই নিজের পদ শেষ করিয়াছেন, বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে নিজের আত্মীয়তা প্রকট করেন নাই, অথবা রাধা বা শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহাদের উভয়ের কাহাকেও আহ্বান করিয়া বা উদ্দেশ করিয়া স্বনামে কিছু বলেন নাই, এ কথা ঠিক নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই একটী ভণিতায় বেশ বুঝা যায়, পরবর্ত্তী চণ্ডীদাস-পদাবলীর অনুরূপ ভণিতা বড়ু-ও ব্যবহার করিতেন। যথা—

কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএল,
পাআঁ দেবী বাসলীর বরে॥ (পৃঃ ২৮৮)

(এখানে "গাএ" ক্রিয়ার কর্ম্ম "কাহ্নের বিলাপ")।

সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।
জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে॥ (পৃঃ ২৮৬)

(এখানে "জিআঅ রাধাক" অক্লেশে চণ্ডীদাসের উক্তি বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি)।

এতদ্ভিন্ন, ভণিতার পরেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দুই এক ছত্র—যথা একটী পয়ার—পাইতেছি। ইহারই অবলম্বনে পরবর্ত্তী অনুলেখক বা কীর্ত্তনিয়ার হাতে মূল ভণিতার বিকৃতি ও বাহুল্য হইয়া থাকিতে পারে। যথা—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর।
তখনে রাধাক দিল মেলানি।
নাচিতেঁ গাইতেঁ বুলে চক্রপাণী॥ (পৃঃ ২৯২)

এতৎসম্পর্কে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" ইত্যাদিক পদটী (আমাদের বইয়ের তৃতীয় পদ) ও পরবর্ত্তী কালের পদাবলীতে রক্ষিত তাহার রূপান্তর, এই উভয়ের ভণিতাগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারা যায়। "রস" এই শব্দটী দ্বারা পরবর্ত্তী রূপান্তরগুলিতে ভণিতা পূর্ণ ও ছন্দোবিষয়ে নির্ভুলরূপেই পাইতেছি ; প্রাচীন রূপে "রস গাইল" রূপ ছিল কি না, কে জানে।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব "বড়ু"-চণ্ডীদাসের পদ-নির্বাচনের দ্বিতীয় পথস্বরূপ এই সকল পদগত ভাব-আলোচনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঠিক "ভাব" ধরেন নাই—তিনি

বিষয়-বস্তুকেই (অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গের ব্যক্তি ও ঘটনাকেই) ভাব বলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীরাধার পিতামাতার নাম কি ছিল, তাঁহার নামান্তর যে চন্দ্রাবলী ছিল, "বড়ু", "দ্বিজ" ইত্যাদির পদের পৃথকৃত্ববিধানের জন্য এ সমস্ত অবশ্য প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ, কিন্তু এগুলি ভাব-বিশ্লেষগত প্রমাণ নহে। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র আমরা পাই, এবং তাঁহারা যে ভাবে তখনকার বৈষ্ণবদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যযুগের পূর্ববর্তী আদি বৈষ্ণবযুগের কথা। চৈতন্যযুগের পূর্বেকার ভাবধারা যে পরবর্তী রসবিচার ও রস-সাহিত্য-পুষ্ট সূক্ষ্মতর বৈষ্ণব ভাবধারা হইতে বিভিন্ন ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। পরবর্তী বৈষ্ণব কবি ও আচার্য এবং কীর্তনিয়াগণ যে আদি-কবি "বড়ু"-চণ্ডীদাসের পদ ভুলেন নাই, চৈতন্যদেব-প্রদর্শিত পথে তাঁহারাও যে "বড়ু"-র পদ আস্বাদন করিতেন, অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার প্রমাণ প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে সুস্পষ্ট। চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত বহু পদকে "বড়ু"-র রচিত বলিতে না পারিলেও, সেগুলিতে আমরা বড়ুর ভাবের ছায়া, কচিৎ বা ভাষার ঝঙ্কার পাইতেছি। এরূপ স্থলে, যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-সুলভ ভাবধারা বা ভাবপারম্পর্য দেখি, সেখানে যদি ভাষায়ও তাহার সমর্থন পাই, আমরা সেখানে মূলতঃ "বড়ু"-রই পদ পাইতেছি, তাহা ধরিয়া লইতে পারি। ভাব-বিষয়ে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য; "বড়ু"-র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-বিরহখণ্ডের বিরহের পদগুলিই ভাবে গভীরতম, উচ্চতম; অনুরূপ বিরহ-বিষয়ক পদই ভাষায় ও ছন্দে (পয়ার ছন্দ এইপ্রকার পদে বেশী করিয়া প্রযুক্ত দেখি) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমপর্যায় হওয়ায়, ঐ পদগুলিকেই বিশেষ ভাবে "বড়ু"-র বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা প্রণোদিত হইয়াছি। এই "বিরহ" পর্যায়কেই পরবর্তী কালে "আক্ষেপানুরাগ" এই নূতন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; এবং "চণ্ডীদাস"-ভণিতাযুক্ত ঐ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদগুলির মূল উৎস হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশী-খণ্ডের ও বৃন্দাবন-খণ্ডের কয়েকটী পদ, এবং রাধাবিরহ-খণ্ডের পদ। ঐরূপ বিরহ-বিষয়ে "বড়ু-"র রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বহির্ভূত অন্য পদ, প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমানের পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "রাধার পূর্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে।" কথাটী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় নহে। আদিতে রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরাগ দেখান হইলেও, সে বিরাগ ক্রমে মৌখিক বিরাগে যে দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই আছে; এবং পরে আমরা বংশীখণ্ড ও শেষের অন্য অংশে দেখিতে পাই যে, সেই প্রারম্ভিক বিরাগাভাস শেষে গভীর অনুরাগে পর্যবসিত হইয়াছে। আমরা অন্য পর্যায়-আখ্যার অভাবে, "শ্রীরাধার পূর্বরাগ" শীর্ষক প্রচলিত পর্যায়ে যে পদটীর স্থান দিয়াছি (আমাদের "চণ্ডীদাস পদাবলী"-র "বড়ু"-চণ্ডীদাসের পদমধ্যে প্রথম পদ), তাহাকে অক্লেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডের প্রথম কয়েকটী পদের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়,—ভাবের ব্যত্যয় হয় না।

আমাদের নির্বাচিত "বড়ু-"র পদে রাধার সখী বা শ্রীকৃষ্ণের সখার নাম নাই।

ভাষা সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ্ সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি। "পিরীতি" শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চারি বার আছে, একবার নহে—পৃঃ ১৬৫, পৃঃ ২৭৯,

পৃঃ ৩২৮ (শহীদুল্লাহ্ সাহেব-ধৃত) ও পৃঃ ৩৮২। তবে আমাদের বক্তব্য, যখন আমরা নকলনবিস ও গায়কের মারফৎ প্রাচীন পদের অল্প-বিস্তর বিকৃতির সম্ভাবনা মানিয়াই লইতেছি, তখন পরবর্তী কালে বহুল-প্রচলিত "বিনোদিনী", "শ্যাম", "পিরীতি" প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপ্রাপ্ত বা অন্য অর্থে প্রাপ্ত শব্দ "বড়ু"-র পদে যে স্থান করিয়া লইবে, উহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। আমাদের নির্বাচিত ২৪টী পদকে আমরা যথাযথ "বড়ু"-র স্বহস্ত-লিখিত বা স্বমুখ-গীত রচনার অবিকৃত রূপ বলিতেছি না—আমরা কেবল এইটুকুই বলি যে, আক্ষরিক ভাবে নহে, মোটামুটি ভাবে এই পদগুলিতে বড়ুরই রচনা আমরা পাইতেছি। সমসাময়িক পুথি না পাইলে, প্রাচীন বাঙ্গালা কবির রচনা-সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কিছু বলা চলে না।

এক্ষণে "বড়ু"-চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত ২৪টী পদ সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অভিমতের আলোচনা একাদিক্রমে করিব।

প্রথম পদ—ইহাকে পূর্বরাগের পর্যায়ে আমরা ফেলিয়াছি বলিয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে আপত্তি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা উপরে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। "পূর্বরাগ" এই পর্যায়-আখ্যা আমাদের দেওয়া। উহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশী-খণ্ডের পদের সহিত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। অন্য নাম বা বর্ণনার অভাবে "পূর্বরাগ" বলিয়া ধরা হইয়াছিল। নিম্নে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটী পদ তুলিয়া দিলাম, শহীদুল্লাহ্ সাহেব উহাকে কোন্ পর্য্যায়ে ফেলিবেন ?—

> বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে।
> ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদনকমলে ॥
> আঙ্গভঙ্গে কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
> এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে ॥—ইত্যাদি (পৃঃ ২৪৩, যমুনা-খণ্ড)।

রসশাস্ত্রের বিচারে এই পদকে "পূর্বরাগ" পর্যায়েই ফেলিতে হয়। তদনুরূপ আর একটী অংশের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পৃঃ ২৩৮—

> নেহে ভবেঁ আকুলী রাধিকা ততিখনে। নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে ॥
> দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সময়ে। সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজভয়ে ॥
> কাহ্নাঞি দেখিআঁ আর যত গোপীগণে। সন্ধে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে ॥

"শ্যামবর্ণ দেবা-তনু" ইত্যাদি অংশকে আমরা "বড়ু" চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে করি না। ইহা পরবর্তী কালের পাঠবিকৃতি-জাত বলিতে হইবে। কিন্তু তৃতীয় ত্রিপদীর শেষ অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগের আদিমতার পরিচায়ক ("বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা")।

চতুর্থ পদ—এখানে শহীদুল্লাহ্ সাহেব ভণিতায় আপত্তি করিয়াছেন। ছন্দের অনুরোধে যে সুপরিচিত নাম বাদ দেওয়া যাইতে পারে, বিশেষতঃ পালা গানে, এ কথা শহীদুল্লাহ্ সাহেব যদি না মানেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই উৎকৃষ্ট পদটীতে প্রাচীন রচনার ও প্রাচীন ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট ; ইহার ভাষাকে বানানে ও দুই-একটী প্রাচীন প্রতিরূপ আনিয়া পরিবর্তিত করিয়া দিলে, ইহাকে সহজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ-খণ্ডের মধ্যে স্থান

দিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভণিতার প্রমাণ অন্যতম প্রমাণ হইলেও, প্রধান প্রমাণ নহে। "কানু, মুঞী, বাঢ়য়ে, বাজিছে, দারুণ, রা, বৈরী বাসিয়ে, ছাড়িয়ে" পদগুলি এবং পদের মধ্যে "গো" (=শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "গ") শব্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

পঞ্চম পদ—ভণিতার কথা ছাড়িয়া দিলে, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই পদে আপত্তি ইহার ভাব লইয়া। এই পদটীর প্রথম অংশটীতে (প্রথম তিনটী পয়ারে) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাব বিদ্যমান, তুলনীয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকা-খণ্ডের প্রথম পদ (১৩৯ পৃঃ)। ভাব ও শব্দের প্রতিধ্বনিও প্রথম দুই পয়ারে আছে। শেষ তিনটী পয়ার সম্বন্ধে আমরা জোর দিতে চাহি না—এখানে পরবর্ত্তী কালে পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হওয়া অসম্ভব নহে।

ষষ্ঠ পদ—আমাদের মনে হয়, এই পদ সম্বন্ধে কোনও আপত্তি টিঁকিতে পারে না। উপরে চতুর্থ পদ সম্বন্ধে আমাদের কৈফিয়ৎ দ্রষ্টব্য। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, উহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেরই পদ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত সাদৃশ্য আমরা পদের আলোচনার শেষে দেখাইয়াছি।

এই পদে "বাথান" পাঠ আমাদের গৃহীত পাঠে রাখিয়াছি। কারণ, "বাথান" হইলে পরবর্ত্তী "পাঁতর" শব্দের সার্থকতা আইসে, এবং "পাথারে" অপেক্ষা "পাঁতরে" পাঠটীই সঙ্গত ও অধিকতর অর্থদ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পথে ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইবার অনুযোগ রাধা করিতেছেন, যথা—

পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।...
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী॥ (পৃঃ ২৫১)।

আমরা এই পদটী "নিঃসন্দেহভাবে বড়ু-চণ্ডীদাসের" কি না, তৎসম্বন্ধে অন্য সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সপ্তম পদ—ভণিতার সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব উক্তি দ্রষ্টব্য। পদটীর অনুরূপ ছত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে এবং মণীন্দ্র বাবুর নবাবিষ্কৃত পুথি হইতে আমরা উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। ইহা বড়ু-চণ্ডীদাসেরই—তবে ভণিতা পরবর্ত্তী কালের হওয়া সম্ভব।

অষ্টম পদ—ভণিতা ভিন্ন ইহাকে বড়ুর বলিতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপত্তি নাই।

নবম ও দশম পদ—ভণিতা ভিন্ন অন্য দিক্ দিয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই পদের বিচার করেন নাই। তদনুরূপ দশম পদটীকে বড়ুর বলিয়া গ্রহণ করিতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপত্তি নাই।

একাদশ, ত্রয়োদশ পদ—ভণিতায় আপত্তি। পূর্ব্বমন্তব্য দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ পদের ছত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছত্রের ভাব-গত ঐক্য লক্ষণীয়।

• **চতুর্দ্দশ পদ**—এখানেও মূলতঃ ভণিতায় আপত্তি। ভাষায় আপত্তি হইতে পারে না; কতকগুলি শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষণীয়। "কানু"="কাহ্নু" আছে; "কালা" শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে; যথা—"আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা"; "অভাগি" পাইতেছি, "অভাগিনী" অর্বাচীন রূপ; "কেনে"="কেহ্নে"; "অবলা" না থাক্, "অবল" শব্দ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। একমাত্র "হেদে" শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই না; কিন্তু তাহাতেই এই পদকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। চৈতন্যদেবের আস্বাদিত পদ; দ্বিশতাধিক বৎসর পূর্বেকার কাগজে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পূরণ করিয়া দেওয়া। সহজে ইহাকে বাদ দেওয়া চলিবে না।

পঞ্চদশ পদ—ভণিতার কথা ধরিলাম না—কিন্তু এই পদের ভাষার প্রাচীনত্ব শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। "ননদী (ননদিনী নহে), দুখ বাসি, কালা কানু", এগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রতিধ্বনি। "আগি" শব্দ প্রাকৃতজ তদ্ভব রূপ—অর্ধতৎসম "আগুনি, আগুন" অপেক্ষাও ভাষায় প্রাচীনতর রূপ (*অগ্নিকা > অগ্‌গিআ > অগ্‌গিঅ > আগী, স্ত্রীলিঙ্গে)—চর্যাপদে "আগী" মিলে; এই প্রাচীন রূপকে শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই পদের প্রাচীনত্বের অন্তরায়-স্বরূপ মনে করিতেছেন। "পিরীতি"—"নেহার" বা (স্নেহের) এইরূপ কোনও পুরাতন শব্দের পরিবর্তে আসিয়া থাকিতে পারে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ পদ—ষোড়শ পদে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত ভণিতার পাঠ সমীচীনতর। এই পদদ্বয়ের ভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদেও মিলিতেছে; ভণিতায় "বাসলী"র নামও আছে। আমরা বড়ু-চণ্ডীদাসের বলিয়া গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কিছু দেখিতেছি না।

অষ্টাদশ পদ—"নিছন—নিছনি", একই শব্দের রূপান্তর। পদটীতে "কানু" আছে, "নিছিয়া" শব্দ আছে (তুলনীয় "নিশিবোঁ"—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), "আরতি" আছে—এগুলি বড়ু-চণ্ডীদাসেরই স্মারক। ভণিতায়ও কেবল "বড়ু"-চণ্ডীদাস পাইতেছি। ভাবে ও ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতার হইতে বাধা দেখি না। এই পদস্থিত "পিরীতি" শব্দের সম্ভাব্য সমাধান শহীদুল্লাহ্ সাহেবই করিয়া দিয়াছেন।

উনবিংশ পদ—পদটীর ভাব, ভাষা, ছন্দ, তিনই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ। আপত্তি "শ্যাম" ও ভণিতার "দ্বিজ", এই শব্দদ্বয়ে। অন্য প্রমাণ বলবত্তর।

বিংশ পদ—"মরম" শব্দটী একাধিক বার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে; যথা—

ব্রতের মরম আইহণের মাএ জাণে।

"উছাটিন", "উচাটন" শব্দের প্রাচীনতর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনানুমোদিত রূপ হইতে পারে। কিন্তু "ঘুণে"র সহিত "উচাটনে"র মিল হইলে, "উছাটিনে"র সহিতও হইতে বাধা নাই। ভণিতার "বাসলী" শব্দ লক্ষণীয়। উনবিংশ পদের সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

একবিংশ পদ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সম্পূর্ণ রাধাকৃষ্ণলীলা পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবার পরের অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খণ্ডিত। আমাদের মন্তব্যের দ্বারা মূল পদের ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুগামিতা খণ্ডিত হয় না।

দ্বাবিংশ পদ—চম্পতিপতির ভণিতা সম্বন্ধে উক্ত পদের নিম্নে আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। আজ পর্য্যন্ত চম্পতি-ভণিতার কোনও বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায় নাই, উপরন্তু আমাদের আলোচিত তিনখানি পুথিতে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাইয়াছি। এই ভণিতা পাল্টাইয়া

দিলে বোধ হয়, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপত্তির মুখ্য কারণ দূর হইবে, এবং তাহা হইলে সমস্ত পদটাই শ্রীরাধিকার উক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু উপান্ত ছত্রে বা উপান্ত পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও বড়ু-চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেই দিয়াছি। এই পদের দুই একটী ছত্রও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে, আমরা তাহা আমাদের টিপ্পনীতে দেখাইয়াছি। "পাখী হঞা উড়ি যাওঁ" ইত্যাদি—এই ভাবের পংক্তি বড়ু-চণ্ডীদাসের প্রিয় ছিল, একাধিক বার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহা মিলে।

ত্রয়োবিংশ পদ—পূর্ব পূব পদের সম্বন্ধে আমাদের উক্তি দ্রষ্টব্য।

চতুর্বিংশ পদ—ভণিতায় আপত্তি। ভাবে পদটী যে "অপেক্ষাকৃত আধুনিক-গন্ধী", তাহা আমরা আমাদের মন্তব্যে স্বীকার করিয়াছি।

পরিশিষ্টের পদ—এই পদ বা পদাংশগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া জোর করা চলে না, সেই জন্যই আমরা এগুলিকে "পরিশিষ্ট" শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। তবে প্রত্যেক পদ বা পদাংশের নীচে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি, তদ্দ্বারাই শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কোনও কোনও আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

বড়ু-চণ্ডীদাসের নূতন পদ

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত পুথি দুইখানিতে যে কয়টী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নূতন রূপ ও অন্য পদ পাওয়া গিয়াছে, সে পদগুলি সম্বন্ধে কেবল এই কথাই বলা যথেষ্ট যে, এগুলি পরবর্তী কালের বিকৃত পাঠময় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-ধৃত ও বড়ু-চণ্ডীদাসের রচিত অন্য পদের সংগ্রহ, সুতরাং এগুলিতে যে পরবর্তী ও বড়ু-চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত বহু শব্দাদি থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে।

"বড়ু"-চণ্ডীদাস যে কেবল পালা হিসাবেই লিখিয়াছিলেন, বিক্ষিপ্ত বা স্বতন্ত্র পদ লেখেন নাই, সে বিষয়ে জোর করিয়া কি বলা চলে?

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

বাংলা বানানের নিয়ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা সহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতির অভিমত।

প্রবন্ধ

শ্রীঅনাথগোপাল সেন—পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য বাউল-সঙ্গীত। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ১২০।

পূর্ববঙ্গের পল্লীপ্রসিদ্ধ মনোমোহন নামক গ্রাম্য কবির একটী সঙ্গীত।

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার—ছন্দের মায়া। বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৬৪৫-৬৪৮।

কাব্যের সহিত ছন্দের সম্বন্ধ আলোচনা ও এই প্রসঙ্গে প্রাচীন এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংকলন।

শ্রীতারাপদ দাশ—নদীয়া জেলার কয়েকজন সমন্বয়পন্থী সাধক। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৯১১-৯১৮।

লালনসাঁইজীর শিষ্য হিরুসা ও পাঞ্জুসা রচিত কতকগুলি সঙ্গীতের সংকলন ও আলোচনা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্ত্তন। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৭১৭-৭২৪।

কীর্তনের ক্রমপরিণতি, গৌরচন্দ্রিকার ইতিহাস ও কীর্তনপ্রচারে চৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য—এই সকল বিষয়ের আলোচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—"ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়" ও চণ্ডীদাস। প্রবাসী, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩৪১-৩৪৫।

কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে কৃষ্ণসেন-রচিত 'ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়' নামক সন্দর্ভের আলোচনা ও তাহা হইতে চণ্ডীদাসের সময় নির্ধারণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—"চণ্ডীদাস-চরিত"। প্রবাসী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ১৮-২৯; জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮৪; আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩৭৮-৮৪।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে উদয়সেন-রচিত চণ্ডীচরিতামৃত নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণসেনকৃত বঙ্গানুবাদের সংস্করণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—চণ্ডীদাসের দেশ ও কালের লিখিত প্রমাণ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ২৫২-৬।

ছাতনায় প্রাপ্ত চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ-সংবলিত কয়েকখানি পুথির পরিচয়।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৬৫৭-৬৬৬।

চলিত বাংলার বানান সমস্যার সমালোচনা।

শ্রীঅনিলবরণ রায়—বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ-সংস্কার। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৮৫৯-৬০।

উচ্চারণানুযায়ী বানান প্রবর্তন ও যুক্তাক্ষর বর্জনের প্রয়াসের অসঙ্গতি প্রতিপাদন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বাঙ্গালা ভাষার রূপসমস্যা। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৭১০-৭১৬।

বাংলা ভাষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নাই—বিগত শতাব্দীর গদ্যরচনার কতকগুলি নিদর্শনের সাহায্যে এই মত প্রতিপাদনের চেষ্টা।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—বাগর্থবিজ্ঞান। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ১-১১।

শব্দের অর্থপরিবর্তনের নিয়মাদি আলোচনা।

শ্রীশীলানন্দ সূত্রবিশারদ—সিংহলে সংস্কৃতচর্চ্চা। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ২৭৬।

প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সিংহলে সংস্কৃত আলোচনা ও সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণয়নের ইতিহাসের আভাস।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা। উদ্বোধন, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪৩০-২, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫০৯-১২, আষাঢ়, পৃঃ ৫৭৯-৮৩।

চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে যে সমস্ত আলোচনা বিভিন্ন ভাষায় হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন—মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ। প্রবর্ত্তক, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৮৫-৮৮।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবিরাজ গঙ্গাধরের জীবনবৃত্তান্ত ও রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা সমালোচনা সাহিত্য। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৫৮-৬৪।

বাংলায় প্রকাশিত সমালোচনা সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন।

শ্রীপ্রীতি গুপ্ত—রামায়ণের এক অধ্যায়। বিচিত্রা, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪১৬-৪৪১।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতান্বেষণপ্রসঙ্গে রামায়ণে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শব্দরত্নাবলী ও মুসার্থা। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৯৩০-১।

শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত-লিখিত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত এতদ্‌বিষয়ক প্রবন্ধের আলোচনা।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন—জিপ্‌সি-ভাষায় ভারতীয় প্রভাব। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৬৩৫-৮।

পশ্চিম-জার্মানীর জিপ্‌সিদের কথ্যভাষার অভিধান হইতে ভারতীয় ভাষার শব্দের সহিত ধ্বনিসাম্য-বিশিষ্ট কতগুলি শব্দের সংকলন।

ইতিহাস

প্রবন্ধ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী—কৈবর্ত্তরাজ দিব্য। ভারতবর্ষ '৪৩, পৃঃ ৩২-৪১।

দিব্যোর রাজপদে নির্বাচন সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা আছে, 'রামচরিত' গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ সাহায্যে তাহার নিরসন।

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী—পাণ্ডুনগর। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৭৯২-৫।

পাণ্ডুনগর বা হিন্দু আমলের পাণ্ডুয়ার স্মৃতিনিদর্শনসমূহের পরিচয়।

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী—বৈদিকযুগের শিক্ষাপদ্ধতি। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, ৯৫৫-৮।

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহাদের আলোচনা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার বাঙালী সমাজ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৫৯-১৬৬, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩১৮-৩৩১।

প্রথম বাঙালী সংবাদপত্রসেবী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'সমাচার দর্পণ' নামক প্রাচীন সংবাদপত্র অবলম্বনে কলিকাতার বাঙালীসমাজের চিত্র প্রদর্শন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ—আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কতিপয় বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ২২৬-৩৩।

সারনাথ, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, সাকেত, পাবা ও কুশীনারার প্রাচীন ইতিহাস ও বৌদ্ধ নিদর্শনের আলোচনা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—পাশ্চাত্যমতে বেদের আলোচনা। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৬৮৫-৯১।

উইন্টারনিট্‌জ প্রণীত History of Sanskrit Literature গ্রন্থে নিবদ্ধ বেদবিষয়ক কয়েকটী উক্তির প্রতিবাদ।

আবদুল মওদুদ—শাহজাহানের সিংহাসন লইয়া বিবাদ। মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪৪৫-৯, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৬০৫-৭।

বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ।

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গে মাৎস্যন্যায়। প্রবাসী, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩৬২-৩৬৯।

পাহাড়পুর ও মহাস্থান গড়ে খননের ফলে প্রাচীন স্তরে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের ধ্বংসাবশেষ, অন্যত্র বর্ণিত মাৎস্যন্যায়ের যাথার্থ্য প্রমাণিত করে, ইহাই এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পিণ্ডারিদিগের বিবরণ। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৭০৬-৮।

১৮১৮—২০ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত পিণ্ডারিদিগের বিবরণ সংকলন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ—"দীন-ই-ইলাহী"। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৩৯-৪৩।

আকবর কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নূতন ধর্মের মর্ম, উদ্দেশ্য ও বিধানাদির আলোচনা।

দর্শন

প্রবন্ধ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু—প্রজ্ঞানের প্রগতি। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৮৩৩-৪১।

জাগতিক বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে মানবের চিন্তাধারার ক্রমপরিণতির পরিচয়।

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়—কৃষ্ণলীলায় কামায়ন। বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৬১১-৬১৪।

কৃষ্ণলীলাবর্ণনায় শৃঙ্গাররসের প্রভাবের আধ্যাত্মিক রহস্য নির্দেশ।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ—ঋষি চুয়াংজুর জীবনী ও বাণী। উদ্বোধন, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪৩৬-৪১।

চীনের তাও ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যাতা চুয়াংজুর জীবনবৃত্তান্ত ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বিজ্ঞান

গ্রন্থ

গণিতপরিভাষা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

পূর্ব্বপ্রকাশিত ও পরিষৎ-পত্রিকার বর্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যার সাহিত্য-বার্ত্তায় উল্লিখিত পুস্তিকার সংশোধিত সংস্করণ।

প্রবন্ধ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী—ভাবনির্ণয়ে বিভিন্ন মত। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৯৩-৯৮।

ফলিতজ্যোতিষের ভাবনির্ণয়বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন মতের গুণাগুণ আলোচনা।

শ্রীনীলরতন কর—শক্তির রূপান্তর। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৮৩১-৮৩৭।

বর্ত্তমান জগতে প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টার ইতিহাস।

শ্রীজ্যোৎস্নাশঙ্কর ভাদুড়ী—গ্রীণ্ মতবাদে ভূপৃষ্ঠপরিকল্পনা। বিচিত্রা, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৪৯৩-৪৯৯।

ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগ সংস্থানের বৈচিত্র্য নির্দেশাত্মক মতবাদের আলোচনা।

শ্রীফণিভূষণ দত্ত—ভারতীয় গণিতে 'পাই'। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৬৭৫-৬৭৯।

'পাই' বা বৃত্তের পরিধির সহিত ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় গণিতগ্রন্থের গণনার পরিচয়।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ—দিল্লীর প্রাচীন মানমন্দির। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৮৫-৯১।

অম্বরাধিপতি জয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির ও তাহার যন্ত্রাদির পরিচয়।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। প্রবাসী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ১২৪-৩০, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ২৬৬-৭২।

কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'গণিত' পরিভাষার বিস্তৃত আলোচনা।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার—ব্যাক্‌টিরিয়া। প্রকৃতি, ১২।৪৪৯-৪৫৮।

বিভিন্ন রোগের মূল কারণ ব্যাক্‌টিরিয়ার আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রতীকার সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী—সংখ্যালেখন-প্রণালী। প্রকৃতি, ১২।৪৯২-৯৭।

প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের সংখ্যালেখন প্রণালীর ইঙ্গিত।

পবনদূত-বর্ণিত বাঙ্গালা দেশ*

পবনদূত[১] কাব্য মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের অন্ততম সভাকবি ধোয়ী কবিরাজ-রচিত। ইহা কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে লিখিত। এই কাব্যের নায়ক স্বয়ং লক্ষ্মণসেনদেব এবং নায়িকা মলয়পর্ব্বতবাসিনী কুবলয়বতীনাম্নী এক গন্ধর্ব্বকন্যা। মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব যখন ভুবনবিজয় ব্যপদেশে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন, তখন এই গন্ধর্ব্বদুহিতা তাঁহার রূপে মুগ্ধা হন। লক্ষ্মণসেন বিজয় অভিযান শেষ করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলে এই বিরহ-বিধুরা কুবলয়বতী মলয়পবনকে দূতরূপে তাঁহার রাজধানী বিজয়পুরে প্রেরণ করেন।

মলয় পর্ব্বত হইতে বিজয়পুরের পথে কবি দক্ষিণাপথের নানা স্থানের বর্ণনা করিয়া, অবশেষে পবনকে উড়িষ্যার মহানদী-তীরস্থ যযাতিনগরে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার পরেই 'গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসর' সৌধমালাসমন্বিত সুহ্মদেশের বর্ণনা করা হইয়াছে[২]। এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন যে, এই স্থানের ভূমিদেবাঙ্গনাগণ[৩] 'নবশশিকলাকোমল' তালী-পত্র কর্ণাভরণরূপে পরিধান করিতেন। এই একটি কথায় সেই সময়কার ব্রাহ্মণ-স্ত্রীগণের সাদাসিধা বেশভূষার সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেনরাজগণের সময় যে ব্রাহ্মণপত্নীগণ আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতেন, তাহা কবি উমাপতিধরের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে[৪] লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বিজয়সেন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে বহু ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ এতদ্বিষয়ে এতই অনভিজ্ঞ ছিলেন যে, নাগরিকাগণ কিরূপে রত্নাদি চিনিতে হয়, তাহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; যথা—মুক্তা কার্পাস-বীজের ন্যায়, পান্নার রং শাকপত্রের ন্যায়, ডালিম পাকিয়া ফাটিয়া গেলে তাহার ভিতরস্থ দানাগুলি যেরূপ দেখা যায়, চুণি সেইরূপ. রৌপ্যের বর্ণ লাউফুলের ন্যায়

---

* ১৩৪২।২৭এ ফাল্গুন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত ও কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অনুবাদের অভাবে অনেকেই গ্রন্থখানির রসাস্বাদনে বঞ্চিত রহিয়াছেন এবং ইহার আশানুরূপ আলোচনাও হইতে পারিতেছে না। সম্পাদক মহাশয় এই অভাব দূর করিয়া সুধীমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

২। গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি ॥ ২৭

৩। টীকাকার 'ভূমিদেবাঙ্গনানাং' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'রাজমহিষীণাম্'। অমরকোষে 'ভূদেব' শব্দের প্রতিশব্দ 'ব্রাহ্মণ' দেওয়া হইয়াছে, আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

৪। মুক্তাঃ কর্পাসবীজৈর্ম্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবুপুষ্পৈ রূপ্যাণি রত্নং
পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দ্দাড়িমানাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্
বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্ ॥ ২০
(Inscriptions of Bengal, Vol. III. p. 48)

এবং স্বর্ণের বর্ণ কুষ্মাণ্ডপুষ্পের ন্যায়। বিজয়সেনের এত রত্নাদি দান করা সত্ত্বেও তাঁহার পৌত্রের সময়ও এই সরলা ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের মধ্যে যে বিলাসিতা প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহা তাঁহাদের তালপত্র আভরণরূপে ব্যবহার দ্বারাই জানা যাইতেছে।

অতঃপর কবি বলিতেছেন যে, এই সুহ্ম দেশে 'কমলাকেলিকার মুরারি' সেনবংশীয়-গণ কর্ত্তৃক দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার সেবাকারী লীলাকমলহস্ত বাররামাগণকে দেখিয়া লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হইত।[৫] এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ এ স্থলে আমরা শুধু মুরারির মূর্ত্তিরই বর্ণনা পাইতেছি। তাঁহার শক্তি রাধা কিংবা লক্ষ্মীর কোন বিগ্রহের উল্লেখ এ স্থানে নাই। লক্ষ্মী যে ছিল না, তাহা 'লক্ষ্মীশঙ্কা' কথা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ বাররামার বর্ণনা। বর্ত্তমান সময়ে বাররামা বা দেবদাসী শুধু দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহে ও পুরীর জগন্নাথের মন্দিরেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রথা যে, পূর্ব্বে বঙ্গেও প্রচলিত ছিল, তাহা পবনদূতের এই উক্তি প্রমাণ করিতেছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতেও প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরে বাররামার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, আকাশই যে দেবতার লজ্জা নিবারণ করে, মহারাজ বিজয়সেন তাঁহাকে বহু বিচিত্র বসন দান করিয়াছেন, যিনি অর্দ্ধ পত্নীর ঈশ্বর, তাঁহাকে তিনি শত শত রত্নালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী রমণী প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার বাসস্থান শ্মশান, তাঁহাকে তিনি রাজপ্রাসাদশোভিত নগরী দান করিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় রাজতরঙ্গিণীতে।[৭] কহ্লন লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় (৭৭২-৮০৬ খৃষ্টাব্দ) যখন ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তত্রস্থ কার্ত্তিকেয়মন্দিরে কমলানাম্নী এক দেব-নর্ত্তকীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

কবি আরও লিখিয়াছেন যে, এই দেশে অর্থাৎ সুহ্মে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল আগারসমূহে শোভিত চন্দ্রার্দ্ধমৌলির একটি নগর আছে। ঐ স্থানে বহু বাররামার বাস। এই নগরে গঙ্গাতীরে রঘুকুলগুরু সূর্য্যের এবং অর্দ্ধনারীশ্বরের মন্দির বর্ত্তমান। এই পুণ্য-ক্ষেত্র এবং গঙ্গার মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন-নির্ম্মিত একটি সেতুবন্ধ আছে। এই বাঁধের উপর আরোহণকারী গঙ্গাস্নানার্থী জনগণের নিকট অমরনগরী-সন্নিকৃষ্টা গঙ্গা দুইটি বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সেতুবন্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ 'প্রেমলোলা' গঙ্গা সফেন তরঙ্গমালা-

---

৫। তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ ॥ ২৮

৬। উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনাস্বামিনো রত্নালংকৃতিভির্ব্বিশেষিতবপুঃশোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাট্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতের্ভিক্ষাভুজোস্যাক্ষয়াং লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে
সুজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ ॥ ৩০
(Inscriptions of Bengal, Vol. III p. 48)

৭। রাজতরঙ্গিণী, ৪।৪২১—৪২৪

রূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া নিজ প্রিয় সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কোন উদ্ধতা নারী চুলের মুঠি ধরিবার জন্য হস্তোত্তোলন করতঃ ছুটিয়াছে।৮

ইহার পরে পবনকে বলা হইয়াছে যে, তুমি ভক্তিনম্রভাবে সেই জগতীপাবন দেশে যাইবে, যে স্থানে 'প্রকৃতিকুটিলা' তপনাত্মজা শ্যামল যমুনা জলকেলিরতা সুহ্মসীমন্তিনী-দিগের (?) বীচিধৌত স্তনমৃগমদদ্বারা অধিকতর শ্যামল হইয়া 'আবর্ত্তচক্র' দর্শন করাইতে করাইতে ভাগীরথী হইতে নির্গতা হইয়াছে। তৎপর স্কন্ধাবার (সেনানিবাস) দর্শন করিয়া, ভুবনবিজয়ী লক্ষ্মণসেনের উন্নতা রাজধানী বিজয়পুরে গমন করিবে, যে স্থানে চতুর গঙ্গাবাত পৌরাঙ্গনাদিগের সম্ভোগজনিত ক্লান্তি অঙ্গসংবাহন দ্বারা দূর করিয়া দেয়।৯

৮।　যাতস্তোর্দ্ধং ধনপতিনগেনৈব গৌরৈরগারৈঃ
পশ্চেস্তস্মিন্ নগরমনঘং চারু চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ :
যত্রানেকপ্রিয়নখপদব্যাজতো বাররামা
ভর্ত্তুর্ভূষাশশধরকলাচিহ্নমঙ্কে বহন্তি ॥ ২৯
তত্রানর্ঘ্যং রঘুকুলগুরুং স্বর্ণদীতীরদেশে
নত্বা দেবং ব্রজ গিরিসুতাসংবিভক্তাঙ্গরম্যম্।
যাতে যস্মিন্ নয়নপদবীং সুন্দরভ্রূলতানাং
প্রৌঢ়স্ত্রীণাং গলতি রমণপ্রেমজন্মাভিমানঃ ॥ ৩০
তৎক্ষেত্রঞ্চ ত্রিদিবসরিতস্তাস্তয়া সেবনীয়ঃ
শ্রীবল্লালক্ষিতিপতিযশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ।
আরূঢ়ানাং ত্রিদিবতটিনীস্নানহেতোর্জনানাং
যত্র স্বেধাপামরনগরীসন্নিকৃষ্টা বিভাতি ॥ ৩১
গঙ্গাং ফেনস্তবকমুকুরং বীচিহস্তে বহন্তীং
সেবেথাস্ত্বমথ পরিসরপ্রৌঢ়হংসাবতংসাম্।
প্রত্যাবৃত্তা ব্রজতি জলধৌ প্রেয়সি প্রেমলোলা
কর্ত্তুং কেশগ্রহমিব কিমপ্যুদ্ধতা যা বিভাতি ॥ ৩২

৩১ শ্লোকে পুথির বল্লান ও বল্লাল পাঠের স্থলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়-কল্পিত বল্লাল পাঠই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

৯।　তোয়ক্রীড়ারসনিপতৎসুহ্মসীমন্তিনীনাং
বীচীধৌতৈঃ স্তনমৃগমদৈঃ শ্যামলীভূয় ভূয়ঃ।
ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী
দেশং যায়াস্ত্বমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ ॥ ৩৩
সংসর্পন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং
তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামগ্রগর্ত্তাৎ।
মা নির্মুক্তাসিতফণিবধূশঙ্কয়া কাতরোভূ-
র্ভীতঃ সর্ব্বো ভবতি ভুজগাৎ কিং পুনস্ত্বাদৃশো যঃ ॥ ৩৪
স্কন্ধাবারং বিজয়পুরম্ ইত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা তাবদ্ ভুবনজয়িনস্তস্য রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ।
গঙ্গাবাতস্ত্বমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥ ৩৫

এখন আমরা উপরিবর্ণিত স্থানগুলির বৈশিষ্ট্য ও বর্ত্তমান অবস্থান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

সুহ্মদেশ (২৭ শ্লোক)—সুহ্ম বলিতে কখন দক্ষিণ-রাঢ়, কখনও উত্তর-রাঢ়, কখনও বা উভয়-রাঢ় বুঝাইত। পবনদূতের বর্ণনা হইতে মনে হয়, যেন কবি দক্ষিণ-রাঢ়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলেন :—"সুহ্ম বঙ্গদেশের একটি বিভাগের নাম। ইহা উত্তর মেদিনীপুর, সরস্বতী নদীর পশ্চিমস্থ হুগলী জেলার অংশ এবং বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ লইয়া গঠিত।"[১০]

মুরারির দেবরাজ্য (২৮ শ্লোক)—টীকাকার 'দেবরাজ্য' অর্থ লিখিয়াছেন 'দেবমন্দির'; আমাদের কিন্তু মনে হয়, মুরারির সেবার জন্য সেনগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মোত্তরকেই দেবরাজ্য বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তাঁহার দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান গোবিন্দপুরই এই দেবরাজ্য।[১১] শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত বলেন যে—এই স্থান চব্বিশ পরগণা জেলার সোণারপুর থানার অধীন এবং আদি গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। গোবিন্দপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সন্নিকটে একটি প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ জঙ্গলাবৃত হইয়া প্রায় দুই তিন বিঘা জমির উপর পড়িয়া আছে। উহার মধ্য হইতে বহুসংখ্যক সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। হয় ত মুরারির মন্দিরই এখন ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে।[১১]

চন্দ্রার্দ্ধমৌলি বা শিবের নগর (২৯-৩২ শ্লোক)—শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 'শিবের নগর' বলিতে বর্ত্তমান হাওড়া জেলার শিবপুরের ন্যায় কোন প্রকৃত সহরকেই বুঝাইতেছে কি না, তাহা বলা সহজ নহে।[১৩] তিনি সম্ভবতঃ শিবপুরের অবস্থান এবং নামার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐরূপ অনুমান করিয়া থাকিবেন। নিম্নলিখিত কারণে তাঁহার এই অনুমান আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

বর্ত্তমান শিবপুরের নিকটে বেতড় নামে একটি প্রাচীন গ্রাম বর্ত্তমান আছে। পর্ত্তুগীজ-দিগের ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্রে ইহার অবস্থান বর্ত্তমান শিবপুরের পশ্চিম-দক্ষিণে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎকালীয় বাণিজ্যের জন্য এই স্থান খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার প্রতিপত্তি সপ্ত-গ্রামের পরই ছিল। এই স্থানের উত্তরে গঙ্গা যথেষ্ট গভীর ছিল না বলিয়া পর্ত্তুগীজদিগের জাহাজগুলি সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে না পারিয়া, বেতড়েই নঙ্গর করিত এবং ঐ স্থানে বসিয়া বেচাকেনা করিত। প্রাচীন বঙ্গীয় কবি মুকুন্দরাম, মাধবাচার্য্য ও বিপ্রদাসের পুঁথিতে বেতড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্থান সপ্তগ্রাম হইতে এক ভাটি দক্ষিণে এবং কলিকাতার অপর তীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বেতড়ের বেতাই চণ্ডী প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন।[১৪]

১০। J. A. S. B. 1905, p. 544.

১১। Inscriptions of Bengal, Vol. III, pp. 92-98

১২। পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ২২৮ ও ২৪১।

১৩। পবনদূতম্, Introduction, p. 25

১৪। J. A. S. B., Vol. LXI., Pt. II. 1892, pp. 110-11.

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সন্নিকটস্থ বেতাইতলা বেতাই চণ্ডীর স্থান হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দপুর-তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত বিড্ডরশাসন গ্রামের পরিচয়ে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রাম শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতী পশ্চিম খাটিকাস্থ বেতড্ড চতুরকে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে জাহ্নবী প্রবহমানা, দক্ষিণে লেজ্জদেবমণ্ডপী, পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্র এবং উত্তরে ধর্ম্মনগর। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, এই বেতড্ড ও বর্ত্তমান বেতড় একই স্থান।[১৫] শ্রীযুত কালিদাস দত্তের মতে জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর থানার অধীন 'শাসন' গ্রামই প্রাচীন বিড্ডর শাসন এবং ইহার উত্তর দিকে অবস্থিত ধামনগরই তাম্রশাসনোক্ত ধর্ম্মনগর। এই উভয় গ্রামই আদিগঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত।[১৬] ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বেতড় ও ইহার সমীপবর্ত্তী স্থানগুলি প্রাচীন। সুতরাং শিবপুরও যে একটি প্রাচীন স্থান, ইহা অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

ত্রিংশ শ্লোকের প্রথমেই 'তত্র' শব্দ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গঙ্গাতীরস্থ সূর্য্যের ও অর্দ্ধ-নারীশ্বরেব মন্দির পূর্ব্বশ্লোকোক্ত শিবের নগর বা শিবপুরে অবস্থিত ছিল। আবার একত্রিংশ শ্লোকের প্রথমেই 'তৎক্ষেত্রঞ্চ' কথা দ্বারাও পুণ্যক্ষেত্র শিবের নগরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং মহারাজ বল্লালের কীর্ত্তি সেতুবন্ধ, এই শিবের নগর এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনে হয়, ইহা একটি বাঁধ (embankment), পুল (bridge) নহে। এই বাঁধগুলি সাধারণতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে,—কোন স্থানকে জলপ্লাবন অথবা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু শেষোক্ত কারণ যে ছিলই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাস্নানার্থিগণ যখন এই বাঁধের উপর আরোহণ করিত, তখন তাহাদের নিকট 'অমরনগরীসন্নিকৃষ্টা' বা শিবপুরসন্নিহিতা গঙ্গা দুইটি বলিয়া প্রতিভাত হইত। বোধ হয়, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কোন নদীর বাঁকের কোণে দাঁড়াইলে এইরূপ দৃশ্য দেখা যায়। সম্ভবতঃ শিবের নগর এইরূপ একটি বাঁকের উপর অবস্থিত ছিল। গঙ্গাস্রোত বাঁকের নিকট তটে প্রতিহত হইয়া ইহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বোধ হয়, এই ভাঙ্গন হইতে শিবের নগরকে রক্ষা করিবার জন্যই বল্লালসেন কর্ত্তৃক এই সেতুবন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দ্বাত্রিংশ শ্লোকের 'প্রত্যাবৃত্য ব্রজতি' কথাদ্বারাও আমাদের উপরের অনুমান সমর্থিত হইতেছে। গঙ্গাস্রোত বাঁকের নিকট সেতুবন্ধে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, কিয়দ্দূর প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে। 'প্রত্যাবর্ত্তন' শব্দ দ্বারা গঙ্গা যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, পুনরায় সেই দিকেই চলিয়া গিয়াছিল বুঝা যাইতেছে। গঙ্গা উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ সেতুবন্ধে প্রতিহত হইয়া, পুনরায় খানিক দূর উত্তর দিকে চলিয়া গিয়া, দক্ষিণবাহিনী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শিবের নগরের নিকট গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছিল। শিবপুরের বোটানিক্যাল

১৫। বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় সং), ১ম ভাগ, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

১৬। পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৯ সন, ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা।

গার্ডেনের দক্ষিণ হইতে বর্ত্তমান টালিস্ নালা বা আদিগঙ্গার মুখ উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই উভয়ের যোগরেখা সেই সময়ের শিবের নগরের নিকটস্থ উত্তরবাহিনী গঙ্গার কতকটা ধারণা জন্মায়। বোটানিকাল গার্ডেনের দক্ষিণস্থ গঙ্গা 'কাটি-গঙ্গা' নামে অভিহিত হয়। প্রবাদ, ইহা পূর্ব্বে ছিল না; মুসলমান আমলে একটি খাল কাটিয়া, গঙ্গা ও দামোদর এবং রূপনারায়ণের সহিত যোগ সাধন করা হয়। সেই খালই বিশাল কাটিগঙ্গায় পরিণত হইয়াছে এবং গঙ্গার প্রাচীন খাত যাহা আদিগঙ্গা নামে পরিচিত, তাহা মজিয়া গিয়াছে। শিবের নগরের নিকটস্থ দক্ষিণবাহিনী এবং উত্তরবাহিনী অংশদ্বয়ই সেতুবন্ধ আরোহণকারীর নিকট দুইটি গঙ্গা বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সেতুবন্ধে প্রতিহত হইয়া গঙ্গা উত্তাল তরঙ্গমালা ও ফেনস্তবক সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইত। গঙ্গার এই অবস্থাকেই কবি, স্বামীর কেশগ্রহণোন্মুখা হস্তোত্তোলনকারিণী উদ্ধতা নারীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় একটা কথা আছে:—"গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল।" আবার শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গঙ্গা যত্র তত্র কুরুক্ষেত্রের সমান ফলপ্রদা, কিন্তু উত্তর-বাহিনী গঙ্গা ইহার দশ লক্ষ গুণ ফলপ্রদা।[১৭] শিবের নগর বলিতে প্রধানতঃ কাশীকেই বুঝায়। কাশী গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং ইহার নিকটস্থ গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের শিবের নগরে বা শিবপুরে এই উভয়ই বর্ত্তমান ছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই স্থানে শিবের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল শিবপুর।

গঙ্গাযমুনার বিয়োগস্থান।—আবর্ত্তচক্রের বর্ণনা হইতে মনে হয়, এই স্থলে চাকদহের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানের এক মাইল দূরে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের ও দেবীর ভগ্ন মন্দির বর্ত্তমান। বর্ত্তমান সময়ে চাকদহের নিকট যমুনার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে গঙ্গা-যমুনার বিয়োগ স্থলের যে সীমা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উহাকে সরস্বতীর উত্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যমুনা বা কাঁচড়াপাড়ার খাল সরস্বতীর উত্তরে নহে, দক্ষিণে। ইহা দ্বারা মনে হয়, উত্তরে অবস্থিত চাকদহের নিকটে প্রাচীন যমুনার খাত ছিল। ৺রাখালবাবু[১৮] যমুনার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা দ্বারাও এই ধারণা সমর্থিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, যমুনা fork এর আকারে দুই শাখায় গঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে। উহার একটি শাখা সরস্বতীর উত্তরে এবং অন্যটি উহার দক্ষিণে। সম্ভবতঃ যমুনার 'আবর্ত্তচক্র' বা চক্রাকার দহের স্থান ভরাট হইয়া চাকদহ নাম হইয়াছে।

পরবর্ত্তী যুগে সুপ্রসিদ্ধ সরস্বতী, সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর কোনও উল্লেখ যমুনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে না করা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ যদি ধোয়ীর সময়ে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে

১৭। কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র তত্রাবগাহিতা।
কুরুক্ষেত্রাদ্দশগুণা যত্র বিন্ধ্যেন সঙ্গতা॥
ততঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র পশ্চিমবাহিনী।
তস্মাৎ সহস্রগুণিতা যত্র চোত্তরবাহিনী॥

বাচস্পতি মিশ্রের তীর্থচিন্তামণিধৃত মৎস্যপুরাণের বচন (Bib. Ind. Series, p. 526)

১৮। J. A. S. B., Vol. V. 1909, p. 257

ত্রিবেণী কিংবা সরস্বতীর অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিতেন না। তিনি যেরূপ ভাবে সুহ্মের দেবস্থানের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিবেণী তীর্থ এবং সরস্বতীর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত না করা বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না কি? শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু বলিয়াছেন,—হয় ত সে যুগে সপ্তগ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।[১৯] বস্তুতঃ আমরা আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের ত্রিবেণীর এত প্রাচীন উল্লেখ কোথায়ও পাই নাই। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। এই পুস্তক 'সিন্ধু ইন্দু-বেদ-মহী-সক পরিমাণ'এ (১৪১৭ শকে, ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে) গৌড়েশ্বর হুসেন সার সময় লিখিত।[২০] আমরা ইহা হইতে প্রাচীন তারিখযুক্ত প্রমাণ অবগত নহি। রচনার তারিখহীন এবং সম্ভবতঃ অর্ব্বাচীন বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে[২১] গঙ্গা ও পদ্মাবতীর (পদ্মা) সংযোগস্থল ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের মধ্যবর্ত্তী স্থলে যমুনার সহিত বিয়োগ এবং গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর বিয়োগস্থলে ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের তীর্থচিন্তামণিতে[২২] এবং ঐ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে[২৩] সপ্তগ্রামস্থ দক্ষিণ-প্রয়াগ বা

১৯। পবনদূতম্, Introduction, p.25.

২০। J. A. S. B., Vol. V. 1909, pp. 253-54.

২১। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (বঙ্গবাসী সং) পূর্ব্বখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ও মধ্য খণ্ড, ২২শ অধ্যায়। রায়বাহাদুর যোগেশ-চন্দ্র রায়ের মতে এই পুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে রচিত। (ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, পৃঃ ৬৮১)।

২২। প্রদ্যুম্নতীর্থং তপসা যত্র স্বেন স্মরো হরেঃ।
প্রদ্যুম্ননামা পুত্রোঽভূৎ স্থানে তত্র মহোদয়ঃ ॥
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা।
স্নানাত্তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে ॥
দক্ষিণপ্রয়াগস্তু মুক্তবেণী সপ্তগ্রাম ইতি প্রসিদ্ধঃ।
(তীর্থচিন্তামণি, B. I, Series, p. 219).

এই সন্দর্ভের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমরা শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের নিকট ঋণী।

২৩। (ক) ৺নন্দলাল দে ধৃত পাঠ :—
মহাভারতে—প্রদ্যুম্ননগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা ॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে।
দক্ষিণপ্রয়াগস্তু উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যাদক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতে ॥
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, গঙ্গামাহাত্ম্য, ১০০ পৃষ্ঠা)

(খ) শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাঠ :—
"প্রদ্যুম্নস্তু হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা ॥ ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্।

(গ) আমাদের পুঁথির পাঠ :—
"মহাভারতে—তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা।
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু ততো মুক্তবেণীসম্বন্ধাৎ। সপ্তগ্রামাখ্যাদক্ষিণদেশে ॥"

ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উভয়েই প্রমাণস্বরূপ মহাভারত হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মহাভারতে খুজিয়া পাওয়া যায় না এবং উভয়ের পাঠেও সম্পূর্ণ মিল নাই।

'সুহ্মসীমন্তিনী' (৩৩ শ্লোক)—চিন্তাহরণ বাবু যে তিনখানি পুথির সাহায্যে পবনদূত সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিতেই 'ব্রহ্মসীমন্তিনী' পাঠ রহিয়াছে, কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেন যে, মূল পাঠ বোধ হয় ছিল 'সুহ্মসীমন্তিনী'; কেন না, ব্রহ্মসীমন্তিনী পাঠের অর্থসঙ্গতি করা কঠিন। কিন্তু যমুনাবর্ণনাপ্রসঙ্গে সুহ্মসীমন্তিনীর উল্লেখ সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। সুহ্ম দেশ বর্ণনা করিতে করিতে পবনকে বলা হইয়াছে,—'তুমি সেই জগতীপাবন দেশে ভক্তিনম্রভাবে যাইবে, যে স্থানে যমুনা ভাগীরথী হইতে নির্গতা হইয়াছে।' ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, যমুনা সুহ্ম হইতে পৃথক্ কোন দেশে বর্ত্তমান। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম' উত্তর-রাঢ়ের প্রাচীন নাম, সুতরাং 'ব্রহ্মসীমন্তিনী' পাঠই ঠিক।[২৪] কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যমুনা যখন গঙ্গার পশ্চিমতীরে নহে, তখন ইহা উত্তর কিংবা দক্ষিণ, কোন রাঢ়েই নহে। এখন দেখা যাউক, 'ব্রহ্মসীমন্তিনী'ই যদি প্রকৃত পাঠ হয় এবং 'ব্রহ্ম' দেশবাচক শব্দ না হয়, তবে ইহা কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই শব্দের সহজ অর্থ 'ব্রাহ্মণগণের স্ত্রী'। তবে কি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয়া স্ত্রীগণ যমুনায় স্নান করিত না? এরূপ বলা কখনই কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, তখনকার ব্রাহ্মণাঙ্গনাগণ কোন বিলাসিতার ধার ধারিতেন না। আর এখানে পাইতেছি,

---

বাঙ্গালা দেশের প্রয়াগ, 'দক্ষিণ' বিশেষণে বিশেষিত হইল কেন? ইহার নাম 'প্রাচ্য প্রয়াগ' হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত। আমাদের সন্দেহ হয়, বাচস্পতি মিশ্রধৃত তথাকথিত মহাভারতের শ্লোক দাক্ষিণাত্যের কোন স্থলে পুরাণে কোন প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্য মহাভারতের নাম দিয়া অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং প্রাচ্য দেশের স্মার্ত্তগণ ভুল করিয়া তাহা সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীতে আরোপ করিয়াছেন। আমরা এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করি। আশ্চর্য্যের বিষয়, কতিপয় প্রাচীন খোদিত লিপিতে মহীশূর রাজ্যের মহীশূর জেলায় তিরুমকুডল নামক স্থানে দক্ষিণ প্রয়াগ পাওয়া গিয়াছে (Epigraphia Carnatica, Vol. III, Mysore Taluq Inscription, No. 33.)। এই স্থানটি কাবেরী, কপিলা ও স্ফটিক সরোবরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত (Ep. Car. Tirumakudala—Narasiyur Taluq, No. 62.)। তামিল ভাষায় তিরুমকুডল শব্দের অর্থ—ত্রিবেণী। এই স্থানে অগস্ত্যেশ্বর নামক একটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছে। একখানি তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে যে, অগস্ত্য ঋষি কর্ত্তৃক প্রত্যহ স্তুত হইবার জন্য মুনিগণসেবিত, আগমে প্রশংসিত গয়া, প্রসিদ্ধ প্রয়াগ এবং কাশীর সহিত, দাক্ষিণাত্যের অলঙ্কার এই তিরুমকুডলে স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানের কাবেরীই জাহ্নবী এবং কপিলাই তপনাত্মজা (Ep. Car. Nanjangud Taluq No. 198.)। এই তিরুমকুডল এবং এই স্থানের অগস্ত্যেশ্বরের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ১১৮০ খৃষ্টাব্দের একখানি খোদিত লিপিতে (Ep. Car. Tirumakudala, Narasipur Taluq, No. 106.)। বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনলিপিসমূহ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উত্তরাপথের অনেক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দক্ষিণাপথে কল্পিত হইয়াছে এবং তাহাদের নামের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যজ্ঞাপক 'দক্ষিণ' বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে, যথা, দক্ষিণবদরিকাশ্রম, দক্ষিণবারাণসী, দক্ষিণপ্রয়াগ, দক্ষিণভাস্করপুরী বা আদিত্যনগরী, দক্ষিণকৈলাস, দক্ষিণকাশী, গঙ্গারণ্যক্ষেত্র, দক্ষিণমথুরা (Madura), দক্ষিণসোমনাথ ইত্যাদি।

২৪। Indian Historical Quarterly, Vol. VIII. p. 527.

তাঁহারা স্তনে মৃগমদ মাখিয়া জলক্রীড়ারতা হইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ হয়, এই স্থলে প্রকৃত পাঠ হইবে 'বঙ্গ-সীমন্তিনী'। বঙ্গ যে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা বায়ু ও মৎস্যপুরাণ পাঠে জানা যায়। উক্ত পুরাণদ্বয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ভাগীরথী গঙ্গা ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত প্রদেশ পবিত্র করিতেছে।[২৫]

স্কন্ধাবার ও বিজয়পুর রাজধানী (৩৬ শ্লোক)—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে স্কন্ধাবার ও বিজয়পুর রাজধানী একই স্থানে স্থিত।[২৬] আমাদের মনে হয়, 'দৃষ্ট্বা' এবং 'অধিগচ্ছেঃ' এই দুইটি ক্রিয়াপদ ব্যবহার দ্বারা ইহারা যে দুইটি পৃথক্ স্থান, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভুবনবিজয়ী রাজার স্কন্ধাবার অর্থাৎ সেনানিবাস নিশ্চয়ই একটি দর্শনীয় স্থান ছিল। তাই সম্ভবতঃ কবি পবনকে স্কন্ধাবার দর্শন করিয়া রাজধানীতে যাইতে বলিয়াছেন। এই বিজয়পুরের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন,—ইহা নদীয়া, আবার কেহ বলেন,—ইহা রাজসাহী জেলার দেওপাড়ার সন্নিকটস্থ বিজয়নগর। এখন এই উভয় মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বিচার করা যাউক। পবনদূত হইতে আমরা বিজয়পুর সম্বন্ধে দুইটি বিষয় অবগত হই। প্রথমতঃ ইহা পবনদূতের বর্ণনাকালে লক্ষ্মণসেনদেবের রাজধানী ছিল, দ্বিতীয়তঃ 'গঙ্গাবাত' শব্দ দ্বারা ইহার গঙ্গার সান্নিধ্য সূচিত হইয়াছে।

যমুনা বর্ণনার পরই বিজয়পুরের উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং এই স্থান যমুনার পরে, এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহা যমুনার অনতিদূরেও হইতে পারে, দূরেও হইতে পারে। নদীয়ার ভাগীরথীতীরস্থ বামনপুকুর গ্রামে একটি ঢিবি ও দীঘিকে প্রবাদ বল্লালসেনের নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা ঐ স্থানে রাজধানী থাকা প্রকাশ পায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নদীয়াকে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বলিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, ইহা তাঁহার শেষ বয়সের রাজধানী বা গঙ্গাবাসের স্থান। উহা যে পবনদূত-বর্ণিত ঘটনার সময়েও অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের দিগ্বিজয়ের পর প্রথম বয়সেও তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বিজয়পুর যে নদীয়ার আর একটি নাম, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

নামসাদৃশ্যহেতু বিজয়নগর ও বিজয়পুর এক স্থান হওয়া সম্ভবপর। এই স্থানও যমুনার পরে, কিন্তু নদীয়ার ন্যায় অত নিকটে নহে। বিজয়পুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত। কিন্তু বিজয়নগর পদ্মাতীরে। পদ্মাকে হয় ত অনেকে গঙ্গা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইবেন না। তবে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পদ্মাবতী বা পদ্মাকে জহ্নুকন্যা এবং গঙ্গার ভগিনী বলা হইয়াছে। খোদিত লিপি এবং কুলজীতে পদ্মাকে গঙ্গা বলিয়াই বর্ণিত হইতে দেখিতেছি। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিনিভেলী জেলায় প্রাপ্ত একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, মহারাজ জটিলবর্ম্মা ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য ১৩৮৮ শকে (১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার পরমাচার্য্য মহাগণপতিনয়িনার বামদেবকে কতক জমি দান করিয়াছিলেন। এই

২৫। বায়ুপুরাণ (বঙ্গবাসী সং), ৪৭ অধ্যায়, ৩৭-৪৪ শ্লোক ; মৎস্যপুরাণ (ঐ), ১২১ অধ্যায়, ৫০ শ্লোক।

২৬। পবনদূতম্, Introduction, p. 25.

আচার্য্যের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ইনি উত্তরাপথের গঙ্গার উত্তরতীরস্থ গৌড়রাষ্ট্রের বরেন্দ্র গ্রামস্থ আমর্দ্দাশ্রমাচার্য্যের শিষ্য।[২৭] এই স্থানে যে পদ্মাকেই গঙ্গা বলা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। আবার বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় দেখা যায়, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝা রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে 'অমরধুনীতীরদেশে' ধামসার নামক গ্রাম যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[২৮] রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তিপ্রণীত কুলশাস্ত্রদীপিকায় (২০২ পৃষ্ঠায়) ধামসার বাগছি বংশের একটি কুলস্থান বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থান বরেন্দ্র দেশে। বরেন্দ্রের এই 'অমরধুনী' পদ্মা ভিন্ন আর কোন্ নদী হইতে পারে ?

পদ্মা যে এক সময়ে গঙ্গা নামে অভিহিত হইত, তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিত রামচরিতে (১।১০) রামপালের রাজধানী রামাবতী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—'অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়া-প্রবাহপুণ্যতমাম্'। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে. রামাবতী গঙ্গা ও করতোয়া নদীর সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। করতোয়া কোন সময়ে ভাগীরথী গঙ্গায় পতিত হইত, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে করতোয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে, যমুনা আবার পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ভ্যান্‌ডেন ব্রুকের মানচিত্রে করতোয়াকে পদ্মার সহিত মিলিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং রামচরিতে বর্ণিত এই গঙ্গা যে পদ্মা, তাহা অনুমান করা বোধ হয়, অন্যায় হইবে না।

শ্রীযুত চিন্তাহরণ বাবু সম্পাদিত ও সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত সংস্কৃত পুথির বিবরণীতে[২৯] দেখা যায়, 'শাখাবর্ণন' নামক পুথির শেষে বিভিন্ন দেশে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যশাখা বিস্তার প্রসঙ্গে বরেন্দ্রকে 'পারেগাঙ্গং' বলা হইয়াছে। যথা,—

"রাঢ়ং বঙ্গং সুগৌড়ং ব্রজমথ মগধং চোৎকলং রাজকঞ্চ।
পারেগাঙ্গং বরেন্দ্রং গিরিজমপি তথা বৃন্দকঙ্কালকঞ্চ॥"

এই 'পারে গাঙ্গং' (পারেগঙ্গং ?) বিশেষণ দ্বারা বরেন্দ্র দেশ যে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই গঙ্গা, পদ্মা ভিন্ন আর কোন নদী হইতে পারে না।

২৭। "উত্তরাপথস্য গঙ্গোত্তরতিরস্য গৌড়রাষ্ট্রগৌতমগোত্রস্য ব্রাহ্মণস্যত্রস্য।
বরেন্দ্রীগ্রামস্য সাবিত্রগোত্রঃ আমর্দ্দাশ্রমাচার্যাবৃক্ষদোনত্তিল" ইত্যাদি (Report of the Asst. Archaeological Supdt. for Epigraphy, Southern Circle, for 1917-18, App. B. No 569. p. 56).

২৮। "রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ স্বয়মমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুতজনং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকলকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ।"
গৌড়ে ব্রাহ্মণ (১১৭ পৃষ্ঠা) ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা ; রাজকাণ্ড, ১৫৬ পৃঃ পাদটীকা।

২৯। Preface, p. xxx, n. 83

কবি কৃত্তিবাস তাঁহার আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন :—

"এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥"

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—'বড় গঙ্গা যশোহরে।'[৩০] যশোহর কবির নিবাস ফুলিয়া গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণে, উত্তরে নহে। সুতরাং এই 'বড় গঙ্গাপার' যশোহর নহে। আমাদের মনে হয়, এই বড় গঙ্গা শব্দ দ্বারা পদ্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে সাভারের বিখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্রের যে সংস্কৃত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ভাওয়ালের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে[৩১] :—

"বংশাবতী ব্রহ্মহতপ্রবিষ্ট'।
দক্ষেণ গাঙ্গং স চ ভাবলীনং॥"

এই ভাবলীন বা ভাওয়ালের দক্ষিণে গাঙ্গ বা গঙ্গা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে ধলেশ্বরী বর্ত্তমান। ইহা দ্বারা মনে হয়, ধলেশ্বরী এক সময়ে গঙ্গার প্রাচীন খাত ছিল। ঢাকার নিকটস্থ বুড়ী গঙ্গা নদীর নাম দ্বারাও ইহাকে গঙ্গার প্রাচীন খাত বলিয়া মনে হইতেছে।

উপরোক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা মনে হয় যে, গঙ্গার পূর্ব্বশাখা বহু বার ইহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নদীর খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সেই সেই নদীর নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অবশেষে পদ্মার খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মা নাম ধারণ করিয়াছে। সুতরাং এই প্রমাণে পদ্মাতীরস্থ বিজয়নগর গঙ্গাতীরস্থও বলা যাইতে পারে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে রামপালের অন্যতম সামন্ত নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ ও বিজয়সেন একই ব্যক্তি[৩২]। নিদ্রাবলী বা নিদ্রালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের গাঞি, অতএব এই নিদ্রাবলী বরেন্দ্রের অন্তঃপাতী কোন গ্রাম। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, বিজয়নগরের দেড় মাইল দক্ষিণে 'নিদ্রালী' গ্রাম ছিল, এখন তাহা পদ্মাগর্ভে।[৩৩] রামপালের সময় বিজয়সেনের রাজধানী নিদ্রাবলীতে ছিল। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব-রাজধানীর নিকটে নিজ নামে বিজয়নগর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিজয়-নগরের নিকটেই দেওপাড়া গ্রামে বিজয়সেনের কীর্ত্তি প্রদ্যুম্নেশ্বর শিব ও প্রদ্যুম্ন সরোবর। পবনদূতে (৫৫শ শ্লোকে) 'প্রাপ্তরাজ্যাভিষেক' বলিয়া উল্লিখিত যুবক লক্ষ্মণসেন পবনদূত রচনার সময় এই পৈতৃক রাজধানীতেই ছিলেন মনে করা অসঙ্গত নহে।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

৩০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১২৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

৩১। Dacca Review, 1920, বঙ্গবাণী, ১৩৩১, ১৭৫ পৃ।

৩২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা ; Studies in Indian Antiquities---Ray Chaudhuri, p. 158.

৩৩। রাজন্যকাণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৩৩৮ সাল হইতে আমি ধারাবাহিকভাবে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি; ১৩৪২ সালের ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় এই প্রবন্ধ শেষ হয়। কিন্তু পুরাতন সাময়িক পত্র দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য, অনেক পত্র-পত্রিকা আমি চোখে দেখি নাই। এই কারণে আমার প্রবন্ধগুলির স্থানে স্থানে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। নূতন অনুসন্ধানের ফলে এই সকল ত্রুটি ক্রমশঃ নজরে পড়িতেছে।* সম্প্রতি ১৮৫৮ সনের কতকগুলি 'সংবাদ প্রভাকর' ও ১৮৬০ সনের কতকগুলি 'সোমপ্রকাশ' শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্তীর সহায়তায় ঢাকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। এই পত্রিকাগুলিতে কয়েকখানি বাংলা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আছে। এই সংবাদগুলির পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই নূতন তথ্যের বলে আমার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধের কোন-কোন অংশের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে।

কলিকাতা বার্ত্তাবহ

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সংবাদপত্র ১৮৫৮ সনের ১৮ই জানুয়ারি (৬ মাঘ, ১২৬৪) প্রকাশিত হয়। ১লা বৈশাখ, ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল, ১৮৫৮) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ:—

> "সন ১২৬৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।...৬ মাঘ দিবসে 'কলিকাতা-বার্ত্তাবহ' নামে একখানি নূতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।"

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' প্রতি সোম ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরদিন 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন:—

> " 'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামক অভিনব বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রথম সংখ্যা আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইলাম, ইহার কলেবর ভাস্করের ন্যায়, প্রতি সোমবার এবং শুক্রবাসরে প্রকটিত হইবেক, মাসিক মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। প্রথম সংখ্যায় কয়েকটি বিষয় কেবল গদ্যে লিখিত হইয়াছে, রচনা অতি উত্তম, প্রার্থনা করি পরমেশ্বরের কৃপায় সম্পাদক কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণের প্রিয় হউন।"
> ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৮)

---

* ১৩৩৮ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ, ১৭৭) আমি লিখি, "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয়।" 'ভারতবর্ষে' কথাটির স্থলে 'বাংলা দেশে' লেখা উচিত ছিল। কারণ, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জেসুইট পাদ্রীরা ইউরোপ হইতে মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এই মুদ্রাযন্ত্রে ১৫৫৭ সনে সেন্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার-রচিত পর্ত্তুগীজ ভাষায় একখানি 'ক্যাটিকিজম' মুদ্রিত হয়—এদেশে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই প্রথম বই। ("The First Printing Presses in India,"—Leo Proserpio (*The New Review*, October, 1935, pp. 321-30).

বিচারক

'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি (?) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> " 'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে। প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহকে স্থিররূপে রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।"

হিতৈষিণী পত্রিকা

'হিতৈষিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন কানাইলাল পাইন। ১৭৭৯ শকের ফাল্গুন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

> "হিতৈষিণী সভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি প্রতিমাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পত্র প্রয়োজন মতে ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা মাত্র।.

কিন্তু 'হিতৈষিণী পত্রিকা' ১২৬৫ সালের আষাঢ় (জুন ১৮৫৮) মাস হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫৮ সনের ২১ জুন (৮ আষাঢ়, ১২৬৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রকাশ :—

> " 'হিতৈষিণী পত্রিকা' নাম্নী এক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, ইহা কলিকাতাস্থ হিতৈষিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহার পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র আটপেজি ফরমার অর্দ্ধ ফরমা অর্থাৎ ৪ পৃষ্ঠা মাত্র। সাধারণ মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার কথা, এই পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং যাহাতে অধন সধন সকলে ইহা পাঠ করিতে পারে, তজ্জন্য ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ পয়সা মাত্র নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চোপাসনা প্রচার বিষয়ে একটী প্রস্তাব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে, ইহার রচনা প্রণালী অতীব সুন্দর।"

মনোরঞ্জিকা

১৮৬০ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৭) ঢাকার বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে 'মনোরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

কেদারনাথ মজুমদার ও আরও কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই উক্তির মূলে কোন সত্য নাই। 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশের এক মাস পূর্ব্বে (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শক) হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা

বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; এই কাগজখানিকেই ঢাকার সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক পত্র বলা উচিত। 'মনোরঞ্জিকা' যে ১২৬৭ সালের আষাঢ় (জুন ১৮৬০) মাসে প্রকাশিত হয়, তাহা 'সোমপ্রকাশ' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে স্পষ্ট জানা যাইবে :—

"মনোরঞ্জিকা।—বর্ত্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবকসম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন "পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্ত্তন করিয়া পত্রিকা খানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিবেন না"। তাঁহারা যদি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত না হইয়া ঈদৃশ সদর্থ ও মহোপকারক বিষয় দ্বারা পত্র পরিপূরিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পত্রিকার মনোরঞ্জিকা এই নাম অন্বর্থ হইবে সন্দেহ নাই।" ('সোম-প্রকাশ,' ২০ আষাঢ় ১২৬৭, ২ জুলাই ১৮৬০)

রাজপুর পত্রিকা

'রাজপুর পত্রিকা' নামে একখানি সাময়িক পত্র ১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা খুব সম্ভব মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ২৪ সেপ্টেম্বর (১৮৬০) তারিখে লেখেন :—

"এ সপ্তাহেও এক খানি নূতন গ্রন্থ ও এক খানি নূতন পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।...

পত্রিকাখানির নাম রাজপুর পত্রিকা। ইহা...আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিরক্তচিত্ত হই নাই। ইহা যথার্থ বাঙ্গলা ভাষার রীতিতে প্রণীত হইয়াছে। বাঙ্গলাভাষার বিশুদ্ধ রীতিতে লিখিত বলিয়া কোন স্থানে অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মে নাই। অনেক বাঙ্গলা পত্রিকা ও গ্রন্থে এ গুণ দুর্লভ। ইহাতে কয়েকটি বিশেষ দোষ লক্ষিত হইল। কিন্তু পত্রিকা প্রচারয়িতাদিগের প্রথম আরম্ভ বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের দেশের যেরূপ রীতি আছে, প্রাথমিক অনুরাগ দীর্ঘতরকালস্থায়ী হয় না। উক্ত পত্রিকা সম্পাদয়িতারা যদি সেইরূপ বীতরাগ ও শিথিলযত্ন না হন, আমাদিগের বোধ হইতেছে, ইহার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইবেন।"

নবব্যবহার সংহিতা

ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল রামচন্দ্র ভৌমিক আইন-কানুন সংক্রান্ত একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছুক হইয়া ১৮৬০ সনের আগষ্ট মাসে ইহার অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করেন। এই অনুষ্ঠান-পত্র পাইয়া 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

"ঢাকার সদর আমীনের অন্যতর উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক প্রতিমাস-

প্রকাশিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে নানাবিধ আইন ও সরকুলর অর্ডর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার সংহিতা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহার অনুষ্ঠান পত্র প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দিলে ৪, অন্যথা ৫ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" ('সোমপ্রকাশ,' ১২ ভাদ্র, ১২৬৭। ২৭ আগষ্ট. ১৮৬০)

১২৬৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৮৬০) নবব্যবহার সংহিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

"ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে নবব্যবহারসংহিতা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।" ('সোমপ্রকাশ,' ২৬ ভাদ্র, ১২৬৭। ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০)

বিজ্ঞান কৌমুদী

'বিজ্ঞান কৌমুদী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬০ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। জগমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।* ১৮৬০ সনের ১৪ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন, ১২৬৭) 'সোমপ্রকাশ' এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বিজ্ঞান কৌমুদী নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাই এতৎপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য অন্য বিষয়ও ইহাতে লিখিত দৃষ্ট হইল। প্রথম বারের পত্রে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সকলগুলিই শ্রেয়স্কর। এতৎ পাঠে পাঠকগণের সবিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।..."

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* কেদারনাথ মজুমদার—'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৪৬।

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল*

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের দুইখানি খণ্ডিত পুথি অনেক দিন হইতেই সংগৃহীত আছে।[1] যে কালে পুথি দুইখানি সংগৃহীত হয়, সেই সময় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিপ্রদাসের কাব্যের উপর একটি মন্তব্য এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[2] তাহার পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃঃ ৩৬।৩৭) স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সপ্তগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের উল্লেখ করেন এবং উহার কিঞ্চিৎ অংশও প্রবন্ধমধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দেন। পরে মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩২০ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৃঃ ২২) বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল হইতে কবির পরিচয় ও রচনাকাল-জ্ঞাপক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেন এবং অন্য একাধিক পুথির অস্তিত্বের সংবাদও দেন। এতৎ সত্ত্বেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা অদ্যাবধি গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই নিকট কবি বিপ্রদাস ও তাঁহার এই সুপ্রাচীন কাব্যখানি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত, অনাদৃত অথবা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনায় এই অজ্ঞাতপ্রায় সুপ্রাচীন কবির কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস মনসামঙ্গল রচনা করেন। তখন হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতান।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ে সুলতান ॥[3]

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে প্রাপ্ত কালজ্ঞাপক পয়ারের সঙ্গত পাঠটি যথার্থ হইলে উহা বিপ্রদাসের কাব্যের ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

বিপ্রদাসের পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবিরা চারি সহোদর ছিলেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, সামবেদীয়, কৌথুমী শাখা, বাৎস্য গোত্র, পঞ্চ প্রবর, পিপ্‌লাই গাঁই। বহুদিন ধরিয়া

---

* ১৩৪৩।১৭ই ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। পুথি দুইখানির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫২৯ এবং ৩৫৩০।

২। J. A. S. B, Pr....১৮৯২ পৃঃ ১৯৩ ৭।

৩। পুথিতে আছে,—

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সকল পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের সুলক্ষণ ॥—প্রথম পুথি।
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সা গৌড়ে সুলক্ষণ ॥—দ্বিতীয় পুথি।

'সুলক্ষণ' শব্দের কোন অর্থ হয় না ; ইহা 'সুলতান' শব্দেরই বিকৃতি মনে করিয়া সংশোধিত করিয়া দেওয়া গেল। প্রবন্ধমধ্যে উদ্ধৃত অংশের বানান সর্ব্বত্র সংশোধিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহাঁদের বাদুড়্যা (বাসুড়্যা ? নাদুড়্যা ? নমুড়্যা) বটগ্রামে বসতি। এ বিষয়ে কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মুকুন্দ পণ্ডিতসুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা[4] বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চ প্রবর।
সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥[5]

বাসুড়্যা বা নাদুড়্যা ইত্যাদি নামে কোন গ্রামের সন্ধান পাই নাই। তবে বসিরহাট অঞ্চলে, কলিকাতা হইতে আনুমানিক সতের আঠার ক্রোশ দূরে বাদুড়ে গ্রাম আছে এবং তাহার সন্নিকটে বড়গাঁ বা বটগ্রামও আছে, সন্ধান পাইয়াছি। কবি বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির দুইখানি পুথিই বারাসতের নিকটবর্ত্তী দত্তপুখরিয়া (আধুনিক দত্তপুকুর) গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল। মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব-প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দত্তপুকুর গ্রামের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী ছোট জাগুলিয়া গ্রামের তিন পাড়ায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমীর দিন হইতে প্রায় নয় দিন ধরিয়া পাঠ করা হইত। জাগুলিয়া গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে মনসাপূজা এককালে খুব প্রচলিত ছিল, এইরূপ অনুমান হয়। বিপ্রদাসের মতে মনসার এক নাম "জাগুলি"।[6] ইহা হইতে "জাগুলিয়া" নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

কাব্যরচনার হেতু ও কাল কবি এইরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ[7]।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ[7]॥
কবি গুরু ধীর জনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ে সুলতান॥
হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ[8] লোক পরম পিরীত॥
পদ্মাবতীচরণসরোজমধুলোভে।
দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপে শোভে।

দুইখানি পুথিরই প্রথম পাতাখানি পাওয়া যায় নাই। পুথি দুইখানিতে বন্দনারূপ অনুক্রমণিকা অংশের যেটুকু বর্ত্তমান আছে, তাহাতে সামান্য কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রথম পুথির প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ,—

স্বর্গরাজ ধ্বজা তেজা (?) অষ্টাদশভুজা॥
রিদ্ধি সিদ্ধি নিধি বরপ্রদা সেই সার।
পারিষদগণ বন্দোঁ কার্ত্তিক কুমার॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ মোর ধর্ম্মমা।
মোর অঙ্গে কোন কালে না করিহ ঘা॥

৪। ৩৫২৯ সংখ্যক পুথিতে 'বাদুড়্যা' অথবা 'বাসুড়্যা' পড়া যায়। ৩৫৩০ সংখ্যক পুথিতে 'নদুড়্যা' অথবা 'নমুড়্যা' পড়া যায় ; স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'নক্কড্যা' পড়িয়াছিলেন [ব-সা-প-প, ১৫, পৃ ৩৬]। মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয় 'নাঁদুড়ে' পাঠ ধরিয়াছেন [পৃ ২২]।

৫। ৩৫২৯ সংখ্যক পুথিতে এই ছত্রটি বাদ পড়িয়াছে। অপর পুথির পাঠ এইরূপ,—
শ্যাম বেদ কুতুর সাখা চারি সহোদর॥

৬। জাগিয়া জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি।

৭। দ্বিতীয় পুথিতে যথাক্রমে 'আদেশে' 'বিশেষে'।

৮। প্রথম পুথিতে 'ত্রীবিদ,' দ্বিতীয় পুথিতে 'ত্রিবিধি'।

ইন্দ্র অগ্নি যম নৈরি[৯] বরুণ আনল।
কুবের ঈশান আর বন্দোঁ দিকপাল॥
রবি শশী ভৌম বুধ গুরু শুক্র শনি।
রাহু কেতু নবগ্রহ বন্দোঁ পুটপাণি॥
নারদাদি ঋষি বন্দোঁ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি বন্দোঁ জোড়কর॥
জরৎকারু[১০] মুনি বন্দোঁ তপোতেজোময়।
আস্তীক কু[মা]র বন্দোঁ পদ্মার তনয়॥
নেতোর চরণ বন্দো পদ্মার নন্দিনী।
সর্ব্বনাগগণ বন্দোঁ সকল নাগিনী॥
দ্বিজ গুরু প্রণমহোঁ[১১] জনকজননী।
যাহার প্রসাদে ভোগ সম্ভবে অবনী॥
ভাবক সেবকে বর দেহ বিষহরি।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে করজোড় করি॥

দ্বিতীয় পুথির প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ,—

ভকতি মুকতি হয় যাহার সঙ্গে॥
সাগরের পুত্রগণ অম্বেষণ অশ্ব[১২]।
কপিলের[১৩] শাপে তারা হইয়াছিল ভস্ম॥
ভগীরথ ভাগীরথী আনিয়া অবনি।
পরশে পরমপদ পাইল তখনি॥
ত্রিভুবনে কেবা জানে গঙ্গার মহিমা।
বিধি বিষ্ণু হর আদি না জানে মহিমা॥
কিঞ্চিৎ মহিমা বুঝি জানে গঙ্গাধর।
অদ্যাবধি আছে গঙ্গা মস্তক উপর॥
দ্বিজ গুরু প্রণমহোঁ[১৪] জনকজননী।
যাহার প্রসাদে ভোগ সম্ভবে অবনি॥
ভাবুক সেবকে বর দেহ বিষহরি।
দ্বিজ বিপ্রদাসে বলে করজোড় করি॥

প্রথম পুথি হইতে উদ্ধৃত অংশটি কোন গায়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই মনে হয়। ইহার পর উভয় পুথির মধ্যে আর বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য নাই। ইহার পরের অংশটিতে মনসার সর্পসজ্জার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে যে সাপের নামের তালিকা পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন বলিয়া মূল্যবান্। এই অংশটি নিম্নে তুলিয়া দেওয়া গেল।

জয় জয় বিষহরি বিষধারিভূষণ।
সর্ব্বাঙ্গে শোভে দেবীর নাগ-অভরণ॥
সেবক রক্ষিতে দেবী হইলা সুবেশ।
চিরনিয়া নাগ লৈয়া কুরুনিলা[১৫] কেশ॥
নাইনাড়া নাগে কৈল কবরী প্রতুল।
উদয়কাল নাগেতে খোপার পদ্মফুল॥
অলকাবলি চিত্রনাগ হইলা শোভন।
নীলমেঘতটে যেন[১৬] উদয় তারাগণ॥
সিন্দুরিয়া নাগ হৈল সীমন্তে সিন্দুর।
উদয়গিরি সূর্য্য যেন করিছে মেদুর॥
ধুসরিয়া বোড়া দেবীর হৈল সুকুন্তলা।
কুইয়া বোড়া হইল দেবীর অভিন্ন চপলা॥
সর্প নাম[১৭] নাগেতে মাথার সিতিপাটী।
নীলমেঘতটে যেন বিজলী দিপতি॥
কালচিতি নাগে দেবীর ভুজযুগ সাজে।
কালিন্দীর হস্তী যেন স্বর্ণগিরি মাঝে[১৮]॥
কালী নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল।
কুবলয়-দলে[১৯] যেন খঞ্জন যুগল॥
কনকচিতি নাগে দেবীর নাসিকা উজ্জ্বল।
কুণ্ডলিয়া নাগে হইল শ্রবণে কুণ্ডল॥
সুরঙ্গ সিন্দুর নাগে অধরের কান্তি।
ধবলিয়া চিতি হইল দশনের পাঁতি॥
এতেক উরগে যদি মস্তক শোভন।
কলেবরে শোভেরে[২০] প্রবল নাগগণ॥

৯। নৈঋ‌ত। ১০। পু (পুথির পাঠ) 'জরৎকার'। ১১। পু 'প্রণমহ'।
১২। পু 'অশ্বাসন অস্স' (বা 'অশ্ব')। ১৩। পু 'কপিলার'। ১৪। পু 'প্রণমহ'।
১৫। 'কুরণিয়া' প্রথম পুথি। ১৬। 'জেন নিলমেঘেতে' ঐ।
১৭। 'সর্পা নামে' প্রথম পুথি; 'সর্ব্বনাম' দ্বিতীয় পুথি।
১৮। পু 'মাজে'। ১৯। 'দকে' দ্বিতীয় পুথি। ২০। 'শেবিয়' ঐ।

শ্বেতকর্ণ নাগেতে গলার কেয়াপাতি।
শীতগিরি বেড়ি যেন বহে ভাগীরথী॥
কণ্ঠে ভূষিত মণি-নাগের দিপতি।
উদয় শিখরে যেন স্বর্ণময় জ্যুতি॥
হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার।
সুমেরু শিখরে জেন বিজুলি ঝঙ্কার॥
কনকমৃণাল ভুজে বলয়া[২১] প্রকার।
রাজসর্প হৈল দেবীর তাড় অলঙ্কার॥
শঙ্খলিয়া[২২] চিতি হৈল দুই ভুজে শঙ্খ।
বাহুটী কঙ্কণ হৈল আড়িয়াল-বঙ্ক॥
বিষতিয়া বোড়া হইল অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
গন্ধচিতি নাগ দেবীর কুমকুম্ কস্তুরি॥
মলয়জ নাগ চন্দন শোভে গায়।
তাহার সৌরভ গন্ধ দশদিকে ধায়॥
[মুকুলিয়া[২৩] বেড়া দেবীর হৃদয় কাঁচলি।
নেতের আঁচলে হৈল নাগ ধনিয়াহুলি॥
উলু বোড়া নাগ দেবীর কাছিয়া চরণ।
বেত আছাড় কটীতটী করিল বন্ধন॥
নাউডুগি নাগে দেবীর গাথিয়া বসন।
চরণে নূপুর শোভে নাগ অভরণ॥
কালচিতি নাগে কৈল অঙ্গু[লে] অঙ্গুরি।
আর যত নাগগণ পাএর পাহুলি॥
নাগ অভরণে দেবী হইলা প্রচণ্ড।
কালনাগিনী তার শিরে ধরে দণ্ড॥
দুই ভিতে নাগদল ধরিল জোগান।
বাসুকি পঠেন [যত] শাস্ত্র পুরাণ॥
অনন্ত তক্ষক নৃত্য করেন আপনি।
শঙ্খ মহাশঙ্খ করেন জয়ধ্বনি॥
সেবকেরে বর দিতে উর মণ্ডপুরী।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর জোড় করি॥][২৪]

ষোড়শ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে রচিত কোন মনসামঙ্গলে মনসার সর্পসজ্জার বিবরণ নাই। কেবল কাণা হরিদত্তের লেখা বলিয়া প্রচলিত একটু অংশে আছে। সেটুকু এই,—

দুই হাতের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
কেশের জাদ[২৫] হইল এ কাল নাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি॥
সিতলিয়া নাগে কৈল সীঁথার[২৬] সিন্দুর।
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিঙ্কিণী।
বেতনাগ দিয়া কৈল কাকালি কাঁচুলী॥
কনক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি।
বিষাতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে যার অগ্নি কণা কণা॥
অমৃতনয়ান এড়ি বিষনয়ানে চায়।
চন্দ্র সূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥[২৭]

তাহার পর বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার বিবিধ নামের উল্লেখ ও কারণ দেওয়া হইয়াছে।

[জনম পাতাল পুরী অযোনিসম্ভবা।
নির্ম্মানি জননী মহাদেব তেজসম্ভবা॥
আপনা আপনি কৈলা জীবের সঞ্চার।
বাসুকি দিলেক বিষ নানা অধিকার॥][২৮]
উদ্ভবা পাতাল নাম পাতালকুমারী।
নাগদান পাইয়া নাম হইল নাগেশ্বরী॥
কালিদহে পদ্মবনে হইল উৎপত্তি।
তথির কারণে নাম হৈল পদ্মাবতী॥
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারি।
তথির কারণে নাম মনসা কুমারী॥

২১। 'বলয়' প্রথম পুথি। ২২। 'সঙ্কলিয়া' বা 'সঙ্কনিয়া'। ২৩। 'মঙ্গলিয়া' ?

২৪। দ্বিতীয় পুথিতে বন্ধনীস্থিত অংশ নাই। ২৫। পু 'জাত'। ২৬। পু 'সীতার'।

২৭। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত), প্রথম খণ্ড, ১৭৪-১৭৫ পৃঃ।

২৮। দ্বিতীয় পুথিতে বন্ধনীস্থিত অংশটি নাই।

নিরঞ্জনকার ভেদ সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানী। ব্রহ্মজ্ঞান পায়্যা নাম হইল ব্রহ্মাণী॥
মহাজ্ঞান দিল যদি দেব শূলপাণি। যোগেশ্বরী নাম আর পরম যোগিনী॥
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল মন্দাক্ষী। চণ্ডী জীত্যা নাম হইল বিষপূর্ণ-আখি॥
শুক্লবস্ত্র পরি যবে গেলা বনবাসে। শ্বেতাম্বরী নাম আর সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল নির্ব্বাসিনী। পর্ব্বতে পার্ব্বতী নাম পর্ব্বতবাসিনী॥
জরৎকারুপত্নী নাম হইল জগদ্‌গৌরী। পতির বিচ্ছেদে নাম পতিমন্দোদরী॥
জাগিয়া জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি। আমি কি বলিতে পারি আমার[২৯] শকতি॥

তাহার পর আত্মপরিচয় দিয়া, কথাবস্তু বিস্তার করিবার প্রারম্ভে কবি 'গ্রন্থানুবাদ' অর্থাৎ সূচিপত্র বা বিষয়বস্তুর সারাংশ বর্ণনা করিয়াছেন,—

প্রথমে কহিব তত্ত্ব শুন নর একচিত্ত
মহাযজ্ঞ করে দেবগণে।
গঙ্গা হরের ঘরে নিরঞ্জন আসি তাঁরে
যেন মতে দিলা দরশনে॥
নাগ ইন্দ্র রক্ষা কাজে কালিদহে দেবরাজে
মনসা জন্মিল যেন মতে।
চণ্ডীর সহিত বাদ হৈল বড়[৩০] পরমাদ
নির্ব্বাসিলা সিজুয়া পর্ব্বতে[৩১]॥
কহিব যজ্ঞের কথা কপিলার নন্দন যথা
ব্যাঘ্র মন্থরথে[৩২] মহারণ (?)।
ব্রহ্মশাপ ইন্দ্রে হইল লক্ষ্মী জলধি গেল
ক্ষীরনদী করিল মথন॥
বিশ্বেশ্বর পশুপতি আসিয়া ত্বরিতমতি[৩৩]
যেন মতে করাইল চেতন।
বিষ বাঁটি দিলা নাগে মনসার বিভা যোগে
জরৎকারু[৩৪] মুনি মহাজন॥
আস্তীক কুমার হৈল নাগ ইন্দ্র রক্ষা পাইল
জন্মেজয় যজ্ঞ নাশ করি।
মায়া পাতিয়া গিয়া[৩৫] রাখালের পূজা লৈয়া
বধিলেন হাসনের পুরী॥

জানু লইল নিজস্থানে হরিল চাঁদোর জ্ঞানে
যেন মতে বধি ধনন্তরি[৩৬]।
ধনা মনা বধ করি চাঁদোর ছ[য়] পুত্র মারি
অনিরুদ্ধ[৩৭] উষা আনি হরি॥
নৃপতি পাটনে যায় লখাই বেহুলা হয়
চাঁদ রাজা আইল নিজ দেশে।
উজানি নগরে গিয়া লখাই বেহুলা বিয়া[৩৮]
এড়িল লোহার গুপ্তবাসে॥
সুতার সঞ্চারে আসি লোহার মন্দিরে[৩৯] বসি
দংশিলেক কালনাগিনী।
মাযাসে[৪০] ভাসিয়া গেল মৃত পতি জিয়াইল
সুরপুরে করিল মেলানি॥
তাহা দেখি চাঁদো রাজা করিল পদ্মার পূজা
লখাই বেহুলা স্বর্গবাসী।
সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গল গীত
বিস্তরে কহিব সপ্ত নিশি॥
এ সব অপূর্ব্ব গীত[৪১] যেই শুনে একচিত
ধন পুত্র সিদ্ধি পূরে[৪২] আশ।
পদ্মাপদ পঙ্কজে পুট চাটু করি ভুজে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস॥

২৯। তোমার ?
৩০। 'দেখ হইল' দ্বিতীয় পুথি।
৩১। 'নির্ব্বাসন দিলেন পর্ব্বতে' ঐ।
৩২। 'ব্রহ্ম মনরথে' (বা 'বথে') প্রথম পুথি।
৩৩। 'আসিয়াত পদ্মাবতি' দ্বিতীয় পুথি।
৩৪। পু 'জরৎকার'।
৩৫। 'মায়া পাতিয়া পদ্মা গিয়া' প্রথম পুথি।
৩৬। 'জেমতে বধিলা ধনন্তরি' ঐ।
৩৭। পু 'অনিরুদ্র'।
৩৮। 'বিভা দিয়া' ২য় পুথি।
৩৯। 'বাসরে' দ্বিতীয় পুথি।
৪০। 'মাদাসে' প্রথম পুথি ; মার্যাষ—মঞ্জুষা।
৪১। 'সম্পূর্ণ সিদ্ধি ব্রত' প্রথম পুথি।
৪২। 'হয়' ঐ।

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পুথিতে যে যে স্থানের বর্ণনা আছে, তাহাতে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। অনেক পরিচিত স্থানের নাম আছে—তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে কলিকাতার নাম। কলিকাতার নাম এই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেল। চানকের উল্লেখ আছে। জব চার্নকের নাম হইতে চানক নাম উদ্ভূত হইয়াছে, এই কথা আধুনিক কালে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। Charnock (চার্নক) হইতে 'চানক' হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু 'চানক' নামে একাধিক গ্রাম আছে। বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমান্তে 'চানক' নামে গ্রাম আছে। এই গ্রামের শচীনন্দন বিদ্যানিধি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জ্বলনীলমণির অনুবাদ করেন। সুতরাং 'চার্নক' হইতে 'চানক' হইয়াছে, এই অনুমান অযৌক্তিক। সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা আছে, তাহা যে পঞ্চদশ শতকের পরবর্ত্তী কালের হইতে পারে না, ইহা স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক অপরিচিত স্থান ও নদী প্রভৃতির উল্লেখও আছে। বর্ণনাটি মূল্যবান্, সুতরাং নিম্নে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত হইল।

রাজঘাট রামেশ্বর[৪৩] বাহিয়া এড়ায়।
ধর্ম্মখান বাহিয়া অজয় নদী পায় ॥

উজানি[৪৪] বাহিয়া আসি হৈল উপনীত।
শিবানদী[৪৫] সাড়াই[৪৬] বাহিল ত্বরান্বিত[৪৭] ॥

উজানি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্রঘাটে।
(আসি ছাড়িয়া) ইন্দ্রচরণ পুজে সেই নদীতটে ॥

ইন্দ্রাণী বাহিয়া নদী যায় উপনীত।
আঁবুয়া[৪৮] ফুলিয়া গিয়া চাপায় বুহিত ॥

রন্ধ[ন] ভোজন করি গোঁযায় রজনি।
বাহো বাহো বলিথা ডাকে নৃপমণি ॥

বুহিত্র বাহিযা সুখে চলিল প্রভাতে।
ফুলিয়া বাহিয়া গিয়া হৈল উপনীতে[৪৯] ॥

গুপ্তীপাড়া বাহিয়া মির্জ্জাপুর আইসে।
ত্রিবেণী[৫০] লাগায় ডিঙ্গা বলে বিপ্রদাসে ॥

নাটক রাগ ॥

বুহিত্র চাপায়্যা কূলে   চাঁদ অধিকারী [ব]লে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্ত ঋষি স্থান   সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ (?) সর্ব্বগুণধাম ॥
যতি হয়্যা একমতি   ঋষি মুনি সবে তথি
তপ জপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী   যমুনা বিশাল অতি[৫১]
অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী ॥
দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গ[৫২]   চাঁদরাজ মনে রঙ্গ[৫৩]
কূলেতে চাপায়্যা মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ   করে নৃপ (তি)তীর্থকাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর ॥
তীর্থকার্য্য সমাপিয়া   অন্তরে হরি[ষ] হয়্যা
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ[৫৪] আশ্রমে লোক   নাহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর ॥

৪৩। বা 'বামেশ্বর'।
৪৪। পু 'উজনি'। পরবর্ত্তী বর্ণনায় 'উজবনি'।
৪৫। পু 'সিবানদি'।
৪৬। 'সাথাই' পরে দ্রষ্টব্য।
৪৭। পু 'ত্বরাত্বতি'।
৪৮। পু 'আবুয়া'।
৪৯। পু 'উপতি'।
৫০। পু 'ত্রিবিনি'।
৫১। পু 'থতি'।
৫২। পু 'ত্রিবিণি গঙ্গো'।
৫৩। পু 'রঙ্গো'।
৫৪। পু 'ছত্তিষ'।

বৈসে যত দ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজোময় যেন দিবাকর।
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মর্ম্মে বিশারদ[৫৫] গুরুধর্ম্মে
জ্ঞানগুরু দেবের সোসর॥
পুরুষ মদন যেন রমণী সাবিত্রী হেন
অভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত তাহা বা কহিব কত
হেরিতে নিমিক বিলয়[৫৬]॥
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের বারা।
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতিময় কাচচাল
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা॥
সভে দেবে ভক্তিমতি প্রতি ঘরে নানা মূর্ত্তি
রত্নময় সকল প্র[া]সাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্যি[৫৭] শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি
দেখি রাজা বড়ই প্রমোদে[৫৮]॥
নিবসে যবন যত তাহা বা বলি[ব] কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
সৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি
দুই ওক্ত[৫৯] করে তছলিম॥
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে
করতা কর়য়ে নিত্য[৬০] লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
উদ্ধারিয়[া] ভকত সেবকে॥
দিন দুই তথা রহি মেলিল বুহিত।
কুমারহাট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত॥
ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া।
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্ব্বে কাকীনাড়া॥
মুলাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর।
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর॥
চাঁপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর॥
বামে বাকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে।
চাপাচানি বাহি রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে॥
পুজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম।
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপাম॥
চানক বাহিয়া যায় বুড়লিয়ার দেশে।
তাহা রামলাল (?) বাহি আকনা মাহেশে॥
খড়দহে শ্রীপাট[৬১] করিয়া দণ্ডবত।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে আবিরত[৬২]॥
রিসিড়া ডাহিনে রহে বামে সুকচর।
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোন্নগর॥
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে।
পূর্ব্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষড়ি[৬৩] পশ্চিমে॥
চিতপুরে পুজে রাজা সর্ব্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্ব্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥
পুজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর।
হাসিতে [হাসিতে] সারি[৬৪] গায় নায় নফর॥
নানা উপচারে[৬৫] কৈল রন্ধ[ন] ভোজন।
ধনও (?) বাহিয়া গেল ত্বরিত গমন॥
কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালিকা পুজিয়া।
চুড়াঘাট বাইয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে॥
হেন কালে মনসা ভাবেন মনে মন।
দ্বিজ বিপ্রদাস [কবি] করিল রচন॥

... ...

হুলিয়ার গাঙ্গে বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগ গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥
তীর্থকার্য্য চাঁদরাজ করিল তথায়।
বদরিকা কুণ্ডে জল লইল নৌকায়॥
তাহার মেলান রাজা বাহে হাথিয়গড়।
শতমুখী বাহি রাজা যায় দড়বড়॥
চৌমুখি[৬৬] বাহিয়া রাজা হরষিতে যায়।
তথায় চাপায়া ডিঙ্গা যায় চাঁদরায়॥

৫৫। পু 'বিসাদ'। ৫৬। নিমিষ নাহি লয়? ৫৭। পু 'বাদ্দি'।
৫৮। পু 'প্রমাদে'। ৫৯। পু 'তার্ত্ত'। ৬০। 'নিতা'?
৬১। পু 'ত্রিপাট'। ৬২। পু 'আভিরত'। ৬৩। বা 'ঘুছড়ি'।
৬৪। পু 'সাড়ি'। ৬৫। পু 'উপহারে'। ৬৬। বা 'চৌমুখে'।

শঙ্কর মাধব পুজে হইয়া একমন। তীর্থকার্য্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে॥
তীর্থকার্য্য শ্রাদ্ধ কৈল পিত্রির তর্পণ॥ দরিয়া প্রবেশ হইল চাঁদোর মধুকর।
তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশে। নিশিদিশি বাহে অষ্ট প্রহর সত্বর॥

সাখাই বা সাড়াই নদীর কোন সন্ধান পাই নাই। "বরগ্রামের কিছু দক্ষিণে এখনও শিবা নদী আছে, কিন্তু গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে ও তিনি এক্ষণে শিয়াল-নালায় পরিণত হইয়াছেন[৬৭]।" কোগ্রাম হইতে দুই চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ধরমখান নামে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। হয়ত ইহাই ধর্ম্মখান নদীর স্মৃতি বহন করিতেছে। 'আড়িয়ল খান' ইত্যাদি নদীর নামে যে 'খান' শব্দ পাওয়া যায়, তাহা 'খন্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই তালিকায় নদীয়ার নাম না থাকা বিস্ময়কর বটে। সম্ভবতঃ লিপিকার-প্রমাদে ছাড় পড়িয়াছে। চাঁদ যখন পাটনের রাজার নিকট নিজের যাত্রার বিবরণ বলিতেছেন, তখন অবশ্য নদীয়ার উল্লেখ আছে। শ্রীপাট খড়দহের উল্লেখ একটু আশ্চর্য্যের ঠেকিতে পারে। সম্ভবতঃ এই স্থানে কবির গুরুগৃহ ছিল; অন্যথায় এই অংশটি লিপিকারের প্রক্ষেপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু পুথিদ্বয়ের কুত্রাপি শ্রীচৈতন্যের অথবা নিত্যানন্দ প্রভুর উল্লেখ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া বর্ণনাটি পরবর্ত্তী কালের হইলে শান্তিপুরের উল্লেখ অবশ্যই থাকিত। 'হুগুলি' রূপটি প্রাচীন, পোর্ত্তুগীজের লিখিত Ugulim। চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা) ও চুঁচুড়ার অনুল্লেখ প্রাচীনত্বদ্যোতক। 'নিমাইতীর্থ' বর্ত্তমান বৈদ্যবাটী; ইহার সহিত শ্রীচৈতন্যের কোন সংস্রব নাই। নিমগাছে জবা ফুল ফুটিত, সেই জন্য এই তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে[৬৮] আছে,—"উপনীত হৈল গিয়া নিমাইতীর্থ ঘাটে। নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে॥" এইরূপ আর একটী খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তাহাও নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

পটমঞ্জরি॥
অবধান কর নৃপমণি।
মধুকরে অহর্নিশি সলিলে ভাসিয়া আসি
দিগবিদিগ নাহি জানি॥
নানা দুঃখ ক্লেশ পাইয়া পূর্ণিত বুহিত নাইয়া
অবিলম্বে আসি তব পুরী।
প্রথমে বাহিনু জান রামেশ্বর্ ধর্ম্মখান
অজয়া বিজয়া সুরেশ্বরী॥
উজবনি ক্রমে বাই শিবানদী শাথাই[৬৯]
ওধানপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর।
বাহিনু নদীয়া দিয়া আঁবুয়া[৭০] ফুলিয়া বায়া
ত্রিবেণী[৭১] প্রবেশ মধুকর॥

নানা পক্ষি(?) বায়া আসি কালিদহে পরবেশি
তথা কানি[৭২] পাতে অবতার।
আলিকে (?) নাগগণ ত্রাস পায় সর্ব্বজন
শুন মিতা বিক্রম আমার॥
হেতালের বাড়ি ধরি ডাকিনু বিক্রম করি
নাগগণ পালায় সকল।
ভাঙ্গিয়া মণ্ডপঘর ভরা দিনু মধুকর
সাগরে দিলাম দরশন॥
দরিয়ায় পরবেশি নাহি জানি দিবানিশি
বাহি আমি অষ্ট প্রহর।
উড়িয়া বিহগ বুলে ছই ঘর মানুষ গিলে
তাহা দেখি কাঁপে প্রাণেশ্বর॥

৬৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৬।

৬৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ, পৃঃ ৬৪০।

৬৯। 'সাড়াই' পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ৭০। পু 'আবুয়া'। ৭১। পু 'ত্রিবিনি'। ৭২। বা 'কালি'।

কাঁকড়া জোকাই দিয়া শঙ্খ কড়িয়া বায়া
নানা দুঃখ বাহিনু সম্বল।
সিংহল প্রবেশ তথা পদ্মিনী জনমে যথা[৭৩]
সর্ব্বাংশে পুরুষ বিচক্ষণ॥

এড়াইয়া বহু দেশ তব রাজ্য পরবেশ
কহিলাম দুঃখের কাহিনী।
দ্বিজ বিপ্রদাস ভণে করি এই নিবেদনে
অন্তকালে তরাইব ভবানী॥

ওধানপুর বোধ হয়, বর্ত্তমান উদ্ধারণপুর। 'উদ্ধারণপুর' হইতে 'ওধানপুর' হইতে পারে না। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে 'ওধানপুর' 'উদ্ধারণপুর' এইরূপে শুদ্ধীকৃত হইয়াছে। 'ইন্দ্রেশ্বর' ইন্দ্রাণীস্থিত দেবতা, তাহা হইতে ইহা স্থানের নামও বুঝাইত। প্রথম বিবরণে 'ইন্দ্রাণী' নাম আছে। ইন্দ্রাণীতে ইন্দ্রেশ্বর দেবতার উল্লেখ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে[৭৪] আছে, —"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বরের পূজা কৈল দিয়া পুষ্পপাণি॥" ১৯২৩ জৈনাব্দের (=১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দের) একটি লিপিতে 'ইন্দ্রেশ্বর' এই স্থাননামের উল্লেখ আছে[৭৫]।

বিপ্রদাস যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন ধর্ম্ম ঠাকুরের প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। অনাদ্য তখন দেবের দেব। স্বয়ং শিবও তাঁহার দর্শন লাভের প্রত্যাশায় বল্লুকার তীরে (?) অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া তপস্যায় নিরত থাকেন, তবুও দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে না। অপর কোন মনসামঙ্গলে ধর্ম্মঠাকুরের এইরূপ প্রভাব বা প্রতিপত্তির উল্লেখ নাই। এই প্রসঙ্গে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ধর্ম্মঠাকুর কর্তৃক জগৎসৃষ্টির উপাখ্যান স্মরণীয়। শূন্যপুরাণের তারিখ কি, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সুতরাং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ধর্ম্মপূজার উল্লেখ যদিও প্রাচীনতম না হউক, তথাপি বিশেষ প্রাচীন, ইহা ঠিক। এই হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত মহাদেবের ধর্ম্মধ্যান ও ধর্ম্মের আগমন অংশটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ধানসি রাগ।

হাথে লইয়া জাপামাল জপ[৭৬] করে চিরকাল
পঞ্চমুখে করেন স্তবন।
ব্রহ্মমন্ত্রে বেদ বলে মুখেতে আনল জ্বলে
প্রকাশিত তিন লোচন॥
নানা পুষ্প লইয়া করে অনাদ্যের পূজা করে
একচিত্ত ধ্যান অনুক্ষণ।
গলায় রুদ্রাক্ষমাল বিভূতিভূষণ ভাল
বল্লুকা দেখিতে নিরঞ্জন॥
মুলমন্ত্র জপ করি ত্রিশূল ডম্বর ধরি
করিলা বিস্তর তপ ধ্যান।
কভু বা যুধুর্থ[৭৭] (?) খায় ভর করি এক পায়
নিরবধি যোগেতে গেয়ান॥

উর্দ্ধ বাহু করি ক্ষণে ক্ষণে নাগ শয়নে
নিদাঘেতে আনল বেষ্টিত।
জলে রহি শীতকালে শিরে ধারা বর্ষাকালে
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত॥

ধবল ছত্র ধরি শিরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
উলূকে করিয়া আরোহণ।
ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর
হরের আশ্রমে দরশন॥
ডাকিয়া শিবের তরে কহিয়া[৭৮] মধুর স্বরে
গঙ্গা আছিলা সেই ঘরে।
অতি সুললিত বাণী অভ্যন্তরে গঙ্গা শুনি
উপসন্ন গোসাঁঞি গোচরে॥

৭৩। পুথি 'তথা'। ৭৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ—পৃঃ ৬৩৭।

৭৫। কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত জৈন পিত্তলফলক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, পৃঃ ২১৫।

৭৬। 'তপ' দ্বিতীয় পুথি। ৭৭। অথবা 'যুধুর্থ'। ৭৮। 'করিয়া' প্রথম পুথি।

দেখি নিরঞ্জনকায়　　গঙ্গা চমকিত হয়
করে যোড়ে কৈল পরিহার।
ধর্ম্মের বচন দেখি　　গঙ্গা ধবলমুখী
রথে ভর কৈল অবতার ॥
অন্তরীক্ষে ধর্ম্মরায়　　গঙ্গে দিল পরিচয়
জানাইল হরের অগ্রেতে।
দ্বাদশ বৎসর হয়　　আমা পুজে নিরন্তর
আইলাম তাহারে দেখিতে ॥
না দেখিল[৭৯] ত্রিলোচন　　আছিল অনন্তমন
আমারে দেখিল দৃষ্টিবলে।
হের[৮০] বলি সন্বিধান　　দ্বিজ বিপ্রদাস গান
গঙ্গা বলেন হেন কালে ॥

পাঁচালী[৮১]।

শুন প্রভু কৃপানাথ কর অবধান।
তুমি সে কৈবল্য[৮২] গুরু কারণ্য[৮৩] নিদান ॥
সংসার সৃজিয়া গোসাঞি ভার দিলা হরে।
তোমার সৃজন সৃষ্টি দিলা মহেশ্বরে ॥
তোমারে দেখিতে হয় অনেক সাধনা।
বলুকায় দুঃখ পায় ক্লেশ যাতনা ॥
দ্বাদশ বৎসর হর বড় পায় দুঃখ।
তোমা না দেখিয়া[৮৪] হয় না ধরিবে বুক ॥
অন্তির্দ্ধগায় মাত্র হৈলা দেবরায়।
বারএক দেখা[৮৫] দেহ হইয়া সদয় ॥
গঙ্গার উত্তর শুনি বলে নিরঞ্জন।
এই কথা কহিয়া আইলে ত্রিলোচন ॥
তোমারে দেখিলে হরে[৮৬] সেই দেখা মোরে।
শিরে জটা মেলি যেন লয় তোমা শিরে ॥
তবে যদি অতি খেদ করে দেবরায়।
কালিদহে কমল তুলিতে যেন যায় ॥
কালিদহে কমল তুলিব মায়াধর।
তবে কন্যারূপ মায়া দেখিবেক হর ॥
কহিয়া গেলেন প্রভু গঙ্গা হেট মাথা।
আমি কি বলিব হর এই মন চিন্তা[৮৭] ॥
বসিলা ধবল খাটে হইয়া শ্বেতকায়।
ওথা তপ[৮৮] তেজিয়া আইলা দেবরায় ॥
সাজি কমণ্ডলু থুইয়া দেব মহেশ্বরে।
ধবল-আকার গঙ্গা দেখিল মন্দিরে ॥
দ্বিজ বিপ্রদাসে বলে সকরুণ বাণী।
দেখিয়া গঙ্গার রূপ বলে শূলপাণি ॥

এইবার পুথি দুইখানির বিষয় কিছু বলা কর্ত্তব্য। দুইখানি পুথিরই আদ্যন্ত খণ্ডিত। প্রথমটিতে দুইটি মাত্র পালা এবং দ্বিতীয়টিতে নয়টি মাত্র পালা আছে। সর্ব্বসমেত হয় ত বাইশ পালা ছিল। দ্বিতীয় পুথির সমাপ্তি এইরূপ,—

"পদ্মা[র] মায়ায় চাঁদ রহে সেই দেশে।
এখন রহিল গীত বলে বিপ্রদাসে ॥

এ পুস্তক শ্রীগোপীনাথ সিংহ সাকিম দত্তপুখরিয়া। সংমিদং। শ্রীশ্রীগোপাল সিংহ।" প্রথম পুথির প্রাপ্ত অংশের প্রথম পৃষ্ঠার শেষে আছে,—"স্বঅক্ষর .....রাম সিংহ সাকিম দত্তপুখরিয়া।"

পঞ্চদশ শতকের পুস্তক বলিয়া এবং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট বলিয়া সম্পূর্ণ পুথি না পাওয়া গেলেও বিপ্রদাসের কাব্যের প্রাপ্ত অংশটুকুও প্রকাশের যোগ্য।

শ্রীসুকুমার সেন

৭৯। 'দেখিনু' প্রথম পুথি।　৮০। 'হর' দ্বিতীয় পুথি।　৮১। পুথি 'পাচালি'।
৮২। 'কারন্ত' প্রথম পুথি, 'কার্ব্বণ্য' দ্বিতীয় পুথি।　৮৩। 'কারন্ত' প্রথম পুথি; 'করন্ত' দ্বিতীয় পুথি।
৮৪। 'দেখিলে' দ্বিতীয় পুথি।　৮৫। 'বারেক দর্শন' দ্বিতীয় পুথি।　৮৬। 'হর' প্রথম পুথি।
৮৭। 'কথা' দ্বিতীয় পুথি।　৮৮। 'তপবন' প্রথম পুথি।

উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথা*

চৈতন্যদেবের কথা লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।(কিন্তু আলোচনার উপাদান শুদ্ধ বাঙ্গালা ধর্ম্ম-সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিলে চলিবে না। এ বিষয়ে উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নহে; কারণ, মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের তিন-চতুর্থাংশ কাল উড়িষ্যাতে কাটাইয়াছিলেন ও তাঁহার উড়িয়া শিষ্য ছিলেন অসংখ্য। উড়িয়া ধর্ম্ম-সাহিত্যের বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ যত্ন ও আগ্রহের অভাবে লোপ পাইয়াছে। "আখরিয়া"দের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যে কত পুথির পাঠ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য উড়িয়া উপাদানের পরিমাণ এখন অল্পই। তবে অল্প হইলেও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সেটুকুর মূল্য আছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, উড়িয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য উড়িয়া পার্ষদগণপরিবৃত অবস্থায় অঙ্কিত হইয়াছেন। এই সাহিত্যে উল্লিখিত গৌড়ীয় ভক্তদের সংখ্যা কম ও তাঁহাদের মহিমা বর্ণনা আরও কম। পক্ষান্তরে, উড়িয়া সাহিত্যে যাঁহারা চৈতন্য-ভক্তদের মধ্যে প্রধান-তম, গৌড়ীয় সাহিত্যে সেই সকল উড়িয়া ভক্তেরা যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্য অনুসারে জগন্নাথ, বলরাম, অচ্যুতানন্দ, যশোবন্ত ও অনন্ত দাসই প্রভুর উড়িয়া ভক্তদের মধ্যে প্রধান[১]। উড়িষ্যার চৈতন্য-পূর্ব্ব বৈষ্ণবধর্ম্মকে সংমিশ্রিত (heterogenous) বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলা উচিত। বৌদ্ধ, শৈব, রামাইত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমন্বয়ে উৎকলীয় জ্ঞানমিশ্র-ভক্তি-মূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের সৃষ্টি। চৈতন্যদেব জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবদের সহিত বহু সময়ে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন। অচ্যুতানন্দ-রচিত "শূন্যসংহিতা"য় এই কথাই বলা হইয়াছে (১ম অধ্যায়),—

"মহাপণ্ডিত শ্রীচৈতন্য গোসাইঁ বেদ বেদান্তরে সার।
যে যেমন্তে বিদ্যা শখোলা করন্তি পড়ন্তি সেহি প্রকার"॥

দিবাকর দাসের "জগন্নাথচরিতামৃত" গ্রন্থে দেখা যায়, উৎকলীয় জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিপন্থী ও নবাগত শুদ্ধ-ভক্তিপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। দিবাকরদাস শিষ্য-পরম্পরায় জগন্নাথদাসের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ বলিয়া পরিচিত। জগন্নাথদাসের বৈষ্ণবোচিত পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া চৈতন্য একদিন—

... ... "হরষ হোইলে গোসাইঁ॥
আপনা শ্রীঅঙ্গ পাছোড়ি শ্রীকর যেনি অঙ্গু কাড়ি॥
দাসঙ্ক শিরে বান্ধি দেলে "অতিবড়" বোলি বোইলে॥
অতিবড় কথা কহিল তেনু "অতিবড়" হোইল॥—(৩য় অধ্যায়)।

---

* ১৩৪০, ১৬ই আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই পাঁচ জন "পঞ্চ-সখা" নামে পরিচিত—"অনন্ত অচ্যুত যেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহিঁ নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গ চন্দ্র সঙ্গত॥" (অচ্যুতানন্দ দাস-রচিত শূন্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।)

"অতিবড়" বোলি বোলন্তে — বৈষ্ণবে দুঃখ কলে চিত্তে ॥
ওড়িয়া ব্রাহ্মণঙ্কু রাই — বোইলে অতিবড় তুহি ॥
আজি পর্য্যন্ত সেবা কলু — সমস্তে থান পদে গলু ॥"

প্রভু কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও "অতিবড়" উপাধি প্রত্যাহার করিলেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা স্থির করিলেন,—

পুরুষোত্তম যেবে খিবা — এহি ভাষা সিনা শুনিবা ॥
ওড়িয়া সঙ্গ ছড়াইবা — গউড় দেশে চালি যিবা ॥
বোইলে চৈতন্যকু চাহিঁ — 'যতি, এক রাজ্যে ন রহি ॥
গয়া গঙ্গাসাগর স্নান — কর হে তীর্থ পর্য্যটন' ॥
এ বাক্য শুনি শ্রীচৈতন্য — সেরূপে কহিলে বচন ॥
'মোহর মনবুদ্ধি ভাব — শরণ জগন্নাথ ঠাবে ॥
জীয়ইঁ অবা মরইঁ — জগন্নাথুঁ মো অন্য নাহিঁ' ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শেষে বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। প্রতি বৎসর তাঁহারা রথযাত্রার সময় আসিতেন। কিন্তু "অতিবড়" জগন্নাথদাসের প্রাধান্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দিবাকরদাসের বর্ণনা অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় সাহিত্যে জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে নীরবতা ও অপর সাহিত্যে মতবিরোধের দরুণ বিকৃত বর্ণনা—এই দুই উল্টা দিকের সামঞ্জস্য করিলে সত্য-নির্ণয়ে সুবিধা হইবে।

উড়িয়া ভাষায় অন্ততঃ তিনখানি চৈতন্য-জীবনচরিতের নাম জানা যায়। "শ্রীমচ্চৈতন্যগীতা" বা চৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদ পরমানন্দ ভ্রমরবর-রচিত। এই উড়িয়া পুথিখানির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুথিখানি শ্রীহরিভক্ত কবিরাজ বাঙ্গালা পয়ারে অনুবাদ করেন ও পরে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের পিতা সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ মহাশয় বাঙ্গালা অনুবাদটীর মার্জ্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। গৌড়ীয় মতাবলম্বী সদানন্দ কবিসূর্য্যব্রহ্ম অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের লোক। তিনি তাঁহার অপ্রকাশিত "মোহনকল্পলতা" পুথির শেষে নিজের রচনাগুলির একটী তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকায় পাই, তিনি চৈতন্য-দেবের বাল্যলীলা অবলম্বনে "ব্রহ্মাণ্ডমঙ্গল" নামে প্রাকৃত ভাষায় একখানি বই লিখিয়াছিলেন,—

"চৈতন্য জীবন বাল্য-লীলা বিধিমতে ব্রহ্মাণ্ড-মঙ্গল কেবল পরাকৃতে"

এই পুথিখানির একখণ্ড শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শুনি-য়াছি। তৃতীয় জীবনচরিতখানির নাম চৈতন্য-ভাগবত। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। গ্রন্থকারের নাম ঈশ্বর দাস। এই গ্রন্থ ৬৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে চৈতন্যদেব বুদ্ধ অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্যে বুদ্ধের ঠাঁই নাই[২]।

২। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত "জগন্নাথচরিতামৃত" অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের হাস্য হইতে উদ্ভূত চৈতন্যদেব শেষে রাধাকৃষ্ণের সহিত অভেদাঙ্গ জগন্নাথের মধ্যে লীন হইয়া গেলেন।

কাজেই বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরদাসকে আমরা ষোড়শ শতকের শেষ দিকের লোক বলিয়া ধরিব। পুথিখানির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণও সমস্যার বিষয়। বইখানি অলৌকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। চৈতন্যের বাল্যলীলা সম্বন্ধে ঈশ্বরদাসের জ্ঞান খুবই কম ছিল। জগন্নাথ বা পুরন্দর মিশ্রের দুই ভাই—নীলকণ্ঠ ও আদিকন্দ। প্রেমবিলাসের চব্বিশ বিলাসে বর্ণিত জগন্নাথ মিশ্রের ভাইদের নামের সহিত এ দুই নাম মেলে না। জগন্নাথের ভগিনীর নাম চন্দ্রকান্তি। স্বয়ং বসুদেব ও দেবকী কলিযুগে জগন্নাথ ও শচীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (৩য় অধ্যায়)। কারণ, দ্বাপর যুগে দেবকী তাঁহার পুত্রকে পরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। শচীরূপে জন্মিয়া তিনি মাতৃহৃদয়ের সেই ক্ষুধা মিটাইলেন। ঈশ্বরদাসের ভাগবতে বিস্তর অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও বইখানির একটী বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই ভাগবতে অবসানোন্মুখ বৌদ্ধ চিন্তাধারার সহিত উৎকলীয় সংমিশ্রিত বৈষ্ণব মতবাদের সমন্বয় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে কিছু তথ্য উড়িয়া সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে চৈতন্যসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় মধ্বাচার্য্যের নাম পাই। গৌড়ীয় গুরুপরম্পরার সহিত উডুপীর মূল উত্তরাঢ়া মঠে রক্ষিত তালিকার মধ্বাচার্য্য হইতে পাঁচ পুরুষ অধস্তন শিষ্যপরম্পরায় জয়তীর্থ পর্য্যন্ত মিল আছে[৩]। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য গোপালগুরু গোস্বামী প্রথম গুরুপরম্পরা বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেব কিন্তু প্রকৃতই মাধ্ব-সম্প্রদায়ী কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে[৪]। এই সন্দেহ দূর হয়, অচ্যুতানন্দ-রচিত "ব্রহ্মবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞান" পুথিখানি পাঠ করিলে। এই অপ্রকাশিত পুথি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শেষের দিকে এক স্থানে অতি সংক্ষেপে ও অন্যত্র কিছু বিস্তৃতভাবে তিনি গুরুপরম্পরা বর্ণনা করিয়াছেন। অচ্যুতানন্দের তালিকা অনুসারে প্রথমে নিরাকার; তার পর যথাক্রমে মহানারায়ণ, নারায়ণ, ভগবান্‌, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, নারদ, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নরহরি, মাধবেন্দ্র পুরী, কৃষ্ণ (কেশব) ভারতী, চৈতন্যদেব, সারঙ্গ ঘোষ, শ্যাম ঘোষ। এই সারঙ্গ ঘোষের নাম শূন্যসংহিতা ও গুরুভক্তিগীতাতে উল্লিখিত দেখা যায়। গুরুভক্তিগীতার প্রথম খণ্ডে চৈতন্যদেবকে "নিম্বাদিত্য"সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হইয়াছে। নিম্বাদিত্য (নিমানন্দ নামে উল্লিখিত) হইতে হরিব্যাসদেবাচার্য্য পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরার অনেকগুলি নাম এই তালিকায় পাই। হরিব্যাসদেবাচার্য্যের পর এই কয়েকটী নাম জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,—নরহরি, বাসুদেব, চৈতন্য, মাধবেন্দ্র, ঈশ্বরপুরী, চৈতন্যদেব, সারঙ্গ গোসাঁই, শ্যাম ঘোষ। ঈশ্বর দাসও তাঁহার ভাগবতে (৬৫ অধ্যায়ে) গুরুপরম্পরার কয়েকটী নাম দিয়াছেন। যথা,—নারদের শিষ্য মাধবেন্দ্র, তাঁহার শিষ্য বাসবভারতী, তাঁহার শিষ্য পুরুষোত্তম। তার পর একেবারে শ্রীমন্ত আচার্য্য (সন্ন্যাসদীক্ষার পর কেশব ভারতী নামে পরিচিত)।

চৈতন্যদেবের বুদ্ধাবতারত্ব সম্বন্ধে উড়িয়া সাহিত্যে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, এইবার তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য উৎকলে আসিয়া জগন্নাথের ও পরে বুদ্ধের অবতাররূপে বর্ণিত হইলেন। উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্য অনুসারে পঞ্চ-সখা দ্বাপর

৩। 'গৌড়ীয়,' ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। ৪। ডাঃ শ্রীসুশীল দে মহাশয়ের প্রবন্ধ—হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা।

যুগে শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলেন। শূন্যসংহিতার দশম অধ্যায়ে পাই, শ্রীকৃষ্ণ—

"বোইলে সুদাম শুণ আম্ভর যে বাণী।
চিন্তারে নিমগ্ন হেলু তুম্ভ পাইঁ পুণি॥
তুম্ভ আম্ভ সঙ্গ যাবু অন্তর নোহিব।
কলিযুগে বউদ্ধ রূপে রূপকু হেজিব॥
তুম্ভে পঞ্চ সখা থিব আম্ভর সঙ্গরে।
তহিঁ তুম্ভ আম্ভ ভেট কলপবটরে॥
প্রতাপরুদ্র নৃপতি রাজন হোইবে।
পঞ্চসখা প্রচ্ছিন্ন পরচে স্থান দেবে॥
... ...
প্রভুঙ্কর আজ্ঞা হেলা যাঅ হে সুদাম।
তুম্ভ আম্ভ ভেট পাই কলিযুগে পুণ॥

বউদ্ধরূপরে আম্ভে হোইবুঁ প্রকাশ।
সিন্দুরানন্দ তুম্ভর হোইবটি শিষ্য॥
আস্তকলা যেনি জন্মি নদীয়া দ্বীপরে।
চৈতন্যরূপে প্রকাশ হইবুঁ যে ধরে॥
জগত প্রকটি আম্ভে পতিত উদ্ধারি।
হরিনাম দীক্ষা দেবুঁ ঘরে-ঘরে ফেরি॥
সে বেলরে তুম্ভে আম্ভ সঙ্গতরে থিব।
অচ্যুত নামকু কহি গোকুল তারিব॥
পুণ আম্ভ নিজকলা বউদ্ধ রূপরে।
নির্ণয় চৈতন্যরূপ চতুর্দ্ধা মূর্ত্তিরে"॥

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সুদামকে বলিতেছেন,—

"বোইলে অচ্যুত তুম্ভে শুণ আম্ভ বাণী
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য
আম্ভে এহা জাণু হো অচ্যুতানন্দ বাই
তুম্ভে মোর পঞ্চ আত্মা অট পঞ্চজণ
নিরাকার মন্ত্রে থবু দুর্গতি হরিব

কলিযুগে বৌদ্ধরূপে প্রকাশিবু পুণি।
এণু যে সকল মুনিজনে দেলে শাপ।
এণু করি প্রকাশিবুঁ এক কলা নেই।
অবতার শ্রেণী যেতে তুম্ভ পাইঁ শুণ।
আপণে তরিণ পুণি পরে তরাইব॥"

... ...

এই অধ্যায়ের অন্যত্র স্পষ্ট বলা হইয়াছে,—

এণু আজ্ঞা দেলে আদি, অনাদি হে শুণ
আজ্ঞা পাই অনাদি হোইলে অবতীর্ণ
শ্রীচৈতন্য প্রভু নাম অধম উদ্ধার
হরে রাম মহামন্ত্র প্রকট করিলে

পৃথিবী পাতকরাশি কর যা খণ্ডন।
এক অংশ কলা মেনি হোইলে জনম।
প্রকট করিলে নাম কলিযুগে সার।
মূঢ় জ্ঞানী অজ্ঞানী সমস্তে নিস্তরিলে।"

ঈশ্বরদাসের ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলিতেছেন,—

"অচেত হেউ থিবে প্রাণী।
পণ্ডিত পণে বোধ কহি।

তেণু চৈতন্য নাম ভণি॥
বউধাবতার নাম বহি"॥

৪৬শ অধ্যায়ে "ভগবান্" অচ্যুতকে বলিতেছেন,—

"বোলন্তি প্রভু ভগবান।
তাঙ্ক চরণে সেবা কর।
* *
সে নাম প্রকাশ তু কর।

বউধা রূপ মো চৈতন্য॥
ভক্তির পথকু আবোর॥
* *
সুদাম সখা অঙ্গ মোর"॥

৫৩ অধ্যায়ে "নিরাকার"রূপী বিষ্ণু বিনোদমিশ্র বিপ্রকে বলিতেছেন,—

"পুণি কহন্তি কম্বুপাণি,
কলিরে মোর অবতার,
সে রূপ দর্শন করিবু,

আগত ভবিষ্য কাহাণী॥
চইতন্য অঙ্গ নিরাকার॥
মো রূপ প্রত্যক্ষে দেখিবু॥"

(এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীচৈতন্যকে "বোধাবতার" বলা হইয়াছে। গুরুভক্তি-গীতার তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পটলে পাই, অচ্যুতানন্দ চৈতন্যরূপ ধ্যান করিয়া বউদ্ধপন্থা গ্রহণ করিলেন। উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তী মহাশয়ের মতে, এই গীতা অষ্টাদশ শতকের রচনা ["প্রাচী" সংস্করণের ভূমিকা]। বৈষ্ণব হইয়াও অচ্যুতানন্দ ও ঈশ্বরদাস প্রভৃতি চৈতন্যদেবকে বুদ্ধ বলিয়াছেন। কেন তাঁহাদের ধর্ম্ম-সংস্কারে এ কথা বলিতে বাধে নাই, তাহা বিচার করিতে হইবে।

কালক্রমে উড়িষ্যা হইতে ক্রমে বুদ্ধকল্পনা লোপ পাইল। ফলে বুদ্ধের নামও অবহেলার ফলে বিকৃত আকারে দেখা দিল।) একটা উদাহরণ দিই। শূন্যসংহিতার একটী সুপরিচিত মুদ্রিত সংস্করণে "বুদ্ধমাতা" আগাগোড়া "বৃদ্ধমাতা"রূপে ছাপা হইয়াছে! শূন্যসংহিতার কয়েকখানি পুথিতেও বুদ্ধের পরিবর্ত্তে "বৃদ্ধ" (উড়িয়া উচ্চারণ "ব্রুদ্ধ") বসান হইয়াছে দেখিলাম। তবে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বুদ্ধাবতার কল্পনা, উপস্থিত মাত্র কয়েকখানি গ্রন্থে দেখিতে পাই বলিয়া, এ কল্পনার গুরুত্ব নাই, এ কথা বলা চলে না।

এইবার শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে উড়িয়া গ্রন্থে প্রাপ্ত বৃত্তান্তের আলোচনা করিব। বুদ্ধাবতার কল্পনার সহিত তিরোভাব-কাহিনীর সংস্রব আছে। শূন্যসংহিতা, জগন্নাথ-চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত (শুনিলাম, সদানন্দ কবিসূর্য্যব্রহ্ম-রচিত ব্রহ্মাণ্ডমঙ্গলেও) গ্রন্থে তিরোভাব বর্ণিত হইয়াছে। উড়িয়া গ্রন্থকারগণের মতে, মহাপ্রভু জগন্নাথের মধ্যে লীন হইলেন। শূন্যসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—

"এমন্তে কেতেহে দিন বহি গলা শুণিমা অপুর্ব রস। মহাপ্রতাপ দেব রাজা যেণিন পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে।
প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারাএটর পাশ॥ হরি-ধ্বনিরে দেউল উছুলই শ্রীমুখ দর্শন রঙ্গে॥
এমন্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি। চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
দেউলে পশিলে সথাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি॥ জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুপ্রায় মিশি গলে॥

দিবাকর দাসের জগন্নাথচরিতামৃতের সপ্তম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—

এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন॥
গোপন হইলে স্বদেহে দেখি কাহার দৃষ্টি নোহে॥
ন দেখি শ্রীচৈতন্যরূপ সর্ব্ব মনরে দুখ তাপ॥
রাজা হোইলে মনে ছন্ন হে প্রভু হেল অন্তর্দ্ধান॥
পূর্ব্বে যহিরু আসিথিলে লেউটি তহিঁ প্রবেশিলে॥
অভক্তে ভক্তি সাধিবাকু ভক্তি দেখাইলে ভক্তকু॥
সংসারে ভক্তিগুণ থোই নিজ ধামকু বিজে হোই॥

ঈশ্বরদাসের ভাগবতে 'বোধাবতারে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্বর্গারোহণে সর্ব্ব-শুচিনাম পঞ্চষষ্টি অধ্যায়ে' তিরোভাব বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভাগবত রচনার পর যখন নীলাচলে আসিলেন, তখনও জগন্নাথমন্দিরে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। ঈশ্বরদাস তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লইয়া মুক্তিমণ্ডপে গিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ সাক্ষাৎ সরস্বতীতুল্য পণ্ডিত বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসিপ্রবরকে গ্রন্থখানি পড়িয়া শুনাইলেন।

সন্ন্যাসী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, চৈতন্যদেব জগন্নাথের অঙ্গে লীন হইয়া গিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণ অবতার হোই	অচিন্ত্যো শয়ন গোসাইঁ॥
তদন্তে ত্রৈলোক্য ঠাকুর	ধইলে চৈতন্যশরীর॥
কালেক সন্ন্যাসে বিহরি	প্রবেশ যাইঁ নীলগিরি॥
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন	দেখন্তি সর্ব্ববিষ্ণুজন॥
যে শাস্ত্র মুক্তি মণ্ডপেণ	শুণন্তি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ॥
যেমন্ত সময়রে মুঁহি	শ্রীপুরুষোত্তম গলই॥
বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসী	আপে সরস্বতী প্রকাশি॥
তাঙ্ক ছামুরে পুন গ্রন্থ	প্রকাশ কলে বৈষ্ণবস্তু॥
অনেক বিপ্র তপী জন	শুনন্তি মুক্তি মণ্ডপেণ॥
সমস্তে আনন্দে শুনন্তি	গ্রন্থকর্ত্তাঙ্কু প্রশংসন্তি॥
* *	* *
শুনন্তি আনন্দিত হোই	কাহারি অহংগুণ নাহিঁ॥
প্রভু অঙ্গে চৈতন্য মিশি	তীর্থঙ্ক মনকু ন আসি॥
বৈষ্ণবে প্রমাণ করন্তি	সন্ন্যাসী কেভে ন মানন্তি॥
সন্ন্যাসী মতে দেলে চাহি	মনরে হসহস হোই॥
তীর্থে যে কহন্তি মধুর	বোলন্তি "শুনহে ঈশ্বর॥
পূর্ব্বে যে শাস্ত্র শুনন নাহি	যেবে যে শাস্ত্র শুনিলই।
ভক্তিযোগর যেহুঁ কথা	চৈতন্য মঙ্গল বারতা॥
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন	কাহুঁ লেখিল যে বচন?
যেণা সঙ্কপি মতে কহ	অন্যকু যে কথা সন্দেহ"॥

বিদেহ দেশের রাজাও অগস্ত্য মুনির নিকট জগন্নাথে লীন হওয়ার সংবাদ শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন,—

চৈতন্য অঙ্গ কেঙ্কে যাই	মতে যে সন্দেহ লাগই॥
যেহা সঙ্কপি মতে কহ	মন্থু ছড়াও মায়া মোহ॥

এই অধ্যায়েই তিরোভাবের পূর্ণ সংবাদও পাই,—

"এমন্তে গলা কিছি দিন	পুনি যাত্রা হোএ চন্দন॥
বৈশাখ তৃতীয়া দিবস	চৈতন্য হোইলে স্ববেশ॥
কীর্ত্তন মধ্যে বনমালী	বড় দাণ্ডরে যাইঁ মিলি॥
অঙ্গতে ছন্তি নৃপরাণ	অনেক অছন্তি ব্রাহ্মণ॥
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সঙ্গতে	সহিতে অছন্তি সমস্তে॥
* *	* *
তহুঁ বিজয়ে বনমালি	সিংহাসনর তলে মিলি॥
দর্শন নীলাদ্রি লোচন	সিংহাসনরে, শ্রীচৈতন্য॥
শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন্তি	দর্শন প্রভু জগজ্জ্যোতি॥

নৃপতি অছন্তি ছামুর	দর্শন কৃষ্ণ কমুধর ॥
চৈতন্ত আপে জগজ্জ্যোতি	পতিতপাবন শ্রীপতি ॥
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন	প্রত্যক্ষে দর্শন রাজন ॥
ক্রোধ কে তার কহি পারি	অজ্ঞানে সর্ব্ব দেহ যারি ॥
সচেত হোই সর্ব্ব জনে	নিত্যানন্দঙ্ক প্রবোধনে ॥
সমস্তে যেনি নৃপ সাইঁ	চন্দনযাত্রা যে করই ॥
কহিলে নিত্যানন্দ দাস	বৈকুণ্ঠে বীজে পীতবাস ॥

উদ্ধৃত বর্ণনাটুকুতে লক্ষ্য করা উচিত,—

(১। মহাপ্রভু বৈশাখী তৃতীয়া দিবসে অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে জগন্নাথের অঙ্গে লীন হইয়া যান।

২। রাজা প্রতাপরুদ্র তিরোভাবঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন।

৩। রাজা শোকাকুল ভক্তদের লইয়া চন্দনযাত্রা উৎসব শেষ করিলেন।)

অগস্ত্য মুনি বিদেহ-রাজকে কিরূপ বুঝাইয়া রাজার মন হইতে মায়ামোহ ছাড়াইলেন, চৈতন্ত-ভাগবতে সে সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণ অরূপ ও অরেখ হইলেও মায়ার ফলে শরীর ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য নাম ধারণ করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন ও লীলাবসানে গঙ্গাগর্ভে তাঁহার শ্রীদেহ লীন হইয়া গেল[৫]। জগন্নাথের আজ্ঞায় ক্ষেত্রপাল চৈতন্তের শ্রীদেহ অন্তরীক্ষ দিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। এখানে গঙ্গা অর্থে সুপরিচিত নদীটী বুঝাইতেছে না। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে দেখি (১২শ অধ্যায়),—রাজা রত্নগ্রীব পুরুষোত্তম দর্শনে আসিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান প্রাপ্ত হইয়া (ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্) এক তাপস ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সেই পুণ্যস্থান নীলপর্ব্বতের অন্তর্গত। মাদলা পাঞ্জীতে

৫। "শূন্ত অশূন্ত মহাশূন্ত। নাম অনাম যহিঁ লীন॥
মহাশূন্তরে ব্রহ্ম রূপ। মায়াকু দিশন্তি স্বরূপ॥
মায়ারে রাম অবতার। মায়ারে শ্রীকৃষ্ণশরীর॥
মায়ারে চৈতন্ত গোসাইঁ। গৌরাঙ্গ রূপ শূন্তে বহি॥

* * * *

বৃক্ষ ছায়ি ঠারে যেমন্ত। নির্ণয় যেক্তে সূর্য্য অস্ত॥
সেহি স্বরূপে শ্রীচৈতন্ত। লীন যে নীলাদ্রিমোহন॥
শ্রীজগন্নাথকলেবর। একাত্মা একাঙ্গ শরীর॥
সমস্তে এমন্ত দেখন্তি। মায়াশরীর ন জাণন্তি॥
চৈতন্তপিণ্ড, সিংহাসন (রু)। দেখন্তি ত্রৈলোক্যমোহন॥
ক্ষেত্রপালকু আজ্ঞা দেই। এ পিণ্ড নিঅ বেগ করি॥
অন্তরীক্ষে নেই গঙ্গাজল (-রে)। মেলিন দিঅ ক্ষেত্রপাল॥
অন্তরীক্ষে নেলে শব বহি। শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই॥
গঙ্গারে মেলি দেলে শব। সে শব হোইলাক জীব (?)।
চৈতন্তরূপে প্রকাশিলে। গঙ্গারে লীন হোই গলে॥

কালাপাহাড় দ্বারা জগন্নাথমূর্ত্তির নিগ্রহ প্রসঙ্গে গঙ্গার অনবরত উল্লেখ দেখা যায়। তাই গঙ্গা অর্থে সমুদ্র সূচিত হইয়াছে মনে হয়।

(দেখা যাইতেছে, উড়িয়া লেখকেরা তিরোভাবের স্থান সম্বন্ধে একমত। সময় লইয়াই যত গোলযোগ। দিবাকরদাস সময় নির্দ্দেশ করেন নাই। অচ্যুতানন্দও স্পষ্ট ভাবে কিছু বলেন নাই। তবে ঈশ্বরদাসের বর্ণনার সহিত তাঁহার বর্ণনার কিছু মিল খুঁজিয়া পাই। অচ্যুতানন্দের বর্ণনা অনুসারেও রাজা উৎসব করিতেছেন।) তিরোভাব-প্রসঙ্গের পর অধ্যায়ের শেষে এই দুই পঙ্‌ক্তি পাই,—

"মাধব শুক্ল পূর্ণমী দিনঠারু মহোৎসব রাজা কলে।
মাসক সম্পূর্ণ মহোৎসব সারি পুণি যেঝাক্রমে গলে"॥

মাধবপূর্ণিমা অর্থে বৈশাখী পূর্ণিমা বুঝায়।

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি জাগগান*

বাঙ্গালা দেশের জাগগান প্রসিদ্ধ। জাগগান সম্ভবতঃ উত্তর-বঙ্গের সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ রাজসাহী, পাবনা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলায় এককালে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ফরিদপুর জেলায়ও ইহা প্রচলিত আছে, বিশেষ করিয়া পদ্মার তীরবর্ত্তী জনপদসমূহে। ঢাকা জেলায় কামদেবের গান প্রচলিত আছে। ঢাকার কামদেবের গান ঢাকার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন[১]। এই গানগুলির সঙ্গে রঙ্গপুরের জাগগানের ভাবের কিছু কিছু মিল আছে। বস্তুতঃ জাগগানের অনুরূপ গান বাঙ্গালাদেশের কোন কোন জেলায় প্রচলিত আছে। রঙ্গপুরের কিছু কিছু জাগগান সংগৃহীত, আলোচিত এবং রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে[২]। পাবনা জেলার কয়েকটি জাগগান আমি 'ভারতী' ও 'বঙ্গবাণী'তে[৩] প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে ঐ জাগগানগুলি মৎসঙ্কলিত ও প্রকাশিত "হারামণি" নামক গ্রাম্য গানের বহিতে একত্রিত করিয়া ছাপাইয়াছি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাজসাহী ও পাবনা জেলা হইতে সংগৃহীত এইরূপ কয়েকটি গান প্রকাশিত হইল। কতকগুলি জাগগান ডক্টর রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় পালাগান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন[৪]। প্রত্যুত এগুলি পালাগান নয়। তিনিও সে কথা কতকটা তাঁহার মন্তব্যের শেষ ভাগে স্বীকার করিয়াছেন[৫]। তাঁহার গানের সঙ্গে বর্ত্তমান সংগ্রহের কয়েকটি ছত্রের মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু তাঁহার সংগ্রহের কয়েকটি ছত্রের সহিত 'হারামণি'তে প্রকাশিত ফরিদপুর জেলার মেয়েলি গানের কয়েকটি ছত্রের মিল দেখা যাইবে। ১৩৩১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন "মারাঠী ও বাঙ্গালী" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে যে পল্লীগান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত জাগগানের তুলনা চলে। ১৩৪০ সালের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় মেয়েদের গান ও নাচ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্ধৃত গানের কতকগুলি পঙ্‌ক্তির সহিত এই জাগগানের কতকগুলি ছত্রের মিল দেখা যায়। এই জাগগান সাধারণতঃ পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। একজন প্রথমে জাগ বলে, পরে সকলে সমস্বরে গান করে। সাধারণতঃ রাত্রিতে গান গাওয়া হয়।

জাগগান আদিতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ছিল, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের বাল্যলীলা ইহার বর্ণনীয় ছিল। পরে বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া ইহাতে নূতন বস্তু গৃহীত হয়—যেমন চৈতন্যলীলা এবং সর্ব্বশেষে সত্যপীরলীলা। গ্রাম্য গানে এ রকম অহরহঃ ঘটিতেছে।

---

* ১৩৪৩।২৫এ পৌষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ঢাকার ইতিহাস, পৃঃ ৩৯২-৯৪।

২। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৫, ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

৩। ভারতী, ১৩৩১, পৃঃ ২৭২-৭৬। বঙ্গবাণী, ১৩৩১, মাঘ, পৃঃ ৭৩৬-৭৩৭।

৪। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৭-৭৯।

৫। ঐ, পৃঃ ৫৬৫-৬৬।

রেল, ষ্টীমার, এমন কি, গান্ধীকে লইয়া বহু গ্রাম্য গান পাওয়া যায়। মালদহের গম্ভীরায় ও মুর্শিদাবাদের আল্‌কাফ্ গানেও এরূপ ব্যাপারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত জাগগানে সোনাপীরের উল্লেখ আছে। পাবনা জেলার চাট্‌মহর সহরে তাঁহার বাড়ী ছিল, বলা হইয়াছে। পাবনা জেলার চাট্‌মহর এককালে মুসলমান-প্রাধান্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহু মসজিদ, পুষ্করিণী ইত্যাদি চাট্‌মহরে রহিয়াছে। পাবনা জেলার ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সাহা ইহার বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথাও সোনাপীরের কথা উল্লেখ করেন নাই। এই গানগুলিতে উল্লিখিত সোনাপীর, ফকরুল্লাপীর, মাণিকপীর ও জিন্দাপীর কে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। জিন্দাপীর কি মকানপুরের জিন্দাপীর শা মাদার? অন্য একটি গ্রাম্য গানে পাওয়া যায়,—
"যাও জিন্দাপীরের সন্ধানে, আব্ হায়াতের মর্ম্ম যে জানে"।

নিম্নলিখিত গান কয়টি রাজসাহী জেলার অধীন সিংড়া থানার অন্তর্গত সিংড়া গ্রাম হইতে মুন্সী ইছহাব মিয়ার সাহায্যে ১৯২৬ সনে সংগৃহীত।

পীর সাহ মীরের ঘরে পীরের জনম ॥
একত মাসের কালে জানে বা জানে
দুইত মাসের কালে লোকের কানে কানে ॥
তিনত মাসের কালে রক্তের দোলা।
চারত মাসের কালে হাড়ে হাড়ে জোড়া ॥
পাঁচত মাসের কালে পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয়ত মাসের কালে এটু পলটে ॥
সাতত মাসের কালে সাতে শরীর নয়।
অষ্টম মাসের কালে মনপ্রাণ চিয়ায় ॥
নবম মাসের কালে নব ঘনাকৃতি।
দশম মাসের কালে পিণ্ডের অনুভূতি ॥
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হয়ে আইল।
উদরে থাকিয়া পীর ভাবিতে লাগিল ॥
উদরে থাকিয়া পীর করে কোন কাম।
বিষের নাড়ী ধরিয়া মায়ের মারে বিষম টান ॥
বিষের নাড়ী ধরে মার বজ্রটান দিল।
মলাম মলাম বলে মা জমিনে পড়িল।
দাই দুলানী এসে তখন ঘেরাও করিল ॥
হাবা থুবা দিয়া মাকে জামেতে বগলে।
চালের বন্ধা কেটে দাই ঘরে প্রবেশ হইল ॥
উদরে থাকিয়া পীর করে কোন কাম।
ভূমিষ্ঠ হইয়া নিল আল্লাহজীর নাম ॥
যখন মাণিক পীর ভূমিতে পড়িল।
অঞ্চলের পঞ্চ মাণিক দাইকে দিল ॥

চাটমহর সহর নিয়া সোনা পীরের বাড়ী।
নব্বই হাজার ঘর যাহার দক্ষিণদুয়ারী ॥
আল রে আল রে পীর আল আরবার।
চাঁদুয়া টাঙ্গাইয়া পীর হইল দরিয়া পার ॥
দরিয়া পার হয়ে পীর চায় চতুর্দ্দিক্।
স্বর্গ হতে সোনার পালঙ্ক পল আচম্বিত ॥
তারি উপর দোন ভাই করিল আলিন।
খাট পালঙ্গ পেয়ে পীর ঘোরে দিল না।
ইন্দ্রপুরের দুই কন্যা যাঁতে হাত পা ॥
আতোর খুতোর লালসাম তাহাব আছা।
তার গর্ভে জন্ম নিল মাণিকপীর রাজা ॥
সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
ক্ষুধায় আকুল তনু জুয়াল মরে যাই ॥
জোয়ালগরে যেয়ে পীর ছাড়িল জিকির।
ডিঙ্গা লয়ে কালুর মা হইল বাহির ॥
ভিক্ষুক ফকির নহি মা গো ভিক্ষা লয়ে যাব।
সওয়া সের দুগ্ধ দিলে দোওয়া করে যাব ॥

কোথা পাব গাই গাড়ী বাতাসে নিয়াছে।
কোথা পাব দুগ্ধ কলা তোমায় দিব খেতে॥
সুমতি ছিল গোয়ালিনীর কুমতি লাগিল।
ঝিকার উপর দুগ্ধ থুয়ে পীরেরে ভাঁড়াল॥
সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
এসেছি জোয়াল ঘরে জাহির রেখে খাই॥
আগাড়ি পাছ করে বাতাসে দিল বাড়ী।
নব লক্ষ ধেনু মল বিশ লক্ষ বাছুরী॥
বাতাসে পড়িয়া মল বাতাসে ভাযুর।
দরবারে পড়ে মল দরবারে শ্বশুর॥
কান্দে রে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে দাও।
গোধেনুর বদলে কিনা মরিল মাও॥
কান্দে রে গোয়ালের নারী হস্তে করে কাচি।
গোধেনুর বদলে না মরিল চাচী॥
কান্দে রে গোয়ালের নারী হাতে করে ঝারি।
গোধেনুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি॥
সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
মেরেছি গরীবের ধন জিলাইয়া যাই॥
আগাড়ি পাছ করি বাতাসে দিল বাড়ী।
নব লক্ষ ধেনু তারা পাড়ে দোড়াদোড়ী॥
বাতাসেতে চেতন পেল পাতালে ভাযুর।
দরবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর॥
আগে যদি জানতেম তুমি সোনা পীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর॥
জিন্দা চার যুগের সার।
মারিয়া জিলাতে পার,অপার মহিমা তোমার।

ওখান হতে পীর বিদায় হ'ল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
আয় পীর চাল্যাজীর বাজারে।
শোন রে চাল্যাজী ভাই
সোওয়া সের চাউল দেও খাই
দোওয়া করিব আল্লাহজীর ফকির॥
শোন রে ফকির মোরে
তৈয়ার চাল নাইক ঘরে
ভাড়ালি আল্লাজীর ফকিরে।
পীরের মনে ছিল হক্কা
চালেতে মারিল তুক্কা
সব চাল শূন্তেতে উড়াল॥
সুমতি ছিল চাল্যাজীর কুমতি লাগিল।
তৈয়ার চাল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল॥
কান্দে রে চাল্যাজীর নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরেরই পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে
ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই॥

ওখান হতে পীর বিদায় নিল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় গুড়িয়ার বাজারে।
শুন রে গুড়িয়া ভাই
সোওয়া সের দুধ দেও খাই
দোয়া করিব আল্লাজীর ফকির॥
সুমতি ছিল গুড়িয়ার কুমতি লাগিল
তৈয়ার গুড় থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হক্কা
গুড়েতে মারিল তুক্কা
সব গুড় শূন্তেতে উড়িল॥
কান্দে রে গুড়িয়া নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া দূরে
ডাক দিয়া বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই॥
ওখান হতে বিদায় নিল
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় কুমারে বাজারে।

শুন রে কুমার ভাই
একটী পাতিল দাও খাই
দোওয়া করিব আল্লাজীর ফকির ॥
সুমতি ছিল কুমারের কুমতি ধরিল
তৈয়ার পাতিল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা
পাতিলে মারিল তুক্কা
সব পাতিল শূন্তেতে উড়িল ॥
কান্দে রে কুমারের নারী
কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে
ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই ॥
সা জিন্দা ফকরুল্লা ও জিন্দা পীর,
মারিয়া জিলাতে পারে অপার মহিমা তোমার।
শুনতে খেরুয়া ভাই অন্ত বাড়ী যায়
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই ॥

দক্ষিণদুয়ারী ঘর ঘন বাঁশের রুয়া।
বাহির করে দেও পিড়ি,পান বাটা ভরি গুয়া॥
বাটা ভরি কাটা গুয়া পাচ পীরের খায়।
পাঁচ পীরে যুক্তি করে অরণ্যেতে যায়।
অরণ্যের বাঘ ভাল্লুক দেখিয়া পলায় ॥
পলাস না পলাস না রে তোরা।
দরজা ঘুরিয়া দাও নিদান খেলি মোরা॥
নিদান খেলিতে খেলিতে পীরের ;
জেগে জেগে দেও তোমরা সোনা পীরের বিয়া।
প্রথমে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়া।
আনিল করবী ফুল সাজি ভরিয়া ॥
সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া।
তার পরে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়া ॥
আনিল কেয়া ফুল সাজি ভরিয়া।
সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া ॥
চার তরফ চার কলার গাছ লইল গাড়িয়া।
পাঁচ বাড়ীর পাঁচ আইয়ো আনিল ডাকিয়া।
জেগে জুগে দাও তোমরা সোনা পীরের বিয়া ॥

ধুয়া।

জিন্দা সৈয়দ বাঁকা মিঞা মাণিক পীর।
মারিয়া জিলাতে পার আজব মহিমা তোমার ॥

নিম্নলিখিত কয়েকটি গান পাবনা জেলার অন্তর্গত সুজানগর থানার অধীন মুরারিপুর গ্রামের সেখ আবদুল জব্বারের নিকট হইতে ১৯২৪ সালে সংগৃহীত হইয়াছে।

পোয়ালে জাগ সোনার হারের জাগ ॥
গিরি ভাই গিরি ভাই ছওর ছওর।
সোনার পীরের চেলা আ'ল বছর অন্তর ॥
সোনার হারের চেলা দেখে যে করিবে হেলা।
দুই পায় দুই গোঁদ বাড়াবি চক্ষে বাড়াবি ঢেলা॥
ঢেলা নয় রে ঢুল্যা নয় রে গায় আইছে জ্বর।
এমন ত দেখি নাই রে সোনার হারের বর ॥
সোনার হার ভক্ত ঠাকুর মুখে চাপদাড়ী।
হেলিয়া দুলিয়া গেলেন গোয়ালনীর বাড়ী ॥
গোয়ালনী গোয়ালনী বইসে কর কি।
তোমার পুত্র মার খাত্যাছে এই সভার মধ্যি ॥
সুবুদ্ধি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল।
সিকার উপর দুগ্ধ থুয়ে পীরকে ভাঁড়াল ॥
ঘরে গুয়ালনীরে বাথানে মরে গাই।
সাত শ এক ধেনু মরে লেখা জোখা নাই ॥

আগে যদি জানতেম রে তুমি সত্যপীর।
আগে দিতাম দই দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর॥
হই চই করে পীর বাথানে দিল বাড়ি।
বাথানেতে পড়্যা রইছে চোদ্দ বোঝা দড়ি॥
হই চই করিয়া পীর বাথানে দিল ভুষ্যা।
সাত দিনকার মরা ধেনু দন্তে কাটে কুটা॥
হই চই করিয়া পীর বাথানে দিল বাড়ি।
সাত দিনকার মরা ধেনু পারে নড়ানড়ি॥
চলো চলো রাখাল ভাই রে আর এক বাড়ী গাই।
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই॥

নিম্নলিখিত গানটি পাবনা জেলার অধীন সুজানগর থানার অন্তর্গত মুরারিপুর গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

নিমাই জাগ

নিমাই দুখিনীর ধন,

দুঃখ পাসরার বেটা রে নিমাই ওরে নীলরতন॥ধু
এক মাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজল।
দুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল॥
তিন মাসের কালে নিমাই লোহু রক্তের গোলা।
চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া॥
পঞ্চ মাসের কালে নিমাই পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয় মাসের কালে নিমাই মাথার চুল উঠে॥
সাত মাসের কালে নিমাই সাত সুরে গায়।
অষ্ট মাসের কালে নিমাই শুয়্যা নিদ্রা যায়॥
নয় মাসের কালে নিমাই নব ডঙ্কা মারিল।
দশ মাসের কালে নিমাই ভুমিস্থ পড়িল॥
দশ মাস দশ দিন নিমাইর পূর্ণতা হইল।
নিমাইচাঁদ ভুমিস্থ পড়ে মা বোল বলিল॥
এক মাস যায় মায়ের খুতি আর মুতি।
আর এক মাস যায় মায়ের মাঘ মাস্যা॥
কোথা হতে এল যোগী কেশব ভারতী।
কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাইরে বান্ধাল সন্ন্যাসী॥
দেখ দেখ 'নঘুব্যা'র লোক দেখ রে চাহিয়া।
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চল্‌লো জননী ছাড়িয়া॥
সন্ন্যাসী না হয় রে নিমাই বৈরাগী না হয়।
ঘরে বসে কৃষ্ণনামটী মাকে শোনায়॥

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

সাহিত্য-বার্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্ম সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য। ২নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন হইতে শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গোবিন্দকর্ম্মকারের নামে প্রচলিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক গ্রন্থের অসারতা, অর্বাচীনতা ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন।

বাংলা বানানের নিয়ম। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনুমোদনপত্র ও সংশোধন-পরিবর্ত্তনাদি সংবলিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়।

বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ রচিত ছন্দোবিষয়ক লেখসমূহের সঙ্কলন।

কলিকাতা-কমলালয়—৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ও ভবানীচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সমন্বিত। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—১। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার রীতিনীতি বর্ণন এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়-রচিত। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—২। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত রাজীবলোচনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ ১৮০৫ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।

শ্রীহরেন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত—Studies in Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry (1857-1887). চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিহারীলাল—গত শতাব্দীর এই চারি জন প্রধান বাঙ্গালী কবির কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের আলোচনা।

শ্রীসুকুমার সেন—A History of Brajabuli Literature. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাংলার বৈষ্ণব কবি ও পদাবলী সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ।

প্রবন্ধ

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির লিপিকাল। বিচিত্রা, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৬৪-৭৫।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' গ্রন্থের পুথির প্রাচীনতা সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত খণ্ডনপূর্ব্বক ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধই ইহার লেখনকাল বলিয়া প্রতিপাদন।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব আবিষ্কার। প্রবর্ত্তক, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৬০৩-৪।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্প্রতি প্রকাশিত চণ্ডীদাসের জীবনকাহিনীসমন্বিত তিনখানি গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সংশয় জ্ঞাপন।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—ব্রতের ফল। বিচিত্রা, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ১৯৯-২০৯।

বাংলার মেয়েলি ব্রতকথার মধ্যে বাঙালী স্ত্রীলোকের আশা আকাঙ্ক্ষার যে আভাস পাওয়া যায়, তাহার পরিচয়।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়—'মঙ্গল কাব্যে' খেলা-ধূলা। প্রবর্ত্তক, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৬৩১-৩।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে খেলার যে স্বল্প বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার পরিচয়।

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—'খেলা-ধূলার' বাঙালা পরিভাষা। প্রবর্ত্তক, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৬৪১-২।

ফুটবল খেলা সম্পর্কে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দের বাংলা অনুবাদ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্‌লা ভাষা আর সাহিত্য। প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৩৫৩-৮।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও কতকগুলি সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল—তামিল জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস। বিচিত্রা, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৪৭-৫৩, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮৫, ৩১৯-২৬।

তামিল জাতির উৎপত্তি, আচারব্যবহার, ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—বাগর্থবিজ্ঞান। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ১৬৯-১৮০।

বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দেশ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শব্দতত্ত্বের একটা তর্ক। প্রবাসী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৫২৭।

বাংলার হকারান্ত ধাতুর ভবিষ্যৎকালের পদের বানান সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী—আবদুর রহিম্ খাঁনখানান্ ও হিন্দী-সাহিত্য। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ২৬৪-৭।

রহিমের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন ও তাঁহার রচিত সাহিত্যের পরিচয় প্রদান।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—ভুবনরঞ্জনের 'আনন্দ-বিলাস'। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ২৭৬-৭।

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীকান্ত ভুবনরঞ্জন রচিত স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের প্রথম চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের 'আনন্দবিলাস' নামক বাংলা পদ্যানুবাদ গ্রন্থের ও উহার নবাবিষ্কৃত পুথির পরিচয়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—শব্দরত্নাবলী ও মুসা খাঁ। ভারতবর্ষ, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৫৭২-৩।

চৈত্র মাসে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত লিখিত এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধের কয়েকটী ত্রুটি প্রদর্শন।

খোন্দকার আবদুল হামিদ ও মহম্মদ খুরশীদ—পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথা। মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ' ৪৩, পৃঃ ৬৮০-২।

নৌলাগান, পর্বগান ও সারিগানের পরিচয়।

মোহাম্মদ আশ্‌রাফ হোসেন—আমাদের পল্লী-সাহিত্য। মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৭৫২, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮২৪-২৯।

পালাগান, গান বা রাগ, কবি, হাইর, দিঠান, ছইয়া, পই, শিল্লক, বয়ান, কথার কথা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত পল্লীসাহিত্যের পরিচয়।

মহম্মদ এনামুল হক—মুসলমানী বাঙ্গালা। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮০৯-১৫।

'মুসলমানী বাঙ্গালা' এই শব্দপ্রয়োগের শৈথিল্য ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—ভারতীয় সহিত্যপরিষৎ। প্রবাসী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৬৬০-৩।

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে যে সমস্ত প্রযত্ন করা হইয়াছে, তাহার আভাস ও এতদুদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মপদ্ধতি নিরূপণ।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীযদুনাথ সরকার—মারাঠা জাতীয় বিকাশ (সরল কাহিনী)। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস্‌, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকতা।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪২শ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা ও ৪৩শ খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত চারিটী প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তিকা গঠিত।

খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ—কোচবিহারের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। রাজ-সরকারের আদেশানুসারে প্রকাশিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোচবিহারের বিস্তৃত ইতিহাস।

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া—পিটক গ্রন্থাবলী—১ম সংখ্যা। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কর্ত্তৃক ১৭০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

বৌদ্ধ পিটক গ্রন্থাবলীর ইতিবৃত্ত আলোচনা। ইহা প্রস্তাবিত বিস্তৃত ও বহু খণ্ডে প্রকাশ্য বৌদ্ধকোষের বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ নামক প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ।

প্রবন্ধ

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু—ঋগ্বেদে ইন্দ্র। প্রবাসী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৪৮৪-৪৯৮।

হিন্দুর দেবতাদিগের—বিশেষ করিয়া ইন্দ্রের—মূল স্বরূপ ও তাহাদের সম্বন্ধে ধারণার ক্রমপরিণতির ধারা আলোচনা।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতের উপাদান। প্রবাসী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮৪৫-৮৫২।

১৭৭২ হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রামমোহনের জীবনচরিত সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাদানের পরিচয় ও ঐতিহাসিক মূল্য বিচার।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—রামমোহন রায়ের প্রথম স্মৃতিসভা। প্রবাসী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৯০২-৪।

১৮৩৪ সালের ৫ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক—পাল-সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী। প্রবাসী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮৮১-৯।

পালসাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালীর সাধারণ পরিচয় ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদিগের নাম এবং কর্তব্য কার্যের বিবরণ।

যোগেন্দ্রকিশোর লৌহ—বাঙালার চটকলের ইতিহাস। প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৩৮৯-৯২।

চটকলের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির বৃত্তান্ত।

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—ব্রহ্মদেশে বঙ্গসংস্কৃতি। প্রবাসী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৬৩৯-৪৭; ব্রহ্মদেশে ও আরাকানে বঙ্গসংস্কৃতি, প্রবাসী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮১০-১৭।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত আনন্দ-মন্দির ও তৎপরবর্ত্তী যুগের মন্দির ও মূর্তিশিল্পে এবং আরাকান-রাজসভার সাহিত্যে বাংলাদেশের সহিত ব্রহ্মদেশের যে যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়, তাহার আলোচনা। [এই দুই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার—"বঙ্গসংস্কৃতির সহিত ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ," বিচিত্রা, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৬১০-৬ দ্রষ্টব্য]।

শ্রীমাখনলাল চৌধুরী—মুঘলরাজ্যে গুপ্তচর বিভাগ। বিচিত্রা, আশ্বিন' ৪৩, পৃঃ ৩৫৮-৬০।

মুঘলরাজ্যের গুপ্তচরবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের নাম ও কর্ম্মপদ্ধতির আলোচনা।

শ্রীজনরঞ্জন রায়—রামগড়। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৩৮৪-৯৪।

রামগড় রাজ্যের ইতিবৃত্ত।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা—সুপ্রসিদ্ধ জৈন নরনারী। ভারতবর্ষ, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৫৮৪-৯৫।

পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ, কুমারপাল, বস্তুপাল, তেজপাল, ক্ষেমা, পেথড়কুমার, অমরকুমার, বিমলশাহ, শ্রীপাল, রাণী চেলনা ও চন্দনবালার জীবনবৃত্ত বর্ণনা।

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ—দিব্য-প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৫৯৭-৬০৩।

আষাঢ় মাসে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও ভট্টশালী মহাশয়ের প্রত্যুত্তর।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী—ভারত ও মধ্য এশিয়া। বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ১১-১৭; ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ২৫৪-৬০; আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৪১৮-২৩।

প্রাচীন ভারতের সহিত মধ্যএশিয়া ও প্রান্তবর্ত্তী জনপদসমূহের যোগাযোগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত।

আবুল কাসেম—মোগল সিংহাসন। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮৩৪-৪০।

দেশের বিভিন্ন স্থানে মোগল সম্রাট্গণের যে বিভিন্ন সিংহাসন রক্ষিত ছিল, তাহাদের শিল্পোৎকর্ষের পরিচয়।

ফজলুল করিম—সিন্ধুপ্রদেশের ইতিহাস। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৮৪১-৪৪।

প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত।

শ্রীরমণীকান্ত বসু—আসামে দেওয়ানবংশীয়গণ। মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৬৭৩-৭৯।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসা খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণ আসামে যে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের ইতিবৃত্ত।

দর্শন

গ্রন্থ

শ্রীবংশদীপ মহাস্থবির—প্রজ্ঞাভাবনা। প্রকাশক—প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, নালন্দা বিদ্যাভবন, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট্‌, বউবাজার, কলিকাতা।

বুদ্ধঘোষ-কৃত সুপ্রসিদ্ধ 'বিসুদ্ধিমগ্‌গো' নামক মহাগ্রন্থের 'পঞ্‌ঞানিদ্দেস' নামক তৃতীয় অংশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ও বঙ্গানুবাদ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'। প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

বুদ্ধদেবকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত যুক্তি সাধারণতঃ উপস্থাপিত হয় বা হইতে পারে, পালি বৌদ্ধগ্রন্থ অবলম্বনে সেই সমস্ত যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ। প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিবৃত যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মতবাদের বিচার ও বিশ্লেষণ।

প্রবন্ধ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—ভারতের ধর্ম্মসমস্যা। ভারতবর্ষ, ভাদ্র' ৪৩, পৃঃ ৩৩৭-৩৪৩।

হিন্দু শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র—স্বর্ণমান ও বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৩৫৫-৩৬৪।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু—প্রজ্ঞানের প্রগতি (২)। ভারতবর্ষ, আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৪৯৭-৫০৫।

প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের আলোচনা।

বিজ্ঞান

প্রবন্ধ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—পাঁজির ভুল। বিচিত্রা, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ২২০-৫।

পুরাণাদি গ্রন্থে চতুর্যুগের কালনির্ণয়াত্মক যে সমস্ত শ্লোক রহিয়াছে, মানববর্ষানুসারেই তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া পরিমাণ নির্ণয় কর্তব্য, এই মত প্রতিপাদন।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রহ নক্ষত্রের পরিচয় ও জন্মকথা। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৩৭২-৩৭৯; আশ্বিন '৪৩, পৃঃ ৫৩৮-৫৪৪।

গ্রহাদির উৎপত্তি ও আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মত নিরূপণ।

শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী—ভারতে ফলিত জ্যোতিষ। বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ '৪৩, পৃঃ ৫০-৫৬।

ভারতে ফলিত জ্যোতিষের প্রচলিত অংশে পাশ্চাত্যদেশের প্রভাব প্রদর্শন।

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মিত্র—উদ্ভিদের উপর উদ্ভিদের প্রভাব। প্রবাসী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৭২২-৪।

এক উদ্ভিদ্‌ কর্তৃক পার্শ্ববর্তী অপর উদ্ভিদের উপর সংক্রামিত হিতকর বা অহিতকর প্রভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের অবলম্বিত পরীক্ষাকার্যের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—ধূলি ও ব্যাধি। প্রবাসী, ভাদ্র '৪৩, পৃঃ ৭২৪-২৯।

ধূলির স্বরূপ ও ব্যাধিসৃষ্টি বিষয়ে ইহার প্রভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক চারি শত বৎসর যাবৎ কৃত আলোচনার আভাস।

শ্রীসুধীরকুমার বসু—আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। প্রকৃতি, ১৩।১২৬-৩২।

আধুনিক যুগে পরমাণুর গঠন, যৌগিক পদার্থের গঠনাকৃতি, জড় পদার্থের তরঙ্গবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের আলোচনার আভাস।

কবি শেখ চান্দ

ভূমিকা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান কবির সংখ্যা একেবারে নগণ্য না হইলেও, অতি প্রাচীন মুসলমান কবির সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গীয় মুসলমান কবির সহিত এ যাবৎ আমরা পরিচিত হইতে পারি নাই। বলা বাহুল্য, এই যুগের হিন্দু কবির নামসংখ্যাও বেশী নহে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, কোন বঙ্গীয় মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা করেন নাই। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বঙ্গীয়, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমানগণ যে প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষায় নিতান্তই পশ্চাৎপদ বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে অনুসন্ধান ও অনুসন্ধিৎসার একান্তই অভাব। তাই, এ যাবৎ মুসলমান কবি কর্ত্তৃক বিরচিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় মুসলমানগণ আশানুরূপভাবে সংগ্রহ করেন নাই। ইহার ফলে, আজ আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার মুসলমান লেখকদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। অথচ. পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালে, অসংখ্য বঙ্গীয় মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একজন প্রাচীন মুসলমান কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

"চারি মঞ্জিলের কথা"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কিঞ্চিদধিক ছয় হাজার বাঙ্গালা পুথির মধ্যে, মুসলমান লেখকদের দ্বারা রচিত বাঙ্গালা পুথির যে দুই তিনখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, তন্মধ্যে "চারি মঞ্জিলের কথা" (?) (৬১১৮নং পুথি দ্রষ্টব্য) এই আখ্যায় একখানি বিরাট্ বাঙ্গালা পুথির অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা ২ হইতে ৯৮ পত্র অর্থাৎ ১৯৪ পৃষ্ঠা লইয়াই আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই পুথিখানি কবি শেখ চান্দ কর্ত্তৃক বিরচিত।

"রসুল-বিজয়"

এই "চারি মঞ্জিলের কথা" আলোচনা করিয়া দেখা গেল, পুথিখানির নাম "চারি মঞ্জিলের কথা" নয়; তথাপি মলাটে ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে। পুথিখানিতে কোথাও এই নাম ব্যবহৃত হয় নাই। পুথির মধ্যে ইহাকে নানা স্থানে "রচুল বিজএ" অর্থাৎ "রসুল-বিজয়" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যথা—

"রচুল বিজএ কথা, অপুর্ব্ব পাচালি গাতা
স্রবনেত পাপ বিমোচন।"—(৪৯-২)

সুতরাং পুথিখানির প্রকৃত নাম যে "রসুল-বিজয়", সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই। তবে পুথিখানিতে "চারি মঞ্জিলের কথা" এই নাম কোথা হইতে দেওয়া

হইল? পুথিখানির প্রথমে "সৃষ্টি অধ্যায়" নামে একটি দীর্ঘ অধ্যায় সংযোজিত আছে। এই "সৃষ্টি অধ্যায়ে" ইস্‌লামী অধ্যাত্ম (মারফৎ) বিষয়ক কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। "চারি মঞ্জিল" অর্থাৎ সূফী-সাধনার চারিটি ধাপ ইহার অন্তর্গত। এই অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই "চারি মঞ্জিল" সম্বন্ধেই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং যিনি পুথিখানিতে নাম সংযোজিত করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই "সৃষ্টি অধ্যায়ে"র "চারি মঞ্জিলে"র বিবরণটি পাঠ করিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন যে, পুথিখানির নাম "চারি মঞ্জিলের কথা"। ফলে তাহা নহে;—ইহার নাম **"রসুল-বিজয়"**।

"রসুল-বিজয়"এর পাণ্ডুলিপি

এই "রসুল-বিজয়" কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি এক শত হইতে দেড় শত বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারকুলের অধিবাসী নছরত গাজী নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ইহা অনুলিখিত হয়[১]। দেখিতেছি,—পুথিখানির নকলকারক নছরত গাজীও একজন কবি ছিলেন। এই পাণ্ডুলিপির দুই স্থলে (এক স্থল এই পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে; অন্য স্থল ৩১।১) তাঁহার রচিত বিনয়জ্ঞাপক পদ রহিয়াছে। যদিও তিনি দুই দুই বার প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

> "জেমত অছলে আছে লেখিল তেমত।
> মুই অধমের প্রতি না কর জরাফত॥" (৩১।২; ৭৪।২)

অর্থাৎ তিনি যে পুথি হইতে নকল করিতেছেন, সেই আসল বা মূল পুথিতে যেইরূপ আছে, অবিকল সেইরূপ লিখিয়াছেন, সুতরাং কেহ যেন তাঁহাকে দোষারোপ না করে; তথাপি এই দোষারোপ করার কথা পাড়াতে আমাদের মনে হয়, তিনি পুথিখানিতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি নিজেও পদ রচনা করিতে পারিতেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে নকল করার সময়ে সংযোজন ও বিয়োজন করা কিছুই বিচিত্র নহে। ফলে তিনি তাহাই করিয়াছেন। তিনি কি যে সংযোজিত করিয়াছেন, অন্য পুথি না পাইলে, তাহা বলা সহজ নয়। তবে বিয়োজন যে করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি হইতেই ধরা পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত বর্ত্তমান পুথিতে "সৃষ্টি অধ্যায়ে"র পরে হঠাৎ নবম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে "চল্লিশ অধ্যায়"টি নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথমের "আট" এবং মধ্যের "চল্লিশ"—মোট নয়টি অধ্যায়কে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান পুথির কোন কোন অধ্যায় খুব ছোট এবং কোন কোন অধ্যায় বেশ একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়,—

১। "রচুলের বরে কহে মতিহিন চান্দে। মতিহিন হৈয়া যদি অক্ষর পড়এ।
কহিবা চৌতিসা কিছু পএয়ার প্রবন্দে॥ বুজিয়া পড়িবা ভাই কহিএ নির্চাএ॥
জেমত অছলে আছে লিখিলাম তেমত। মেহারকুলিয়া হই আমি ধরি অল্পজ্ঞান।
মুই অধমের প্রতি না কর জরাফত॥ অক্ষর পড়িলে গোনা করিবা মোছন॥
জে রাগে জে ছন্দে হএ বুজিয়া পড়িবা। সহস্র প্রণাম করি গুণিগণ পাএ।
হিন নছরতের ঘাইট সকলে খেমিবা॥ ঘাইট হইলে গোনা খেমিবা সবাএ॥"(৭৪।২)

দীর্ঘ অধ্যায়গুলিতে অনেক বিষয় সংযোজিত, এবং খর্ব্ব অধ্যায়গুলি হইতে অনেক বিষয় বিয়োজিত হইয়াছে। জানিতে পারিয়াছি,—চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত প্রাচীন সাহিত্যিক মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহোদয়ের পারিবারিক পুস্তকাগারে কবি শেখচান্দের "রসুল-বিজয়" কাব্যের তিনখানি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। এই পাণ্ডু-লিপিত্রয়ের সহিত মিলাইয়া লইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির জাল-জুয়াচুরি সহজেই ধরা পড়িবে। বর্ত্তমানে সুযোগের অভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিখানিই আমাদের সম্বল।

বর্ত্তমান পুথিখানির আদ্যন্ত খণ্ডিত। এই খণ্ডিত পুথির কোথাও নকলের তারিখ বা কবির আত্ম-বিবরণী নাই। সুতরাং, আপাততঃ কবির সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আমরা এই পুথি হইতে পাইতেছি না। কিন্তু পুথিখানিতে যে সকল ভণিতা আছে, তাহা হইতে কবির সম্বন্ধে মোটামোটি কতকগুলি কথা আমরা জানিতে পারি। নিম্নে কয়েকটি আবশ্যক ভণিতা উদ্ধৃত হইল,—

(১)

"ফথে মাহাম্মদর সুত সএক চান্দ নাম।
মুর্স্বিদ আজ্ঞাএ পাচালি রচিল অনুপাম ॥"—(বহু স্থানে)

(২)

"রচুল বিজএ কথা　　অপূর্ব্ব পাচালি গাতা
শ্রবনেত পাপ বিমোচন ॥
মুমিন সকলে সুন　　পাইবা বহুত পুণ্য
অন্তকালে বিহিস্তেত গতি।
ফথে মাহাম্মদ সুতে　　সুজন লোকের হিতে
পাচালি রচিল দিন ত্রিতি ॥"—(৪৯-২)

(৩)

"সাহা দৌলতের সিস্ব সএক চান্দ নাম।
গুরুর আজ্ঞাএ পাচালি রচিল অনুপাম ॥"—(বহু স্থানে)

(৪)

"পাগল চান্দাএ কহে রচুল বিজএ।
বিনি খড়্গ বিনি ঝাটে বরি পরাজএ ॥"—(বহু স্থানে)

(৫)

"রচুল বিজএ কথা　　অপূর্ব্ব পাচালি গাতা
ভক্তিভাবে সুন সর্ব্বজন।
রচুলের পদ্ম ছায়া　　তাতে অঙ্গ ছাপাইয়া
অধম চান্দার বিরচন ॥"—(৯৪-২)

কবির পরিচয়

উপর্য্যুদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে আমরা "রসুল-বিজয়" কাব্যের প্রণেতা সম্বন্ধে জানিতে পারিতেছি যে, ইহার রচয়িতার নাম চান্দ; তিনি সম্ভ্রান্ত "শেখ" বংশে জন্ম গ্রহণ করেন;

তাঁহার পিতার নাম ফথে মোহাম্মদ; এবং তিনি তদীয় "মুর্সিদ" বা গুরুর আদেশে তাঁহার "রসুল-বিজয়" কাব্য প্রণয়ন করেন। আমরা আরও জানিতে পারিতেছি,—তিনি নিজেকে "পাগল" বলিয়া পরিচয় দিতেন; বোধ হয়, তিনি গুরুর মতে দীক্ষিত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "পাগল" বলিত। কিন্তু সাধারণতঃ লোকজন তাঁহাকে "পাগল" বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি জানিতেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তির শিষ্য এবং এমন এক ব্যক্তির বাণী প্রচার করিয়া বেড়ান, যিনি "সুজন" অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষ। তাই, কবি নিজেকে "সুজন লোকের দূত" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই "সুজন" অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষটি কে,—কবি সে কথাও বলিয়া দিয়াছেন। ইহার নাম শাহ্ দৌলৎ বা শাহ্ দৌলা।

"রসুল-বিজয়" কাব্যে রচনার কোন তারিখ নাই। সুতরাং কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। এমন অবস্থায়, কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে কবির সময় অনুমান করিবার চেষ্টা করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, "রসুল-বিজয়" কাব্যখানি মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁর) "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" কাব্যের ছাঁচে হুবহু ঢালা। নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি পর্য্যন্ত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" কাব্যের আদর্শেই লিখিত। গুণরাজ খাঁর "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে (১৪০২ শাকে) লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং, এই কাব্যের আদর্শে বিরচিত "রসুল-বিজয়" নিশ্চয় ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়া থাকিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—"রসুল-বিজয়" ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের কত পরে রচিত হইয়াছিল? "রসুল-বিজয়-"বর্ণিত প্রাসঙ্গিক এবং কাব্যখানির আনুষঙ্গিক বিষয় হইতে আমরা একরূপ সঠিক ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব।

আমরা দেখিয়াছি, কবি শেখ চান্দ, শাহ্ দৌলা নামক একজন পীরের আদেশে "রসুল-বিজয়" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যের এক স্থলে শাহ্ দৌলা পীরের একটু পরিচয়ও দিয়াছেন। তিনি তাঁহার পীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"সাহ দৌলা পীর জান মোহা গুনবান। তাঁহার চরনে নিত্য চান্দের ধ্যায়ান॥
সান্তবন্ত জ্ঞানবন্ত জ্ঞানে মোহাজ্ঞানি। পুরুস ফকির পির ধন্য মোহা ধ্যায়ানি॥
সদাএ ধ্যায়ান তান নাচুত মোকামে। জিকির ফিকির তান মলকুত মোকামে॥
ভ্রমন করএ তাঞ লাহুত মোকামে। সদাএ ধ্যায়ান তান আল্লার হুকুমে॥
পাঞ্চ ওক্ত নমাজ পড়এ মছজিদে। সদাএ ধ্যায়াএ তাই মন হরসিতে॥
সর্ব্ব অঙ্গে গুননিধি পরম সোন্দর। সামবর্ন অঙ্গত সে জেন জলধর॥
ক্রেপার সাগর পির চান্দার ইশ্বর। তাহান চরন বিনে গতি নাই আর॥
তাহান চরনের রেনু নয়ানে ভুসিয়া। অধম চান্দাএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥"

এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি,—পীর শাহ্ দৌলা একজন উচ্চদরের সুফী ছিলেন। "নাসুত্", "মলকুত্", "জবরূত্", "লাহুত্" নামক সুফী-সাধনার চতুর্ল্লোকে

এই সাধক বিচরণ করিয়া সাধনামগ্ন হইতেন। তিনি প্রধানতঃ "তরীকত্" বা অধ্যাত্মবাদী সাধক হইলেও, "শরী'অত্" বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মও পালন করিতেন। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণবিশিষ্ট সুপুরুষ ছিলেন।

মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের পারিবারিক গ্রন্থাগারে "শাহ দৌলা পীর পুস্তক" নামে একখানি প্রাচীন পুথির আরবী ও বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত কয়েকখানি পাণ্ডু-লিপি রক্ষিত আছে। সাহিত্য-বিশারদ মহোদয়ের অনুগ্রহে আমরা পুথিখানির পাণ্ডুলিপি কয়খানি দেখিয়াছি। "চান্দ" নামক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে "শাহ দৌলা" নামক পীর যে তত্ত্বকথা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ আছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে মনে হয়, যেন ইহা একজন তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপর্য্যুক্ত গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর শুনিয়া লিখিত। কিন্তু ফলে তাহা নহে। কেন না, আরবী অক্ষরে লিখিত একখানি পাণ্ডুলিপিতে দেখিতে পাই :—

> এই মতে মনরাজা ভ্রমে বন্দে বন্দে।
> সাহা দৌলার আগে জান বিরচিল চান্দে॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শাহ দৌলা পীরের শিষ্য স্বয়ং চান্দই ইহার রচয়িতা। কবি চান্দ তাঁহার গুরু শাহ দৌলা এবং নিজের পরিচয় এই আরবী অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

> "সকল বন্দিলুম আমি জান একমন। কায়মনে বন্দিমু মুর্সিদচরণ॥
> সাহা দৌলা পির জান আল্লার নিজ জাত। ফকিরিতে দম ধরে নুরের ছিফাত॥
> চারি পির চৌদ্দ খান্দান জেই জানে। সরিয়ত পন্থ জান সে সকল মানে॥
> সরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারফত। এই চারি মঞ্জিলে জান করে এবাদত॥
> পরগনে "কুদুফা" নাম "হুর" গ্রামে ঘর। তালুক ভুমি অল্প তান সিস্য বহুতর॥
> সকল সিস্যের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন। নাম হীন চান্দ ফথে মোহাম্মদের নন্দন॥
> আউয়ালে আখেরে আশা সাহা দৌলা পদ্দে। দীনের ইমান দিয়া বিকাইল চান্দে॥

বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এই পদগুলির অনেক অংশ নাই এবং যেগুলি আছে. তাহা বিকৃত হইয়াছে। পীর শাহ দৌলাব সম্বন্ধে ইহাতে দুইটি পঙ্‌ক্তি অতিরিক্ত আছে ; তাহা এই,—

> "পরগনে পাইটকরা স্থানে গোঞাঁঅএ সাল।
> তালিপ তলপ সিস্য পণ্ডিত বিসাল॥"

কবির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি দুইটি আবশ্যক,—

> "দ্বাদস বৎসর পাছে বাড়িলেক জ্ঞান।
> মুরসিদ চরণে মোর একিদা ইমান॥"

উপর্য্যুক্ত বিবরণ পাঠ করিলে আর সন্দেহ থাকে না যে, "রসুল-বিজয়"-প্রণেতা ও "শাহ দৌলা পীর পুস্তক"-প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি, এবং "রসুল-বিজয়ে" বর্ণিত পীর শাহ দৌলা আর "শাহ দৌলা পীব পুস্তকের" পীর শাহ দৌলা একই সাধক। অতএব "শাহ দৌলা

পীর পুস্তকে" এই দরবেশ ও কবির সম্বন্ধে যে বিবরণ পাইতেছি, তাহা "রসুল-বিজয়" পুস্তকে প্রাপ্ত বিবরণটিতে আরও নূতন আলোকপাত করিতেছে। "শাহ দৌলা পীর পুস্তক" পাঠে জানিতে পারিতেছি, "কুদুফা" নামক কোন পরগণার অন্তর্গত "হুর" নামক এক গ্রামে পীর শাহ দৌলার স্থায়ী বাসস্থান ছিল। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত পাটিকারা পরগণায় তিনি কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তালিপ ও তলপ নামে তাঁহার দুই জন সুপণ্ডিত শিষ্য ছিলেন। ফথে মোহাম্মদের পুত্র চান্দ তাঁহার বহু শিষ্যের মধ্যে অন্যতম। চান্দ বার বৎসর পর্য্যন্ত পীর শাহ দৌলার পাছে পাছে ঘুরিয়া যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কবি শেখ চান্দ তাঁহার গুরু সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। তবে. পীর শাহ দৌলা যে একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মস্থল যে বাঙ্গালার বহু স্থানে বিস্তৃত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

বাঙ্গালার দরবেশদের জীবন-কথা আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাজশাহী জেলার সদর সবডিভিশনের অন্তর্গত "বাঘা" গ্রামে হজরত মৌলানা শাহ দৌলা নামে একজন বিখ্যাত দরবেশের সমাধি আছে। এই সাধকের পৌত্র হজরত মৌলানা আবদুল ওহাব মোঘল-বাদশাহের নিকট হইতে ১০২৪ হিজরী অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "মদত্ অ মায়াস"রূপে বার্ষিক মোট আট হাজার টাকা আয়ের বেয়াল্লিশটি গ্রাম নিষ্কর ভোগের সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দ হইতে দেখা যায়, তাঁহার ঠাকুরদাদা হজরত মৌলানা শাহ দৌলা সাহেব ৯২৫ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন। বাঘাগ্রামেই তাঁহার প্রধান প্রচারকেন্দ্র ছিল। এখানেই তাঁহার দেহাবসান হয়।

বাঙ্গালা দেশে, পঞ্চদশ, কি ষোড়শ শতাব্দীতে, এই শাহ দৌলা ব্যতীত এই নামের অন্য কোন খ্যাতনামা প্রচারক পীর আগমন করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয় এ যাবৎ আমরা কিছু জানি না। আমাদের বিশ্বাস, রাজশাহীর বাঘা গ্রামে সমাহিত পীর শাহ দৌলাই কবি শেখ চান্দের গুরু। রাজশাহীর পীর শাহ দৌলা ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই এ দেশে আসিয়াছিলেন। "রসুল-বিজয়ে"র ন্যায় হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। বিশেষতঃ "রসুল-বিজয়ে"র প্রথমেই "মা'রফত্" অর্থাৎ ইস্‌লামী অধ্যাত্মবিষয়ক অনাবশ্যক কাব্য হিসাবে অনেক কথা সংযোজিত আছে; শাহ দৌলার ন্যায় সিদ্ধ পুরুষের সাহচর্য্যে রচিত বলিয়াই, পুস্তকখানিতে এই কথাগুলি সংযোজিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

আরও একটি কারণে, রাজশাহী জেলার পীর শাহ দৌলা সাহেবকে আমাদের আলোচ্য কবি শেখ চান্দের গুরু বলিয়া মনে করি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই বাঙ্গালা সাহিত্যের "বিজয়" কাব্যগুলি লিখিত হইয়াছিল; যেমন, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" লিখিত হয় ১৪০২ শাকে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে, "গোরক্ষ-বিজয়"ও আনুমানিক এই সময়ে, "জগন্নাথ-বিজয়" লিখিত হয়—চৈতন্যদেবের সমসময়ে। ইহার পর, আর কোন "বিজয়"কাব্য লিখিত

হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একই জাতীয় কাব্যরীতিতে লিখিত ভাল কাব্যগুলি ক্রমে ক্রমে এক হইতে দুই শতাব্দীর মধ্যেই লিখিত হইয়াছিল দেখা যায়। সুতরাং অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত "বিজয়" কাব্যের কাব্যরীতিতে লিখিত "রসুল-বিজয়" খ্রীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর পরে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। যদি পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই "রসুল-বিজয়" লিখিত হইয়া থাকে, তবে এই কাব্যে বর্ণিত পীর শাহ দৌলা রাজশাহী জেলার পীর শাহ দৌলা ব্যতীত অন্য লোক বলিয়া মনে হয় না। রাজশাহীর পীর শাহ দৌলা ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন। অতএব ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ যোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই কবি শেখ চান্দের আবির্ভাবকাল মনে করা যাইতে পারে।

কবি শেখ চান্দের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে একরূপ মোটামোটি ধারণা করা গেল। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবির কাব্যগুলির পাণ্ডুলিপি পূর্ব্ববঙ্গেই (ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম) অনুলিখিত, পঠিত ও রক্ষিত হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়া কবিকে পূর্ব্ববঙ্গের (ত্রিপুরা বা চট্টগ্রাম জেলার) অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কাব্যগুলির বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে পূর্ব্ববঙ্গের (ত্রিপুরা বা চট্টগ্রাম জেলার) শব্দ ও ভাষাও যে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। তাই বলিয়াও কবিকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া অনুমান করা সমীচীন নহে। কেন না, পূর্ব্ববঙ্গের (ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের) নকলকারকদের হাতে এহেন ব্যাপার সাধিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাহা হইলে, কবির জন্মস্থান কোথায়? আমাদের ধারণা, কবি উত্তর-বঙ্গেরই অধিবাসী ছিলেন। এই ধারণাটি যে নিতান্ত অমূলক, তেমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেন না, আমরা কবির বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত "শাহ দৌলা পীর পুস্তক"এর শেষে দেখিতে পাই,—

> "পুস্তক লেখীল আহ্মি না জানি কিছু সন্দি।
> রিজিগের লাগি আহ্মি বিদেসেত বন্দি ॥
> বিদেসে রহিএ আহ্মি তারে নাহি ডর।
> প্রভুর চরণ বিনে ভ্রসা নাহি মোর ॥" (২৩-২)

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি যেখানে বসিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সেখানে তিনি বাস করিতেন না,—ইহা তাঁহার পক্ষে বিদেশ ছিল, এবং জীবিকার্জ্জনের জন্যই তিনি তথায় বাস করিতেছিলেন। কবির পীর শাহ দৌলা যখন ত্রিপুরা জেলার পাটিকারা পরগণায় বাস করিতেছিলেন, তখন তথায় থাকিয়া তিনি "শাহ দৌলা পীর পুস্তক" লিখিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

"রসুল-বিজয়" এবং "শাহ দৌলা পীর পুস্তক" পাঠে এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হয় যে, চান্দ তাঁহার গুরুকে ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাজশাহী জেলার বাঘা গ্রামেই পীর শাহ দৌলার স্থায়ী আস্তানা ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, পীরদের স্থায়ী আস্তানার নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদের মধ্যেই কেহ কেহ পীরদের প্রতি একান্তই

ভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহাদিগকে যত্র তত্র ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। তাই মনে হয়, বাঘা গ্রাম বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কবির বাস ছিল। এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কবির বাড়ী উত্তরবঙ্গে হইলে, তথায় তাঁহার কোন পুস্তকাদি বা স্মৃতি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না, অথচ পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার কাব্য অনুলিখিত, পঠিত ও রক্ষিত হইল কেন? উত্তরে বলিতে পারা যায়,—মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদ যদি বাঙ্গালায় অনুকারিত ও রক্ষিত হয়, পশ্চিমবঙ্গের চণ্ডীদাসের পদ যদি পূর্ব্ববঙ্গেও পাওয়া যায়, মুর্শিদাবাদের সাধক কবি সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী যদি বৈষ্ণবসমাজ ও চট্টগ্রামের মুসলমান কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, তবে উত্তরবঙ্গের শেখ চান্দের পুথি পূর্ব্ববঙ্গে অনুলিখিত, পঠিত ও রক্ষিত হইলে, তদ্দ্বারা কবিকে টানিয়া পূর্ব্ববঙ্গভুক্ত করা চলে না। অধিকন্তু উত্তরবঙ্গে এ যাবৎ মুসলমানদের পুথি সংগ্রহের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চলে নাই বলিয়া, ঐ অঞ্চলে কবির পুথি ও স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে।

রসুল-বিজয়ের পরিচয়

এইবার আমরা কবি শেখ চান্দের "রসুল-বিজয়" কাব্য সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করিব। কেন না, কাব্য হিসাবে ইহার বিশেষ মূল্য থাকুক বা না থাকুক (এবং এই শ্রেণীর কোন কাব্যেরই কাব্য হিসাবে বিশেষ মূল্য নাই), বাঙ্গালার সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ঐস্‌লামিক সংস্কৃতি-বিস্তৃতির ধারা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার সত্যকার প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই "রসুল-বিজয়" কাব্যখানির মূল্য যে অফুরন্ত, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বিজয়' কাব্য ও তাহার মূল বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে "বিজয়" কাব্যের অভাব নাই। এই সমুদয় কাব্যে যে সাহিত্য-রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা মূলতঃ এক। ইহাদের অন্য যে বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল,—এই কাব্যগুলিতে যাঁহাদের "বিজয়" অর্থাৎ প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, নানা প্রকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে তাঁহাদের মানবীয় জীবনটিকে অলৌকিক করিয়া তোলা। কাব্য-বর্ণিত চরিত্রগুলির মূল কাঠামো ঐতিহাসিক হইলেও, কবিগণ সৃষ্টির মোহে মুগ্ধ হইয়া, যত্র তত্র যেমন ভাবে কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে সৃষ্টি যে শুধু অনাসৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়া নিতান্তই পৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছে, তেমন নহে, বরং সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবীয় সীমারেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেবরাজ্যে প্রবেশ করায়, এই মহাপুরুষগণ পৌরুষ-বিহীন হইয়া মানব-জগৎ হইতে সমস্ত সম্বন্ধই ছিন্ন করিয়াছেন। মানবজাতির এই শিক্ষকগণকে কারণে অকারণে এহেনভাবে দেবতা করিয়া তোলার মধ্যে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে আর্য্যজাতিসুলভ হিন্দু-মনোবৃত্তির চরম বিকাশ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। কেন না, সেমীয় (Semitic) জাতির মধ্যে (যেমন আরবের মুসলমানদের মধ্যে), মানব-শিক্ষকগণকে জগতের নিকট এমন দেবতারূপে দাঁড় করাইবার কোনরূপ প্রচেষ্টা এ যাবৎ দৃষ্ট হয় নাই। মহাপুরুষদের চরিত্রে যে সুদৃঢ় পুরুষকার

বর্ত্তমান থাকে, একমাত্র হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতির মহাপুরুষদের চরিত্রের সেই বৈশিষ্ট্যের অনেকাংশ দেবভাবের আরোপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। মূলতঃ এই কারণেই "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" বা "জগন্নাথ-বিজয়" কাব্যের দেবরূপী মহাপুরুষগণকে মানবের শিক্ষকরূপে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরা কতকটা অস্বাভাবিক। কেন না, পূর্ণ মানুষই অপূর্ণ মানুষের আদর্শ হইতে পারেন; দেবতা দেবতার আদর্শ হইতে পারেন, মানুষের নহে।

'বিজয়'কাব্যে 'রসুল-বিজয়ে'র স্থান

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার মুসলমানগণ যে "বিজয়"-কাব্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহাকে বঙ্গীয় হিন্দুর "বিজয়"-কাব্য হইতে পৃথক্ করা চলে না। "রসুল-বিজয়ে" অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্যবর্ণনায় ফথে মোহাম্মদের পুত্র শেখ চান্দ যে কাব্য-রীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মুসলমানদের হজরত মোহাম্মদ আর হজরত মোহাম্মদ রহেন নাই,—সোজা শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। এদিক্ হইতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, "রসুল-বিজয়" কাব্যখানি "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" কাব্যের একটি প্রতিরূপ মাত্র। আমাদের বিশ্বাস,—কবি তাঁহার কাব্যে এই কথা স্বীকার করুন বা না-ই করুন, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" কাব্যই কবির আদর্শ ছিল। কেন না, আমরা দেখিতে পাই, "রসুল" অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের জীবনের কতকগুলি সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত অপরাপর সমুদয় অনৈতিহাসিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনায় "রসুল-বিজয়"-এর সহিত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"-এর সাদৃশ্য এতই ঘনিষ্ঠ যে, অনেক সময় আমরা পুস্তকদ্বয় পাঠকালে ঠিক করিতে পারি না যে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করিতেছি, না হজরত মোহাম্মদের। বলিতে কি, আরব দেশের স্থানগুলির নাম বাদ দিলে, মনে হইবে,—হজরত মোহাম্মদ বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতির মধ্যেই ধর্ম্ম ও আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। কবি শেখ চান্দের হাতে পড়িয়া আরব যে শুধু বাঙ্গালা দেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা নহে, আরবের নরনারী এবং তাহাদের আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নরনারী ও তাহাদের আচার-ব্যবহারে পরিণত হইয়াছে।

'রসুল-বিজয়' 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র আদর্শে লিখিত হইল কেন?

মুসলমান কবির দ্বারা হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও, এমন হইল কেন?—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। কবির বংশ সম্বন্ধে যদি তাঁহার উক্তি সত্য হয়, অর্থাৎ তিনি যদি সত্যই "শেখ-" (আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি) বংশজাত মুসলমান হন, তবে তাঁহাতে বাঙ্গালী বা হিন্দু মনোভাবের আরোপ করা অন্যায় হইবে। মনে হয়,—এদেশের নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ঐসলামিক সংস্কৃতি বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে এমনটি করা হইয়া থাকিবে। এ কথা নিতান্তই সত্য যে, এদেশের সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পুরুষকারপূর্ণ হজরত মোহাম্মদের চরিত্র যতটা ক্রিয়া করিতে পারে না, তাঁহার প্রতি অযথা আরোপিত অলৌকিকত্ব ততোধিক ক্রিয়া করে। সুতরাং, বাঙ্গালার মুসলমান এবং হিন্দুর সম্মুখে হজরত মোহাম্মদকে দেবতারূপে দাঁড় করান, কবির পক্ষে

আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ এদেশের লোক দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনের সহিত যতটা পরিচিত, ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত তত পরিচিত নহে। অতএব, বাধ্য হইয়াই কবি শেখ চান্দ তাঁহার "রসুল-বিজয়ে" হজরত মোহাম্মদের জীবনে দেবত্ব ও অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মুসলমানদের মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ, হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কোন অংশে কম নহেন, বরং বেশী; সুতরাং এমন অলৌকিক জীবন পাঠ করিয়া যেন লোক মুগ্ধ হয়, এবং দলে দলে ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আমরা পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই,—এই কাব্যখানির পশ্চাতে ধর্ম্ম-প্রচারমূলক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তাই কবি একাধিক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"পাগল চান্দাএ কহে মুর্শ্বিদের বরে। রছুলবিজএ কথা রচিলুম্ পএয়ারে॥
সুনিলে পাতক নাসে অন্তে সর্গে ঠাম। জ্ঞান ধ্যেন বাড়এ পাএ নিজ নাম॥
ইহলোকে পরলোকে নিস্তার জাহান। রছুলবিজএ মুর সুনহ সাবধান॥

এইরূপে জনসাধারণকে নরকের ভয়, স্বর্গের প্রলোভন, ঐহিক সুখ্যাতির লোভ এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির আশায় প্রলুব্ধ করিয়া, কবি যেখানে "রসুল-বিজয়"-এর কথা শুনাইয়াছেন, সেখানে কাব্য-প্রণয়নে কবির উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এইরূপ নানা প্রলোভনে ধর্ম্ম-প্রচার করাই উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া, "রসুল-বিজয়" স্থানে স্থানে "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"-এর খোলস বা মুখোস পরিধান করিয়াছে। নতুবা মুসলমান কবির হাতে হজরত মোহাম্মদের এহেন অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত হইত না,—এ কথা একরূপ সুনিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে।

'রসুল-বিজয়' কাব্যে রসুল-চরিত

"রসুল-বিজয়"-এর সহিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"-এর তুলনামূলক সমালোচনা করিতে হইলে, এই পুস্তকে কি ভাবে হজরত মোহাম্মদের জীবন চিত্রিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া লওয়া উচিত। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত প্রায় সকলেই একরূপ সুপরিচিত। "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"-এর শ্রীকৃষ্ণ ও পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং দুই পুস্তকের ঘটনা-সমাবেশ তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য "রসুল-বিজয়"-এর রসুল হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করিলাম।

"রসুল-বিজয়" পুস্তকে দেখিতে পাই,—জন্মের পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ ব্রহ্ম-জ্যোতি-বৃক্ষে (বস্ত নুর ব্রিক্ষে) একটি পুষ্পরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার মানবদেহ-ধারণের সময় উপস্থিত হইলে, 'নিরঞ্জন' স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলকে (Gabriel) সেই পুষ্পটি আহরণ করিয়া আনিয়া হজরত মোহাম্মদের ভাবী পিতা আবদুল্লার হস্তে দিতে আদেশ করিলেন। জিব্রাইল্ পুষ্প আহরণ করিতে গিয়া দেখিলেন, ফুলটিকে সত্তর হাজার ফেরেস্তা (স্বর্গীয় জীববিশেষ) পাহারা দিয়া রক্ষা করিতেছে; ফেরেস্তাগণ জিব্রাইল্‌কে পুষ্প আহরণে বাধা প্রদান করিল। অতঃপর প্রভু নিরঞ্জনের প্রভাবে জিব্রাইল্ পুষ্প আহরণ করিয়া আনিয়া, তাহা আবদুল্লার হাতে প্রদান করিলেন। আবদুল্লা তাহার ঘ্রাণ লইলেন; হজরত মোহাম্মদের নুর (জ্যোতিঃ) ঘ্রাণরূপে আবদুল্লাকে আশ্রয় করিল;

আবদুল্লা এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় গন্ধে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে যে সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, তাহাতে—

"মনুষ্য আদি যত জীব আছে পৃথিবীত। নূরের সুগন্ধে তারা হৈল আমোদিত ॥
নবীন বসন্ত যেন হৈল উপস্থিত। মত্ত হৈয়া কোকিলায় ডাকে সুললিত ॥
যুবক যুবতী যেন হৈল পুলকিত। কেদার সময়ে হৈল বসন্তের রীত ॥
আপনা অঙ্গের গন্ধ আবদুল্লায় পাইয়া। ভ্রমিতে লাগিল বীরে মোহিত হইয়া ॥"

(নবম অধ্যায়)

এইরূপে কস্তুরী-মৃগের ন্যায় আপন গন্ধে মোহিত হইয়া আবদুল্লা যখন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন যে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিত, সে-ই মুগ্ধ হইয়া যাইত। হজরত মোহাম্মদের ভাবী স্ত্রী বীবী খদীজা এই সময়ে তাঁহাকে দেখিলেন, দেখিয়া তিনিও মুগ্ধা হইয়া গেলেন। যে দিন আবদুল্লার সহিত তাঁহার দেখা হয়,—

"সে দিন খদিজা বিবি যুবতী আছিল। উদরে লইতে চন্দ্র মনেতে ভাবিল ॥
... .
আবদুল্লার মুণ্ডে দেখি চন্দ্রের প্রকাশ। এ তিন ভুবন ভরি অমৃত পিতে আশ ॥"

কিন্তু, বীবী খদীজার সে আশা পূর্ণ হয় নাই; তিনি হজরত মোহাম্মদের মাতা হইতে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেও, ভগবানের ইচ্ছায় তাহা হয় নাই (দশম অধ্যায়)।

হজরত মোহাম্মদের ভাবী মাতা আমিনা 'নফলঙ্গ' নামক এক আরব্য রাজার নন্দিনী ছিলেন। তিনি তখনও অনূঢ়া যুবতী; তাঁহার নিটোল যৌবন, অপরূপ রূপ ও অপূর্ব্ব লাবণ্য তখনও উছলিয়া পড়িতেছে। তিনি আরব-রাজ-নন্দিনী হইলেও, সম্পূর্ণই বঙ্গীয় রমণীরূপে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হইতেছে। কেন না, আমরা দেখিতেছি,—

"অঞ্জন রঞ্জিত হৈল নয়ানের কোলে। পদপরে ভোমরাএ মধুলোভে ভোলে ॥
নাসিকা শোভএ যেন এক তিলফুল। বেশর শোভএ তাতে মুকুতা হিন্দোল ॥
গৃধিনী পক্ষিনী জিনি শ্রবণ শোভিত। মণিময় কুণ্ডল আছে তাতে বিরাজিত ॥
সুন্দর তিলকের চন্দনের বিন্দু। সূর্য্য আশ্রাদিয়া যেন রহিয়াছে ইন্দু ॥
চাচর চিকুর দেখি চামরা লজ্জিত। তাতে বেণী শোভা করে ভুজঙ্গী সহিত ॥
রক্তবর্ণ অধর জিনিয়া বিম্বফল। মুকুতার হার জিনি দশন বিমল ॥
মৃণাল জিনিয়া শোভিয়াছে দুই কর। কেয়ূর কঙ্কণ তাতে দেখিতে সুন্দর ॥
বাহুমূলে নবরঙ্গ দেখিতে শোভিত। যার তেজে দশ দিক করে আমোদিত ॥
গ্রীবা পরে শোভিয়াছে মণিরত্ন হার। দিনমণি পাএ দীপ্তি হরে অন্ধকার ॥
মৃগরাজমধ্য জিনি কটি অতি খিনি। উরুযুগ সুললিত রামরম্ভা জিনি ॥
চরণ শোভএ মণিময় বুক্ষরাজ। কনক নেপুর তাতে অধিক বিরাজ ॥

এহেন বঙ্গীয় অলঙ্কারে সুশোভিতা, বঙ্গীয় সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিতা, তিলক-বিন্দুশোভিতা রমণী আরবের কুত্রাপি দেখা যায় বলিয়া মনে হয় না। ইনি যে আমাদেরই গৃহলক্ষ্মী, যেন আরবে নির্ব্বাসিতা হইয়াছেন। একদিন ইনি "টঙ্গী"র উপর বসিয়া "ঝরকা তুলিয়া দিয়া" সমীর-

সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় আপন অঙ্গ-সুরভি-প্রমত্ত আবদুল্লা সেই "টঙ্গী"র পাশ দিয়া যাইতে, বীবী আমিনা তাঁহাকে দেখিলেন। আবদুল্লার বদন-মণ্ডলে "নুর-ই-মোহাম্মদী" (মোহাম্মদের জ্যোতিঃ) চমকাইতেছিল; তাই—

"পরম সুন্দরী কন্যা নব যুবকলা। দেখিয়া নুরের রঙ্গ বিমোহিত ভেলা ॥"

বিমুগ্ধা আমিনার মনে প্রেম জাগিল, তাঁহার কামনার বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আবদুল্লাকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার সহিত অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। আবদুল্লা এহেন বিগর্হিত কার্য্যে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে, বীবী আমিনা তাঁহাকে ঐ মুহূর্ত্তেই বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তৎক্ষণাৎ বিবাহ সম্পন্ন হওয়া স্থির হইল। কবি বলিতেছেন,—

"আল্লার হুকুম পাইয়া চারি ফিরিস্তাএ। ধরিয়া মৌলানা ভেস মক্কা দেশে যাএ ॥
দস্তার জুব্বা পিন্ধি আসা করি হাতে। ধীরে ধীরে চলি যাএ তছবি অঙ্গুলিতে ॥
... ...
বিবার সঞ্জগ তবে সত্বরে করিল। পানফুল সিরিণী ফাতেহা করাইল ॥
আমিনা সহিত পুনি বসিল আবদুল্লা। মহত্বর জিব্রিল মৌলানা হইলা ॥
মহত্বর মিকাইল হইল উকিল। আমিন হইল আজ্রাইল ইস্রাফিল ॥
আমিনা আবদুল্লা দোঁহ নিকা পড়াইয়া। জিলুয়া দিলেক মধ্যে অন্তসপট দিয়া ॥"

এইরূপে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, পিতামাতার অজ্ঞাতসারে, নির্জ্জন টঙ্গীতে, উপর্য্যুক্ত স্বর্গীয় দূতচতুষ্টয়ের সহায়তায় আমিনার সহিত আবদুল্লার বিবাহ হইয়া গেল (একাদশ অধ্যায়)। বিবাহের পর, তাঁহারা রতি-ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইলেন। ভাবী 'পয়গম্বর' (ঐশ সংবাদবাহক) হজরত মোহাম্মদ এই সময়ে আবদুল্লার নিকট হইতে আমিনার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। (দ্বাদশ অধ্যায়)। ইতিমধ্যে হজরত মোহাম্মদের ভাবী স্ত্রী বীবী খদীজার সহিত এক বণিকের বিবাহ হইয়া গেল (ত্রয়োদশ অধ্যায়)।

এ দিকে, বীবী আমিনার বিবাহের সূত্র ধরিয়া, তাঁহার শ্বশুর 'নফলঙ্গ' রাজার সহিত আবদুল্লার বিবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে এই বিবাদ যুদ্ধে পর্য্যবসিত হয়। এই যুদ্ধে আবদুল্লা অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিবার জন্য,—

"নৃপতির সৈন্য তবে মারে নানা অস্ত্র। অন্ধকার কৈল বাণে পৃথিবী সমস্ত ॥
শেল শূল শক্তি গদা মুসল মুদ্গর। নারাচ নালিকা খন্ডা পাশ বহুতর ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ আর খুরচন্দ্র মারে। নেজ্ঞা বাজি নেজ্ঞী সম পড়এ চারি ধারে ॥
ঝাকে ঝাকে বরিসএ আবদুল্লা উপর। সংখ্যা নাই বাণ যত ছুটিল লস্কর ॥"

কিন্তু, এত আয়াস স্বীকার ও আয়োজন করিয়াও বীর আবদুল্লাকে 'নফলঙ্গ'রাজ-সৈন্যগণ মারিতে পারিল না। কেন না, অপূর্ব্ব সংগ্রাম-কৌশল ও শৌর্য্যবলে—

"গদা ভ্রমাইয়া বীর যেই দিকে যাএ।
সেই দিকে সৈন্যসেনা ভূমিতে লুটাএ ॥"

পরিশেষে 'নফলঙ্গ'রাজ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন; আবদুল্লা তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু ভ্রাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বশে আবদুল্লা স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট না হইয়া, তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু জেহেলকে সিংহাসনে বসাইলেন (চতুর্দ্দশ অধ্যায়)। আবু জেহেল রাজা হওয়ার পর, ইউসুফ কাহন নামক এক সুদক্ষ জ্যোতিষী পণ্ডিত তাঁহার মন্ত্রী হইল। সে জ্যোতিষ-শাস্ত্র সাহায্যে রাজার শুভাশুভ গণনা করিয়া দেখিল যে, আবদুল্লার ঔরসে ও বীবী আমিনার গর্ভে মোহাম্মদ নামে এক সন্তান জন্মিবে, এবং সেই শিশু—

"এ সব আচার যত কিছু না রাখিব।
মুছলমান করি সব লোক নিস্তারিব॥"

অতএব এই কুলনাশক, ধর্ম্মনাশক, আচার-বিচার-নাশক মোহাম্মদের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে না পারিলে, রাজা আবু জেহেলের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। ইহা শুনিয়া রাজা আবু জেহেল বিচলিত হইলেন, এবং অন্তঃসত্ত্বা বীবী আমিনাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন (পঞ্চদশ অধ্যায়)। যথাসময়ে দূত আমিনার নিকট পৌঁছিল; আমিনা সমস্ত কথা দূত-মুখে অবগত হইলেন, এবং গর্ভস্থ সন্তানের জীবন-নাশের আশঙ্কায় ভীতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন (ষোড়শ অধ্যায়)।

অতঃপর আমিনাকে রাজা আবু জেহেলের নিকট নেওয়া হইল। তখন আমিনা পাঁচ মাস গর্ভবতী। আবু জেহেল তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে ভ্রূণাবস্থাতেই হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং বীবী আমিনাকে হস্তীর পদতলে ফেলিয়া, সর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, পাথরের উপরে আছাড় মারিয়া তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানটিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আবু জেহেল যখন দেখিলেন যে, উদরস্থ শিশুর অলৌকিক ক্ষমতায় তাঁহার সৌভাগ্যবতী মাতার কোনই অনিষ্ট হইল না, তখন তিনি চিন্তাকুল হইয়া ইউসুফ কাহনকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"হস্তিদন্তে সর্পাঘাতে অগ্নিতে দাহন। পাষাণ উপরে মারি উদরে ধাতন॥
কোন মতে না মরিল কুলনষ্টকারী। যুক্তি কর এবে তারে কিরূপেতে মারি॥

রাজা আবু জেহেল হজরত মোহাম্মদকে মারিবার জন্য তদীয় মন্ত্রী ইউসুফ কাহনের সহিত নূতন পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন, বীবী আমিনাও এবারের মত রক্ষা পাইলেন (সপ্তদশ অধ্যায়)। কিন্তু তিনি অকারণে উপর্যুক্ত প্রকারে অপদস্থা ও লাঞ্ছিতা হইয়া, তাঁহার স্বামী আবদুল্লার নিকট আবু জেহেলের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিলেন। ভ্রাতৃভক্ত আবদুল্লা এই বিষয়ে কোন প্রতিবিধান না করিয়া, বীবী আমিনাকে সান্ত্বনা দিলেন যে,—

"তোমার নিকমে বিবি নবি উপজিছে। তানে পরীক্ষিতে প্রভু এতেক করিছে॥
... ...
সাধু সাধু নাম তোর জগতে ঘোষিব। অপার মহিমা তোর ভুবনে বাড়িব॥
নারীর মেলেতে তুমি জানি মহাসতী। আল্লার পরম সখা যে ভাগে উৎপতি॥"

আল্লার প্রেরিত পুরুষ, বিশ্বের মুক্তিদাতা হজরত মোহাম্মদের মাতা হইবেন,—ইহা কম

সৌভাগ্যের কথা নয়। বিশেষতঃ ইতিমধ্যেই এই অলৌকিক পুরুষের মাহাত্ম্যও দেখা গিয়াছে। সুতরাং বীবী আমিনা ভাবী পয়গম্বরের মাতা হইবার আশা ও আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন (অষ্টাদশ অধ্যায়)।

এদিকে রাজা আবু জেহেল ও মন্ত্রী ইউসুফ কাহন হজরত মোহাম্মদকে মারিবার জন্য পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, আমিনার প্রসবকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে পাহারা দিবার জন্য একজন ধাত্রীকে নিযুক্ত করা হউক, এবং তাহাকে আদেশ দেওয়া হউক যে,—

"যেই ক্ষণে হএ শিশু আমিনার ঘরে। সেই ক্ষণে শিশু আনি ভেটাইবা মোরে॥
দাগা দিয়া গুপ্ত যদি কর কদাচিত। অগ্নিএ দহিমু তোরে বংশের সহিত॥

এহেন কঠোর আদেশ সহ একজন ধাত্রীকে বীবী আমীনার নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হইল। ধাত্রী চৌদ্দ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিল যে, আমিনা সন্তান প্রসব করিতেছে না, তখন সমস্ত ব্যাপার সে আবু জেহেলকে নিবেদন করিল। আবু জেহেল জোর করিয়া সন্তান প্রসব করাইতে আদেশ দিলেন। ধাত্রী রাজাজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, গর্ভস্থ মোহাম্মদের অলৌকিকতার আভাসে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান হইল (উনবিংশ অধ্যায়)।

হজরত মোহাম্মদ অষ্টাদশ মাস মাতৃজঠরে ছিলেন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় উপস্থিত হইল। এই সময়ে, যাহাতে শয়তান তাহার স্বভাবসিদ্ধ দুষ্কৃতের দ্বারা হজরতের জন্মের পবিত্রতা নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি মাতৃজঠর হইতে আল্লার নিকট অনুরোধ করিয়া শয়তানকে বন্দী করাইলেন (বিংশ অধ্যায়)। শয়তান অনন্যোপায় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল (একবিংশতি অধ্যায়), আর সহস্র সহস্র ফেরেস্তার রক্ষকতায় হজরত ভূমিষ্ঠ হইলেন। এইবার ধাত্রী মহা সমস্যায় পড়িয়া গেল। সৌভাগ্য-ক্রমে ইতিপূর্ব্বে তাহারও একটি সন্তান প্রসূত হয়। ধাত্রী তাড়াতাড়ি হজরত মোহাম্মদের জন্মের পর, তাঁহার—

"নাড়ি ছেদ করি ধাত্রি শিশু লৈয়া কোলে। ভকতি মিনতি করি রছুলেত বোলে॥
তোমার বদলে আমি নিজ পুত্র দিমু। পরম জতনে তোমা লুকাইয়া রাখিমু॥"

অমনি জিব্রাইল্ অন্তরীক্ষ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে, আবু জেহেলের হাতে ধাত্রী-পুত্র নিহত হইবে। ধাত্রী তাহাতে বিচলিত হইল না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে,—

"আপনার ঘরে ধাত্রি রছুলক থুইল।
আপনার শিশু লইয়া সত্বরে চলিল॥"

ঠিক এই সময়ে, ধাত্রীর অবিদ্যমানে হালিমা নাম্নী এক রমণী ধাত্রীর ঘরে আসিল। এই রমণীটীর পিত্রালয় মক্কাদেশে এবং শ্বশুরালয় বসরায় ছিল। সে ধাত্রীর ঘরে পৌছিয়া দেখিল যে, শিশু মোহাম্মদ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মনে মনে কহিল,—"যদি এই শিশু আমার হইত"। অমনি—

"হালিমাএ এহি মতে মনেত ভাবিতে। জিবরিল ডাকি বোলে থাকিয়া শূন্যেতে॥
... ...
এহি শিশু দিল তোমা প্রভু নিরঞ্জন। পরম যতনে শিশু করহ পালন॥
হালিমাএ শুনিয়া হৈল আনন্দিত মন। শিশু লৈয়া সোয়ামীর ঘরে গেল ততক্ষণ॥"

এইরূপে শিশু মোহাম্মদ বসরায় নীত হইলেন। তথায় হালিমা ও তাহার স্বামীর আদরে তিনি পরম যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন (দ্বাবিংশ অধ্যায়)। ধাত্রী তাহার সদ্যোজাত শিশুটিকে আবু জেহেলের নিকট পৌছাইয়া দিল। এই শিশুর নাম আহ্মদ্। আবু জেহেল আহ্মদ্কে মোহাম্মদ্ মনে করিয়া শিলার উপরে আছাড়িয়া মারিবার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু তাহাতে শিশুর মৃত্যু হইল না। পরিশেষে আহমদ্ ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করিল। আবু জেহেল মনে করিলেন, হজরত মোহাম্মদ মরিয়াছে। (ত্রয়োবিংশ অধ্যায়)।

ইতিমধ্যে হজরত মোহাম্মদের মাতা বীবী আমিনা পরলোক গমন করিলেন। (চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়)। আবু জেহেল প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, তিনি হজরত মোহাম্মদকে হত্যা করিয়াছেন। আবু তালেবপ্রমুখ কোরেশবংশীয় প্রধানগণ এই কথা জানিতে পারিয়া হজরত মোহাম্মদের জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা বসরা হইতে হালিমা, অপোগণ্ড শিশু হজরত মোহাম্মদকে লইয়া, কোরেশবংশীয় প্রধানদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া,—

"তা সবার আগে ধাঞি শিশু লইয়া যাইতে। নিজরূপ রছুলে ধরিল অলক্ষিতে ॥
পূর্ণমাসী চন্দ্র যেন উজ্জ্বল বদন। উচ্চ নাসাদণ্ড কোটি পঙ্কজ লোচন ॥
... ...
ননীর পুতলী তনু প্রাতঃসূর্য্য প্রাএ। হেরিতে তাহার অঙ্গ চক্ষে ঝিম খাএ ॥
... ...
মৃণাল জিনিয়া বাহু অধিক সুঠাম। রিপুকুলহতকারী বজ্রের সমান ॥
... ...
সিংহ জিনি মধ্যভাগ খিন অতিশএ। গজশুণ্ড জিনি উরু অতি স্থূলস্বএ ॥
... ...
শির পরে মেঘ যত চক্রপ্রায় হইয়া। সূর্য্য জ্যোত না লাগে অঙ্গে ছায়াহীন কায়া ॥
এহি মতে রূপ দেখি শিশুর লক্ষণ। আবু তালিব আদি সচকিত মন ॥"

শিশু হজরত মোহাম্মদ স্ববংশীয় কোরেশ-প্রধানদের সম্মুখে এহেন ভাবে নিজরূপ ব্যক্ত করায়, কোরেশেরা বুঝিল যে, তখনও হজরত বাঁচিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের সমস্ত উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইল, এবং তাহারা নিতান্তই সন্তুষ্ট হইল (পঞ্চবিংশ অধ্যায়)।

অতঃপর হালিমা, শিশু মোহাম্মদকে লইয়া বসরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল মোহাম্মদকে হালিমার নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেল (ষড্বিংশ অধ্যায়)। জিব্রাইল যথাকালে হজরতকে মক্কায় তাঁহার পিতামহের নিকট পৌছাইয়া দিল। কোরেশগণ আবু জেহেলের ভয়ে হজরতকে লুকাইয়া রাখিল (সপ্তবিংশ অধ্যায়)। হজরত গুপ্তভাবে কোরেশদলে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে, তিনি মাঠে অপরাপর কোরেশবালকদের সহিত ছাগ চড়াইতে যাইতেন। একদা ছাগ-চারণ-মাঠে তাঁহার নিকট জিব্রাইলের আবির্ভাব ঘটিলে,—

"জিবরিলে বোলে শুন হুকুম আল্লার। আজ্ঞা হৈছে তোমা হতে পিত্ত কাটিবার ॥
ফর্ম্মান শুনিয়া নবি ধ্যানেতে রহিল। অলক্ষিতে জিবরিল পিত্ত নিকালিল ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যজিল সকল। থাকে তন পয়গম্বর হইল নির্ম্মল ॥"

এইরূপে হজরত মোহাম্মদ শৈশবেই জিব্রাইল্ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধীকৃত হইলেন। তাঁহার পঞ্চভূত-নির্ম্মিত মানব-শরীর হইতে ভূত-সঞ্জাত দোষাদি পরিষ্কৃত হইল। সুতরাং, তিনি মর্ত্ত্যের মানব হইলেও, দেহধারী অবস্থাতেই তাঁহার দেবত্ব প্রাপ্তির পথ আরও পরিষ্কৃত হইল (অষ্ট-বিংশ অধ্যায়)।

এই ঘটনার পর, রাজা আবু জেহেলের সহিত হজরত মোহাম্মদের শত্রুতা আরম্ভ হয়। ফলে, কোরেশ-প্রধান আবু তালেব নিহত হইলেন বটে, কিন্তু আবু জেহেল হজরতের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না। কোনরূপে হজরত মোহাম্মদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, পরিশেষে আবু জেহেল শত্রুতা ত্যাগ করিয়া, উদারপন্থী হইয়া প্রচার করিলেন যে,—

"কেহ বোলে রাম ভাব কেহ বোলে হরি। কেহ বোলে কৃষ্ণ ভাব তবে ভব তরি॥
কেহ বোলে ব্রহ্মনাম করহ স্মরণ। কেহ বোলে ধ্যানে রহ অতীত লোচন॥
কেহ বোলে কৃষ্ণ ভাব একচিত্ত হইয়া। পরম আনন্দে যাইবা শমন তরিয়া॥
অন্তকালে ঔষধ ইহা বিনে নাই। আবু জাহিলে বোলে বড় জনে ভাই॥"

(উনত্রিংশ অধ্যায়)।

হজরত মোহাম্মদে বঙ্গীয়ত্ব আরোপ

তার পর, ত্রিংশ অধ্যায় হইতে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, নানা ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক গল্প গুজবের ভিতর দিয়া, অনেক কথাই বলা হইয়াছে। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্য প্রচার করাই এই বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সুদীর্ঘ বর্ণনার অধিকাংশ স্থানে হজরত মোহাম্মদের ধর্ম্ম-প্রচার-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের বর্ণিত ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন তিনি বাঙ্গালা দেশের হিন্দুদের মধ্যেই প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছিলেন। তাঁহাকে আরবী বা তাঁহার প্রচারক্ষেত্রকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আরব বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেন বাঙ্গালীর পোষাকেই গৃহে থাকেন এবং যখন ধর্ম্ম-প্রচার করিতে বহির্গত হন, কেবল তখনই তিনি মাথায় 'দস্তার' অর্থাৎ পাগড়ী বাঁধেন, গায়ে 'জুব্বা' নামক আল্খেল্লাজাতীয় দীর্ঘ জামা পড়েন, দক্ষিণ হস্তে 'তস্‌বি' বা জপমালা ও বাম হস্তে 'আসা' বা যষ্টি ধারণ করেন, তাঁহার পরিধানে 'ইজার' বা পাজামা ও পায়ে এক জোড়া খড়ম থাকে। এইরূপে সজ্জিত হইয়া, তিনি যখন বৃদ্ধের ন্যায় 'তস্‌বি' জপিতে জপিতে অগ্রসর হন, তখন 'কাফের' বা বিধর্ম্মীরা তাঁহার দিকে তাকাইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে[১]। কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য্য করিয়া যান। একদা হজরত আবু বকর সিদ্দিক মুসলমান হইলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে সকলে মিলিয়া—

১। "তাহা শুনি পএগম্বর চলিল তখন। মুছলমানী ভেস করি পরিল বসন॥
শিরেত দস্তার বান্ধে জুব্বা দিল গাএ। ডাইন হাতে তছবি জপে আসা হাতে বাঁএ॥
ইজার পিন্ধিল নবি পিলুহৃদ (?) করি। পাতার উপরে গিরি বন্দ লইল ঘিরি (?)॥
পাএত পরিল নবি খড়ম এক জোড়া। দেখিতে তাহান ভেস যেন মত বুড়া॥
তছবি জপিয়া নবি যাএ ধীরে ধীরে। রছুলেরে দেখি হাসে যতেক কাফিরে॥ (৭৩-১)

"ধুতি উতারিয়া তারে ইজার পরাইল। টিকী মুড়াইয়া তারে শিরে টুপি দিল॥
গিলাপ কাড়িয়া তারে পরাইল নিমা। মুছলমান কৈল তারে পড়াই কলিমা॥

(৪২শ অধ্যায়)

এইরূপে আরবের অধিবাসীরা হজরতের প্রচারে ধুতি, টিকী, চাদর (গিলাপ) ছাড়িয়া কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল। আবার দেখিতে পাই, তিন জন ব্রাহ্মণ ইস্‌লাম গ্রহণ করিল। দীক্ষা গ্রহণের পর তাহাদের অনুষ্ঠানের নমুনা এইরূপ,—

"এহি মতে তিন দ্বিজ মুছলমান হৈল। পুরাণ করিয়া রদ কোরাণ লইল॥
মূর্ত্তিপূজা রদ করি নমাজ পড়ে নিতি। হরির নাম রদ করি কলেমা করে স্থিতি॥
কৃষ্ণনাম রদ করি বোলে মোহাম্মদ। টিকী মুড়াইয়া শিরে টুপি দিল ছদ॥
কৃষ্ণনাম রদ করি আল্লার যে নাম। সকল ত্যজিয়া তারা লৈল এহি কাম।"

(৫৯-১)

আরব (?) দেশের ব্রাহ্মণত্রয় ত এই ভাবে মুসলমান হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের আত্মীয়-স্বজন হিন্দু থাকিয়া যাইবে, এ কথা তাহাদের সহ্য হয় নাই। তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকেও স্বদলে টানিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের আত্মীয়েরা নব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না লইয়া, তাহা গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাই, নব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে—

"এহি তিন দ্বিজ বোলে শুন জ্ঞাতিগণ। কোরান পুরাণে করি আতশে স্থাপন॥
হুতাসনমুখ হতে যেবা বাহুড়িব। সর্ব্বজন মিলি তারে পঠন পড়িব॥
এহি বাক্যে অঙ্গীকার করে সর্ব্বজন। কোরান পুরাণে কৈল আতশে স্থাপন॥
পুরাণ পুড়িয়া গেল কোরান বাহুড়িল। কোরান বড় হৈল মানিয়া লইল॥" (৫৯-২)

ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু, মুসলমান হইয়া, কি ভাবে তাহার আত্মীয় স্বজনকেও মুসলমান করিতে চেষ্টা করিত, ইহা হইতে আমরা তাহার আভাস পাইতেছি। ধর্ম্ম-প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এহেন যুক্তির বহর দেখিয়া কাহার না হাসি পায়? অথচ এইরূপেই এ দেশে মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। *

মুহম্মদ এনামুল হক

---

* বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই পৌষ, অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল

স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি আমরা সকলেই শৈশবে আয়ত্ত করিয়াছি। ইহা এত সহজ যে, ইহার উদ্ভাবন আয়াসসাধ্য হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। বরং মনে হয়, যখন চিহ্নের সাহায্যে সংখ্যালিখনের আরম্ভ হইয়াছিল, তখনই এই সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। প্রাচীন মিশর, বেবিলন, গ্রীস ও চীনদেশে এবং রোমকরাজ্যে পণ্ডিতের অভাব ছিল না, গণকেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহারাও এই সহজ সঙ্কেতটি বাহির করিতে পারেন নাই। কোন্ প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী এই সঙ্কেতটি কখন্ উদ্ভাবন করিয়া মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহা নির্ণয় করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য স্থানীয়-মানতত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ তৎসহ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, জৈনগ্রন্থ অনুযোগদ্বারসূত্র ও ব্যবহারসূত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যা লিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্ঞাত ছিল[১]। কৌটিল্য স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন কি না, পরে আলোচিত হইবে। কৌটিল্যের অন্যূন ৭৫০ বৎসর পরে ৪৭৬ খ্রীষ্টীয় অব্দে বৃদ্ধ আর্য্যভট জন্মগ্রহণ করেন। এই ৭৫০ বৎসরের মধ্যে "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" ও "পিঙ্গলছন্দঃসূত্র" কেবল এই দুইখানি গ্রন্থে দত্ত মহাশয় স্থানীয়মান-তত্ত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন[২]। তাঁহার মতে সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভট্টোৎপল বরাহমিহির-রচিত বৃহৎসংহিতার স্বপ্রণীত টীকায় "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রয়ঃ।
ভানাং চতুর্য্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ভট্টোৎপলের টীকার সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাই যে, দত্ত মহাশয় দুইটি ভুল করিয়াছেন। বচনটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'রাত্রয়ঃ' স্থলে "রাত্রিপাঃ" হইবে। বচনটির প্রথম

১। The Jaina School of Mathematics, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, Vol XXI (1929), No. 2, p 139.

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (বঙ্গাব্দ ১৩৩৫) ১ম সংখ্যা, ১৭ পৃষ্ঠা।

পঙ্‌ক্তিতে খ (০), খ (০), অষ্ট (৮), মুনি (৭), রাম (৩), অশ্বি (২), নেত্র (২), অষ্ট (৮), শর (৫) এবং রাত্রিপ বা চন্দ্র (১) দ্বারা ১৫৮২২৩৭৮০০ সংখ্যাটি ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব বচনটির রচনাকালে স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি প্রচলিত ছিল—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বচনটি "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ভট্টোৎপল লিখেন নাই। এই বচনটির অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন,—

"তথা চ পুলিশসিদ্ধান্তে পঠ্যন্তে নক্ষত্রপরিবর্ত্তাঃ।"

[বৃহৎসংহিতা, ৺সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠা]

দত্ত মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, পুলিশসিদ্ধান্তের লাটকৃত সংস্করণের পরে আরও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভট্টোৎপল ঐ প্রকারের দুইখানি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া একটাকে বলিয়াছেন "পুলিশসিদ্ধান্ত," অপরটির নাম দিয়াছেন "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত"।[৩]

অতএব মনে হয় যে, ভট্টোৎপল উক্ত বচনটি "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে উদ্ধৃত করেন নাই, স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেত প্রচলিত হওয়ার পরে পুলিশ-সিদ্ধান্তের যে সকল সংস্করণ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের কোনও একটি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মূলপুলিশসিদ্ধান্তের রচনাকালে অর্থাৎ "খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকেও সংখ্যানির্দ্দেশক নাম স্থানীয়মান সহকারে ব্যবহৃত হইত"—দত্ত মহাশয়ের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে।

পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে দুই বা ততোধিক সংখ্যাবাচক শব্দকে সমাসবদ্ধ করিয়া সংখ্যাজ্ঞাপক অনেক শব্দ রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের একটিতেও স্থানীয়মানতত্ত্ব ব্যবহৃত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ভূতেন্দ্রিয়বস্বৃষি' শব্দটি লওয়া যাউক। ইহা দ্বারা ভূত (৫)+ইন্দ্রিয় (৫)+বসু (৮)+ঋষি (৭) বা ২৫ এই সংখ্যাটি বুঝান হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ের ৩০ সূত্রে 'ক্রৌঞ্চপদা' নামক ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে ২৫টি অক্ষর থাকিবে এবং ৫টি, ৫টি, ৮টি ও ৭টি অক্ষরের পর যতি হইবে, ইহাই ঐ শব্দটি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের ২৯ ও ৩০ এই দুইটি সূত্র হইতে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, তৎকালে শূন্যচিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"স্থানীয়-মানতত্ত্ব ব্যতীত শূন্যচিহ্ন পরিকল্পনা করা নিরর্থক। বস্তুতঃ তাহারা উভয়ে সহজাত।"[৪] খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বেবিলনে শূন্য বুঝাইতে চিহ্নবিশেষ ব্যবহৃত হইত[৫]। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকার ময়জাতির মধ্যে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রচিহ্ন দ্বারা শূন্য বুঝান

৩। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (বঙ্গাব্দ ১৩৩৫), ১ম সংখ্যা।

৪। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা, ২৩পৃঃ।

৫। Cajori, A History of Mathematics (1922), p 5.
Peet, The Rhind Mathematical Papyrus (1923) p. 28

হইত। কেহ কেহ বলেন, বেবিলনবাসিগণের ও ময়জাতির সংখ্যালিখনে গুরুতর দোষ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয়মানতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান লেখক অন্যত্র[৬] এই মত খণ্ডন করিয়াছে। স্থানীয়মানতত্ত্ব এবং ঐ গুরুতর দোষ একত্র থাকিতে পারে না। আজকালকার ন্যায় পূর্ব্বেও কোনও স্থানে অঙ্কের অভাব হইলে একটি চিহ্ন ঐ স্থানে ব্যবহৃত হইত। ঐ চিহ্নটিই শূন্যচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক গণক টলেমী শূন্যচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন[৭]। কিন্তু তিনি স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। স্থানীয়মানতত্ত্ব ব্যতীতও ভারতে এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি বুঝাইতে কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। সেইগুলিই কালক্রমে পরিবর্ত্তিত আকারে স্থানীয়মান সহকারে ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব কেবল এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্নের অস্তিত্ব হইতে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইরূপ কেবল শূন্য চিহ্নের অস্তিত্ব হইতেই স্থানীয়মানতত্ত্বের জ্ঞান অনুমান করা উচিত নহে। আয় ও ব্যয় সমান হইলে তহবিলে কিছুই থাকে না অথবা কোনও স্থানে অঙ্কের অভাব আছে—ইহা বুঝাইতে কোনও চিহ্নের ব্যবহার স্থানীয়মানতত্ত্বের উদ্ভাবনের পূর্ব্বেও প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। অতএব স্থানীয়মানতত্ত্ব ও শূন্য চিহ্ন সহজাত মনে করিবার কোনও কারণ নাই। দত্ত মহাশয়ের ন্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শূন্য চিহ্ন ও স্থানীয়মানতত্ত্ব সহজাত বলিয়া একটি ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন। তাই পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের যে অংশে শূন্যচিহ্নের উল্লেখ আছে, সেই অংশকে তাঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন[৮]। বস্তুতঃ এই ছন্দঃসূত্রে শূন্য চিহ্নের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করা যেমন ভ্রমাত্মক, তৎকালে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমান করাও তেমনই অসঙ্গত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৌটিল্যের পরে ৭৫০ বৎসরের মধ্যে কোনও গ্রন্থে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিলালিপিতে (বা তাম্রলিপিতে) স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে গুর্জ্জর দেশে ৫৯৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে অর্থাৎ কৌটিল্যের সময়ের অন্ততঃ ৯০০ বৎসর পরে। এমন কি, কৌটিল্যের কর্ম্মভূমি মগধের অন্তর্গত রোটাসের শিলালিপিতে শকাব্দসংখ্যা ১৩২ নিম্নলিখিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে,—

"নবতিনবমুনীন্দ্রৈর্ব্বাসরাণামধীশৈঃ।
পরিকলয়তি সংখ্যাং বৎসরে সাহশাকে॥"[৯]

৬। Did the Babylonians and the Mayas of Central America possess place-value arithmetical notations ?—Bulletin of the Calcutta Mathematical Society. Vol. XXII (1930), pp. 99-102.

৭। Sir Thomas Heath, A History of Greek Mathematics, Vol. I. P. 45.

৮। The History of Indian Literature by Weber (English Translation by Mann and Zachariae), p. 256, foot-note 281.

৯। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, June, 1876, p. 111.

নবতি (৯০), নব (৯), মুনি (৭), ইন্দ্র (১৪) ও 'বাসরদিগের অধীশ' বা সূর্য্য (১২), এই কয়েকটি সংখ্যার সমষ্টিরূপে ১৩২ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই সকল কারণে মনে হয়, কৌটিল্যও স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন না। ইহার বিরুদ্ধে দত্ত মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

দত্ত মহাশয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে স্থানীয়মান অনুসারে ব্যক্ত একটি সংখ্যারও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক ঐ অর্থশাস্ত্রে সংখ্যা এই ভাবে ব্যক্ত হয় নাই।

"অক্ষপটলে গাণনিক্যাধিকার" নামক প্রকরণে লিখিত আছে,—"ত্রিশতং চতুঃপঞ্চাশচ্চাহোরাত্রাণাং কর্ম্ম সংবৎসরঃ।" এ স্থলে তিন শত চুয়ান্ন স্থানীয়মানতত্ত্ব অনুসারে ব্যক্ত হয় নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "সমবৃত্তা" নামক তুলাদণ্ডের নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে,—

> "পঞ্চত্রিংশৎপললোহাং দ্বিসপ্তত্যঙ্গুলায়ামাং সমবৃত্তাং কারয়েৎ। তস্যাঃ পঞ্চপলিকং মণ্ডলং বদ্ধ্বা সমকরণং কারয়েৎ। ততঃ কর্ষোত্তরং পলং পলোত্তরং দশপলং দ্বাদশপঞ্চদশবিংশতিরিতি কারয়েৎ। তত আশতাদ্দশোত্তরং কারয়েৎ। অক্ষেষু নান্দীপিনদ্ধং কারয়েৎ।"

একমাত্র "অক্ষেষু" শব্দটির প্রয়োগের উপরই দত্ত মহাশয়ের মত প্রতিষ্ঠিত। এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন টীকাকার ভট্টস্বামী ও মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর মতে এই শব্দটী দ্বারা ৫, ১০, ১৫ ইত্যাদি ৫এর গুণিতক সংখ্যাগুলি বুঝাইতেছে। দত্ত মহাশয়ের মতে এই শব্দটি দ্বারা এ স্থলে ২৫, ৩৫, ৪৫ ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতেছে। আমার মনে হয়, দত্ত মহাশয়ের ব্যাখ্যাই এ স্থলে প্রযোজ্য, অপর ব্যাখ্যা এ স্থলে যুক্তিযুক্ত নহে। স্থানীয়মানতত্ত্বের ব্যবহার করিয়া ২৫, ৩৫, ৪৫, ৫৫ ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতে 'অক্ষকর', 'অক্ষাগ্নি,' 'অক্ষবেদ', 'অক্ষবাণ' ইত্যাদি সংখ্যা-জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। যখন অর্থশাস্ত্রের অপর কোন স্থলে স্থানীয়মানতত্ত্ব আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই, তখন "অক্ষেষু" এই শব্দটি দ্বারা অক্ষকর ইত্যাদি সংখ্যা-বোধক শব্দ বিবক্ষিত হইতেছে মনে করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে উল্লিখিত বর্ণনার প্রথমেই "পঞ্চত্রিংশৎ" শব্দটি আছে। উহার পরিবর্ত্তে কৌটিল্য "অক্ষাগ্নি' কিংবা 'অক্ষরাম' কিংবা এইরূপ অন্য কোনও শব্দ ব্যবহার করেন নাই। যদি কৌটিল্য 'অক্ষেষু' শব্দের পরিবর্ত্তে ইহার সমানার্থক 'পঞ্চসু' শব্দ ব্যবহার করিতেন, তবে উহা দ্বারা পঞ্চবিংশতি, পঞ্চত্রিংশৎ, পঞ্চচত্বারিংশৎ ইত্যাদি সংখ্যাই বুঝাইত বলিয়া তৎকালে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইত না। যখন কৌটিল্যের সময় স্থানীয়মান সহকারে শব্দ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করিবার প্রমাণ অন্যত্র কোথায়ও পাওয়া যায় না, তখন একমাত্র "পঞ্চসু"র সমানার্থক "অক্ষেষু" শব্দের প্রয়োগ হইতে তৎকালে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না।

অনুযোগদ্বারসূত্র ও ব্যবহারসূত্র নামক জৈন গ্রন্থ দুইখানি দেখিবার সুযোগ বর্ত্তমান লেখকের হয় নাই। তথাপি দত্ত মহাশয়ের লেখা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ দুইখানি গ্রন্থে তৎকালে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটির অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অনুযোগদ্বারসূত্রে পৃথিবীর মনুষ্য-সংখ্যা এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে,— [১০]

(১) "কোটি কোটি ইত্যাদি এককে ব্যক্ত হইলে মনুষ্যসংখ্যা উনত্রিশটি স্থান অধিকার করে; অথবা

(২) ইহার স্থান-সংখ্যা চব্বিশের অধিক ও বত্রিশের কম; অথবা

(৩) দুইয়ের ষষ্ঠ বর্গকে দুইয়ের পঞ্চম বর্গদ্বারা গুণ করিলে মনুষ্যসংখ্যা পাওয়া যায়; অথবা,

(৪) মনুষ্যসংখ্যাকে দুই দ্বারা ছিয়ানব্বই বার ভাগ করা যায়।"

সংখ্যাটি ২৯টি স্থান অধিকার করে—ইহাই যদি স্থির হইল, তবে স্থানসংখ্যা ২৪এর উপর এবং ৩২এর নীচে, এইরূপ পরে লিখিবার উদ্দেশ্য বা আবশ্যকতা কি? সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্ব্বেও অঙ্ক বা চিহ্নের সাহায্যে সংখ্যা লিখিতে স্থান লাগিত, এ স্থলে যে সেইরূপ স্থান বুঝাইতেছে না, তাহার প্রমাণ কি? যদি সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি তখন জানা থাকিত, তবে মনুষ্যসংখ্যা উক্ত সঙ্কেত অনুসারে ব্যক্ত হইল না কেন? যদি ঐরূপে ব্যক্ত হইত, তবে মনুষ্যসংখ্যা কত ছিল, সঠিক জানা যাইত। কিন্তু যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সংখ্যার সঠিক ধারণা জন্মে না।

যদি দত্ত মহাশয় মূল সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা দিতেন, তবে অন্যরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইতে পারে কি না, বুঝিতে পারা যাইত। মূল সূত্রটির অভাবে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে লিখিত ভারতীয় জৈনগ্রন্থে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটির তৎকালীন অস্তিত্বের প্রমাণ থাকে, তবে ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে যে, ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বে ভারতে ঐ সঙ্কেত অন্য কোথাও ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

লেখকের মত ও উহার প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মূল-পুলিশসিদ্ধান্তের কাল অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্তও স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হয় নাই। পক্ষান্তরে বৃদ্ধ আর্য্যভটের পরে রচিত জ্যোতিষের গ্রন্থগুলিতে এই সঙ্কেতটির অস্তিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আর্য্যভটীয় নামে যে গ্রন্থ আজকাল চলিতেছে, তাহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে বৃদ্ধ আর্য্যভট কর্ত্তৃক রচিত। উহার গণিতপাদের দ্বিতীয় আর্য্যাটি এই,—

১০। Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, Vol. XXI (1929), p. 136.

একং দশ চ শতঞ্চ সহস্রমযুতনিযুতে তথা প্রযুতম্।
কোটার্ব্বুদঞ্চ বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ॥

এই আর্য্যাটিতে বৃদ্ধ আর্য্যভট প্রথমে এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, কোটি ও বৃন্দ, এই দশটি স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, স্থানের মান ও নাম বুঝাইতে একই শব্দ ব্যবহৃত হইবে। পরে "স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ" অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানের মান উহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানের মানের দশগুণ, এই তত্ত্বটি দ্বারা পরবর্ত্তী স্থানগুলির মান ও নাম কিরূপ হইবে, তাহারই আভাস দিয়াছেন। অতএব স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি উক্ত আর্য্যাটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত সঙ্কেতটি আর্য্যভটীয়তেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উহার উদ্ভাবয়িতা বৃদ্ধ আর্য্যভট,—এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। হয় ত উহা কিছু পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল এবং আর্য্যভট পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে সঙ্কেতটি শিখিয়াছিলেন। এই সন্দেহের মীমাংসার নিমিত্ত আর্য্যভটীয় গ্রন্থখানির কিছু পরীক্ষা করা যাউক।

সপ্তম শতাব্দীর ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

আর্য্যাষ্টশতে পাতা ভ্রমন্তি দশগীতিকে স্থিরা পাতাঃ।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটীয়ের উল্লেখ করেন নাই, দশগীতিক ও আর্য্যাষ্টশতের উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্যভটীয়ে চারিটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টিকে গীতিকাপাদ, দ্বিতীয়টিকে গণিতপাদ, তৃতীয়টিকে কালক্রিয়াপাদ ও চতুর্থটিকে গোলপাদ বলা হয়। ব্রহ্মগুপ্তের লেখায় দশগীতিক দ্বারা আর্য্যভটীয়ের প্রথম অধ্যায় এবং আর্য্যাষ্টশত দ্বারা অপর তিনটি অধ্যায় বুঝাইতেছে। এই তিনটি অধ্যায়ে মোট ১০৮টি আর্য্যা আছে বলিয়া উহাদের নাম আর্য্যাষ্টশত হইয়াছে। আর্য্যভট শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ গোলপাদে 'পাত সকল ভ্রমণ করে' এই কথা লিখিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত গোলের বা গোলপাদের উল্লেখ না করিয়া আর্য্যাষ্টশতের উল্লেখ করিলেন কেন? একই পঙ্‌ক্তিতে একই কারণে এক স্থানে 'দশগীতিক' বা প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখ এবং অপর স্থলে নির্দ্দিষ্ট গোলপাদের পরিবর্ত্তে উহার সঙ্গে আরও দুইটি অধ্যায় মিশাইয়া আর্য্যাষ্টশতের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, দশগীতিক ও আর্য্যাষ্টশত একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নহে, উহারা পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ। ল্যাসেনও এইরূপ মনে করেন।[১১] প্রচলিত আর্য্যভটীয় সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহাতে চারিটি অধ্যায় আছে। অতএব গ্রন্থারম্ভে কেবল একবার মাত্র ইষ্টদেবতার বন্দনা থাকিবে অথবা প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভে একবার করিয়া চারিটি অধ্যায়ের আরম্ভে মোট চারি বার ইষ্টদেবতার বন্দনা

১১। The Literary Remains of Dr. Bhau Daji edited by Rama Chandra Ghosha (Calcutta, 1888), pp. 224—225

থাকিবে। কিন্তু বস্তুতঃ কেবল দুই বার বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আর দুইটী বন্দনার আর্য্যা কি এ পর্য্যন্ত উদ্ধার করা হয় নাই? আর্য্যভটীয়ের কোনও আর্য্যা লুপ্ত থাকিলেও বন্দনার আর্য্যা লুপ্ত নাই, ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, যে দুইটি বন্দনার আর্য্যা আছে, তাহাদের একটিতে দশগীতিকের বা প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং অপরটিতে অবশিষ্ট তিন অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় গণিত, কালক্রিয়া ও গোল উল্লিখিত হইয়াছে। বন্দনার আর্য্যা দুইটি এই,—

"প্রণিপত্যৈকমনেকং কং সত্যাং দেবতাং পরং ব্রহ্ম।
আর্য্যভটস্ত্রীণি গদতি গণিতং কালক্রিয়াং গোলম্ ॥"
"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণভগণান্ নমস্কৃত্য।
আর্য্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্ ॥"

প্রথম আর্য্যাটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অর্থ এই,—"আর্য্যভট গণিত, কালক্রিয়া ও গোল, এই তিনটি বিষয়ের বর্ণনা করিতেছেন।"

অতএব যে অংশে এই তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রথমে অর্থাৎ গণিতাধ্যায়ের প্রথমে এই আর্য্যাটি থাকা উচিত। কিন্তু আর্য্যভটীয়ের কার্ণ সাহেবের সংস্করণে ও উদয়নারায়ণ সিংহের সংস্করণে দশগীতিক বা গীতিকাপাদের প্রথমে এই আর্য্যাটি দেওয়া হইয়াছে।

বন্দনার দ্বিতীয় আর্য্যাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আর্য্যভট ব্রহ্মাকে এবং পৃথিবী, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনির ভগণদিগকে নমস্কার করিয়াছেন। গীতিকাপাদের প্রথম আর্য্যাটিতে বন্দনা, দ্বিতীয়টিতে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সাহায্যে সংখ্যালিখনের সঙ্কেত এবং তৃতীয়টিতে পৃথিবী. রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির যুগভগণের সংখ্যা দৃষ্ট হয়। অতএব গীতিকাপাদের প্রথমে বন্দনার দ্বিতীয় আর্য্যাটি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আর্য্যভটীয়ের উল্লিখিত দুইটি সংস্করণেই গণিতপাদের প্রথমে এই আর্য্যাটি প্রদত্ত হইয়াছে।

অতএব মনে হয়, বর্ত্তমানে প্রচলিত গীতিকাপাদ একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ; ইহার নাম ছিল দশগীতিক। গণিত, কালক্রিয়া ও গোল, এই তিনটি বিষয় যে তিন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, সেই তিনটি অধ্যায় লইয়া আর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—ইহারই নাম ছিল আর্য্যাষ্টশত। সুতরাং ইহাই মনে হয় যে, প্রচলিত আর্য্যভটীয় একখানি গ্রন্থ নহে, ইহা দশগীতিক ও আর্য্যাষ্টশত, এই দুইখানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমাবেশে উৎপন্ন।

আর্য্যাষ্টশতের কালক্রিয়াধ্যায়ের দশম আর্য্যাটি এই,—

"ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ ॥"

ইহার অর্থ এই,—যখন বর্ত্তমান যুগের তিন চতুর্থাংশ (অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর) অতীত হওয়ার পর আরও ষাটগুণ ষাট অব্দ (অর্থাৎ কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর) অতীত, হইয়াছে, তখন আমার জন্মের পর ২৩ বৎসর অতীত হইয়াছে।

পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। অতএব (৩৬০০-৩১০১) বা ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দে আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর ছিল। এই আর্য্যাটি হইতে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, আর্য্যভট ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দে ২৩ বৎসর বয়সে আর্য্যাষ্টশত রচনা করেন।

দশগীতিক রচনাকালে আর্য্যভট সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান কালে প্রচলিত সঙ্কেতটি জানিতেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দশগীতিকের দ্বিতীয় আর্য্যাটিতে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিবার একটি সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। এই আর্য্যাটির ব্যাখ্যা ও আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি।[১২] এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আর্য্যাটি হইতে অনুমান হয়, দশগীতিক রচনাকালে আর্য্যভট বুঝিয়াছিলেন যে, (১) এক, দশ, শত ইত্যাদি বুঝাইবার নিমিত্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এবং (২) স্থানগুলি বর্গস্থান (যথা—এক, শত, অযুত ইত্যাদি বর্গসংখ্যার স্থান) ও অবর্গস্থান (যথা—দশ, সহস্র, ইত্যাদি অবর্গসংখ্যার স্থান) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। অতি সঙ্ক্ষেপে সংখ্যা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম বর্গ ও প্রথম অবর্গস্থান অ দ্বারা, দ্বিতীয় বর্গ ও দ্বিতীয় অবর্গস্থান ই দ্বারা, তৃতীয় বর্গ ও তৃতীয় অবর্গস্থান উ দ্বারা, এবং পরবর্ত্তী স্থানগুলি এইরূপে ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ দ্বারা বুঝাইবে, এই নিয়ম করিলেন। একই স্বর দ্বারা একটি বর্গ ও একটি অবর্গস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত ২৫টি বর্গাক্ষর কেবল বর্গস্থান-গুলির জন্য এবং য্, র্, ল্, ব্, শ্, স্, হ্, এই সাতটি অবর্গাক্ষর কেবল অবর্গ স্থানগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত হলন্ত ২৫টি অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে ১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত সংখ্যা এবং য্ হইতে হ্ পর্য্যন্ত ৭টি হলন্ত অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ বুঝিতে হইবে। যথা, ম=২৫, মি=২৫০০, মু=২৫০০০০ ইত্যাদি ; য=৩০, যি=৩০০০, যু=৩০০০০০ ইত্যাদি। এই সঙ্কেতে শূন্য বুঝাইবার জন্য কোনও অক্ষরের আবশ্যকতা হয় না, স্থানগুলিরও কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্রমের প্রয়োজন নাই। "খ্যু" দ্বারা আমাদের বত্রিশ অযুত এবং "ঘৃ" দ্বারা আমাদের চারি নিযুত বুঝায়। অতএব আমাদের চারি নিযুত, বত্রিশ অযুত (অর্থাৎ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার) বুঝাইতে বৃদ্ধ আর্য্যভট "খ্যুঘৃ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এ স্থলে নিযুতের অঙ্ক অযুতের অঙ্কের দক্ষিণে বসিয়াছে। "খ্রি" দ্বারা বিয়াল্লিশ শত বুঝায়, "চ্যু" দ্বারা ছয়ত্রিশ অযুত এবং "ভ" দ্বারা চব্বিশ বুঝায়। অতএব ছয়ত্রিশ অযুত বিয়াল্লিশ শত চব্বিশ বুঝাইতে আর্য্যভট "খ্রিচ্যুভ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এ স্থলে শত আর এককের মধ্যে অযুত বসিয়াছে। কিন্তু স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনে শূন্য চিহ্ন ও স্থানগুলির নির্দ্দিষ্ট ক্রম না থাকিলে চলিবে না। দশগীতিক রচনাকালে যদি আর্য্যভট স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি জানিতেন, তবে তিনি কখনই বর্গস্থান-

---

১২। Was Aryabhata indebted to the Greeks for his alphabetic system of expressing numbers?—Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, Vol. XVII, pp. 195—202.

গুলিতে ১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত সংখ্যাজ্ঞাপক অক্ষরগুলি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেন না। এই ব্যবস্থার ফলে এই সঙ্কেত অনুসারে ব্যক্ত সংখ্যাগুলি দিয়া পাটীগণিতের পরিকর্ম্মগুলি সম্পাদন করা যায় না। কারণ, একই সংখ্যা নানারূপে ব্যক্ত হইতে পারে। যেমন ৩৪কে মঝ, ঝম, ভঞ, ঞভ, বট, টব, ফঠ, ঠফ, পড, ডপ, নঢ, ঢন, ধন, নধ, দত, তদ, থথ, যঘ, এই আঠার প্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। এই সঙ্কেতটির একমাত্র গুণ এই যে, অতি সঙ্ক্ষেপে সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া যদি বর্গস্থানে নয়টি অক্ষর ও অবর্গস্থানে অপর নয়টি অক্ষর ব্যবহার করিবার নিয়ম করা হইত, তাহা হইলেও সংখ্যাগুলি অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইতে পারিত। কিন্তু তিনি এই নিয়ম করেন নাই কেন? তিনি বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন না বলিয়াই করেন নাই।

দশগীতিকে প্রদত্ত বর্ণমালা সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের সঙ্কেতে স্বর দ্বারা স্থানীয়মানের নির্দ্দেশ ও স্থান বিভাগ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, বৃদ্ধ আর্য্যভট হয় ত দশগীতিক রচনাকালে আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন। কিন্তু সমস্ত সঙ্কেতটি বিচার না করিয়া কেবল কোনও কোনও অংশের বিচার দ্বারা ভ্রমশূন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, এ কথা স্মরণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে। নতুবা ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। তিব্বতে তথাকার ভাষায় একুশকে 'দুই—এক', বাইশকে 'দুই—দুই', তেইশকে 'দুই—তিন', চব্বিশকে 'দুই—চার', পঁচিশকে 'দুই—পাঁচ', ছাব্বিশকে 'দুই—ছয়', সাতাইশকে 'দুই—সাত,' আটাইশকে 'দুই—আট' ও উনত্রিশকে 'দুই—নয়' বলে।[১৩] কেবল এই কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দ শুনিলে নিশ্চয়ই মনে হইবে যে, এই সকল শব্দের রচনাকালে তিব্বতে স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই অনুমান ভ্রমাত্মক। কারণ, অন্য কোনও সংখ্যাবাচক তিব্বতদেশীয় শব্দে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।

এতএব দেখা যাইতেছে যে, বৃদ্ধ আর্য্যভট দশগীতিক রচনাকালে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন না, কিন্তু আর্য্যাষ্টশত রচনাকালে উহা জানিতেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৃদ্ধ আর্য্যভট অন্য কাহারও নিকট হইতে এই সঙ্কেতটি শিক্ষা করেন নাই, তিনি নিজেই উহা দশগীতিক রচনার পরে এবং আর্য্যাষ্টশত রচনার পূর্ব্বে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দশগীতিক রচনার অব্যবহিত পরেই এই সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হয় নাই। দশগীতিক প্রচলিত হওয়ার পরে এই সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছে। নতুবা তিনি দশগীতিকে যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারিতেন। তাঁহার ২৩ বৎসর বয়সে আর্য্যাষ্টশত রচিত হইয়াছে। অতএব তাঁহার অন্যূন ২০ বৎসর বয়সে দশগীতিক রচনা হইয়াছে। আর্য্যাষ্টশতের রচনাকাল ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দ। অতএব ৪৯৬ হইতে ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দের মধ্যে বৃদ্ধ আর্য্যভট কর্ত্তৃক স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

১৩। The Encyclopœdia of Pure Mathematics (1847), pp. 373 & 374.

বরাহমিহির-রচিত বৃহজ্জাতকের সপ্তম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে জীবশর্ম্মার নাম দৃষ্ট হয়। টীকাকার ভট্টোৎপল এই শ্লোকের টীকায় জীবশর্ম্মার গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদের একটি বচনে ৫০৪ বুঝাইতে "বেদাভ্রসায়ক" (বেদ = ৪, অভ্র = ০, সায়ক = বাণ = ৫) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতএব জীবশর্ম্মা স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন। তাঁহার গ্রন্থ আর্য্যাষ্টশতের পরে রচিত হইয়া এবং বৃহজ্জাতক রচনার পূর্ব্বে খ্যাতি লাভ করিয়া থাকিবে। বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন[১৪]। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার জন্ম ৫০৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে হইয়াছিল।[১৫] ভাউদাজির মতে ইহার ২০ কিংবা ৩০ বৎসর পরে বরাহমিহির জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (Literary Remains, p.241.)। তাহা হইলেও আর্য্যাষ্টশতের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৪৯৯ অব্দ নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

১৪। G. R. Kaye, Indian Mathematics (Calcutta, 1915), p. 67. The Literary Remains of Dr. Bhau Daji, p. 240.

১৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত *

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দ্বিজ রামকুমারের ১২খানি পুথি আছে। এই বারোখানি পুথিতে ভাগবতের দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত পদ্যে লেখা আছে। দশম স্কন্ধ দুইখানি পুথিতে পাওয়া যায়। পুথিগুলির সংখ্যা ১৬৯৩—১৭০৩ ও ৯৪৬। সম্প্রতি আমি নিজে ইহার দশম স্কন্ধের একখানি পুথি পাইয়াছি। উপরোক্ত পুথিগুলির মধ্যে যেখানিতে দ্বিতীয় স্কন্ধ লেখা আছে (১৬৯৩), তাহা হইতে জানা যায় যে, সেইখানি রামধন মিত্র নামে একজন ভদ্রলোক লিখাইয়াছিলেন। ২য় স্কন্ধের লিপিকার তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'জবগ্রামে পিত্রিকুলে জন্ম হয় তার।
প্রকাশ করিয়া নাম কহি শুন তার॥'

চতুর্থ স্কন্ধের (১৬৯৫) শেষে তারিখ দেওয়া আছে,—'সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৮ পৌষ।' সম্ভবতঃ ইহা ঐ স্কন্ধটির লিপিকাল। পঞ্চম স্কন্ধের (১৬৯৬) ভণিতায় আছে,—

'রাধাকান্তপুর হয় গ্রামের ক্ষেয়াতি।
সামিল গাঙ্গুড়ে চৌকী হয়েছে সংপৃতি॥
মযুকুরের মধ্যে বাস মাতামহাশ্রয়।
সিবপুর হয় মোর পিতার আলয়॥
... ...
জবগ্রামে বৃদ্ধ পিত্রীকুলে জন্ম জার॥
দ্বিজ তারিণীচরণ আপনার হয় নাম।
পঞ্চম স্কন্ধের হইল সমাধান॥
সন ১২৪০।১৫ পৌষ

দ্বিজ তারিণীচরণ বোধ হয়, লিপিকারের নাম। নবম স্কন্ধের (১৭০০) শেষে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

'পরগণে ছোটীপুর জেলা বৰ্দ্ধমান।
উলার মুস্তফীদের তালুক গ্রামখান॥

দ্বাদশ স্কন্ধের (১৭০৩) শেষে কবি তাঁহার এই ভাগবত রচনার ইতিহাস এইরূপ লিখিয়াছেন,—

জেষ্টা ভাষ্যা আমার পৃয়সী অতি ছিল।
সময় পাইয়ে সেই পুত্র প্রসবিল॥
কিছু দিন পরে দোঁহে হইল সংহার।
তাহাতে বড়ই শোক হইল আমার॥
কোন মতে শোকের না হয় নিবারণ।
একেলা থাকিলে সদা করি যে রোদন॥
ক্রমে এক পক্ষ মোর নিদ্রা নাহি হৈল।
তার পর একদিন নিদ্রা হয়েছিল॥
ঐ কালে একজন ব্রহ্মার রূপে।
আসিয়ে দাঁড়াল জেন আমার সমীপে॥
আমিহ রোদন করিতেছি সুকাতরে।
তিহো জেন জিজ্ঞাসিতে লাগীল আমারে॥
কি জন্তে এতেক তুমি করহ রোদন।
সুনিয়ে তাহারে সব কৈল নিবেদন॥
কাতর হইয়াছি আমি তাহার জন্তেতে।
মুনি সেই দ্বিজ মোরে লাগীল কহিতে॥

---

* ২১এ চৈত্র, ১৩৪৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অনর্থক ভাবনা কি জন্তে কর তুমি।
কর গিয়ে জে কথা বলিয়ে জাই আমি ॥
ভাগবত গ্রন্থ তুমি রচহ পয়ারে।
মিছে কেন ভাবনা করহ তার তরে ॥
এই কথা কহিলেন সম্মুখে দাঁড়ায়ে।
দুঃখে মোর উপহাস হইল বুনিয়ে ॥
উপহাস করিয়ে জিজ্ঞাসা কৈনু আমি।
কহিব সভার নাম করহ শ্রবণ ॥
হরিদেব মহাদে[ব] তৃতীয় মুকুন্দ।—ইত্যাদি[১]

স্বপ্ন দেখার পর স্বরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,—

... ... শোকে প্রাণ দহে।
কোন মতে নিবারণ কদাচিত নহে ॥
কাহার নিকটে স্থির নাহি হৈত মন।
সদা রহিতাম যথা লিখে শিশুগণ ॥
তারা সঙ্গে সর্ব্বদা করিত কলরব।
সেখানে থাকিলে শোক দূরে জেত সব ॥
জেই দিন এ সপন দেখিনু নিসিতে।
প্রাতে উঠি কিছু আর না ছিল মনেতে ॥
গিয়ে পাঠশাল মাঝে বসিছিনু আমি।
হেন কালে তথা আইল স্বরূপ গোস্বামী ॥
কৃশ হইয়াছে অঙ্গ করি নিরিক্ষণ।
বুঝাতে লাগিলা মোরে প্রবোধবচন ॥
কেন ভাই তুমি তো সুবুদ্ধি জানি হও।
এতো শোক কি জন্তে করহ মোরে কও ॥
আমিহ তাহার প্রতি কৈনু নিবেদন।
জানি তবু তথাপি না হয় নিবারণ ॥
পূর্ব্বাপর জানি জে মরিলে নাহি বাচে।
তাহার লাগিয়ে খেদ করা সব মিছে ॥
জানিয়ে না হয় স্থির তাহার মায়াতে।
এই মত কৈনু আমি তাহার সাক্ষাতে ॥
তার পর গোস্বামী কহিলা মোর প্রতি।
শুন ভাই আমি এক কহিব জুকতি ॥
মিছামিছি অনর্থক কেন ভাব তুমি।
মোর কাছে জেও ভাগবত কব আমি ॥
এই কথা গোস্বামী আমারে জবে কৈল।
সে কালে আমার সব কথা [মনে] আইল ॥
ভকতি জন্মিল মোর সেই সময়েতে।
শ্রীধর করিল কৃপা ভাবিনু মোনেতে ॥
নতুবা এ কথা কেন কবেন গোস্বামী।
এই মনে বিবেচনা করিলাম আমি ॥
তাহারে কহিনু আমি বৈকালে জাব।
তোমার নিকট গিয়া পুরাণ শুনিব ॥
এতেক বলিয়ে উঠে আইনু মন্দিরে।
স্নান করি ভক্তি করি পুজিনু শ্রীধরে ॥
বৈকালে গেল(াম) আমি গোস্বামী সদনে
ধ্রুবের চরিত্রকথা করিনু শ্রবণে ॥

মদীয় দশম স্কন্ধের শেষে কবি নিজ পরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

সামিল গাঙ্গুড়ে চৌকী আছে বেবধান।
রাধাকান্তপুর হয় গ্রাম অবিধান ॥
উলার মুস্তফীদের হয় গ্রামখান।
মধুকুরের মধ্যে বাস মাতামহাশ্রয়।
শিবপুর হয় মোর পিতার আলয় ॥
দুই নাম লিখি ক্রমে শুনহ বচন।
মাতামোহ কৃষ্ণহরি পিতা রামমোহন ॥
মাতামহি রাসেশ্বরি মাতা সত্যভামা।
বিমদা সারদা দুই ভগ্নি গুণধামা ॥
দুই ভার্য্যা আমার আছিল গুণবতি।
জেষ্টা নাই নাম তার ছিল ভগবতী ॥
কনিষ্টা ভার্য্যার নাম হয় রামপ্রিয়ে।
কহে দ্বিজ রামকুমার শ্রীধর ভাবিয়ে ॥

এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন,—পরগনে ছোটী, জেলা বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমান জেলায় রাধাকান্তপুর নামে কোন গ্রাম এখন আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গ্রন্থখানি বর্দ্ধমান

১। বোধ হয়, লিপিকার ভ্রমক্রমে কয়েক পঙ্‌ক্তি ছাড়িয়া দিয়া, শেষের দুই পঙ্‌ক্তি লিখিয়াছিলেন। কারণ, শেষের দুই পঙ্‌ক্তির সহিত পূর্ব্বপঙ্‌ক্তিগুলির কোন সম্বন্ধ নাই।

জেলার অধীন গলসী থানার অন্তর্গত কুরকুরা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত দশম স্কন্ধের পুথিতেও (১৭০১) এইরূপ পরিচয় লিখিত আছে।

মদীয় পুথিখানির আর এক স্থানে (পৃঃ ৪৩) কবি নিজ পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুত কৃষ্ণহরি মাতামোহ নাম। যেমতে হইনু জ্ঞাতো লিখি পরিচয়।
অবসতি গঙ্গানন্দ চাটুতি সন্তান॥ শ্রীযুত স্বরূপচন্দ্র মে'হসুসন্তান।
পীতা রামমোহন মুকুটী গাই খ্যাত। এ সব সন্ধান পাইনু তার স্থান॥
ফুলিয়ে কানাই ছোট ঠাকুরের সুতো॥ আমারে বুঝালে তিঁহো শ্লোক অনুসারে।
এই ভাগবত মোর পড়া গ্রন্থ নয়। আমি তাহা ভাষা করি রচিনু পয়ারে॥

সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে (সং ১৭০১। ৩৬শ পত্র) উপরে উদ্ধৃত ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রথম ৬ পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায় না, শেষের ৪ পঙ্‌ক্তি সামান্য পাঠান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুনরায় ৩৮৫ পৃষ্ঠায় কবি লিখিয়াছেন,—

রামমোহন মুখোপাধ্যায় সন্তান আপনি।
ফুলে কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তানে বাখানি॥

মদীয় পুথিখানির রচনার সন তারিখ সম্বন্ধে লেখা আছে,—

সকে সসি সিন্ধু সর নেত্র নিরূপণ। সমাপ্ত হইল রাম কর্কট মাহাতে॥
বিধু পক্ষ রাম বসু বাঙ্গালার সন॥ সিত পক্ষ আসাড়ে যে নবমি সে দিনে।
শুরু বসু রাম চন্দ্র লিখি ইঙ্গরাজিতে। বারে বিধু স্বাতি ইক্ষ নক্ষত্র সে দিনে॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ১৭৫৩ শকে, ১২৩৮ সনে বা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি ভাগবতকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও উহার স্থানে স্থানে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাধার জন্ম অধ্যায়ে কবি লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে জনম রাধার। লিখি রাধাজন্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে।—ইত্যাদি
ভাগবতে নাহি কিছু প্রসঙ্গ তাহার॥

দানখণ্ড অধ্যায়টি হরিবংশের মতে লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

দানখণ্ড বিস্তার নাহিক ভাগবতে।
লিখিলাম আমি ইহা হরিবংশমতে॥

কৃষ্ণদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলেও লিখিয়াছেন,—

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ মুঞি কহি কিছু হরিবংশমতে॥

এই হরিবংশ কি বাঙ্গালা দেশের বিশেষ কোন লৌকিক পুরাণ বা কাব্য ছিল? ভবানন্দের হরিবংশ কাব্যের সহিত মহাভারতের খিলহরিবংশের কোনই মিল নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য।

রচনার নমুনাস্বরূপ নিম্নে দশম স্কন্ধ হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল,—

দানখণ্ড

সকলেতে বড়াই বুড়িরে নিল ডাকি।
বিকিতে চলিল রাধে সঙ্গে নিয়ে সখি॥
মথুরা যাইব বলি হইল আগুসার।
জানিলেন কৃষ্ণ সেই সব সমাচার॥
সিশু সনে পূর্ব্বেতে গেছেন হরি মাটে।
সুবল সখার দ্বুতে ডাকীলা নিকটে॥
তাহাদিকে বলিয়ে এ সব বিবরণ।
ধীরে ধীরে দয়াময় করিলা গমন॥
জমুনার তীরে কদম্বের তরুমূলে।
বামেতে কলসি রাখি বৈসে দানি ছলে॥
সখি সনে জান রাধে হয়্যা আগুয়ান।
এই তিন ভুবনে জার রূপের বাগান॥
ললিতা বিসাখা সব য়াছে কাছে ২।
সঙ্গে যেতে না পাবে বড়াই সব পিছে॥
পথমাঝে তরুতলে কানু আছে বসি।
পাস ঘেসি জান চলে রাধিকা রুপসি॥
কৃষ্ণ কন সব সখি জাও কোথাকারে।
কিসের পসরা দেখি মাথার উপরে॥
রাধে কন শুণ শ্যাম জাই মধুপুরে।
ঘৃতো ঘোল দধি দুগ্ধ বেচিবার তরে॥
পসারে লয়েচি সেই দধি দুগ্ধ ঘৃত।
মাথাতে করিয়ে মোরা যাইতেছি দ্রুত॥
শুনি কানু কন সভে জাহ কোন বুকে।
ওলাহ পসরা আগে আমার সমুখে॥
রাধে কন পসরা ওলাব কী জন্যেতে।
হয়েচে গগনে বেলা যাব মথুরাতে॥
শুন বন্ধু এখন কৌসলকাল নয়।
হইলে অধিক বেলা বিক্রী নাহি হয়॥
আর এক শুন বন্ধু আমার বচন।
ওলাব পসরা কেন তোমার সদন॥
কানু কন না জান হয়েছি আমি দানি।
কংস কর খাব মোর এই ঘাটখানি।
কহিনু তোমারে সব তত্ত্ব বিবরণ।
ইবে মোরে কর দিয়ে করহ গমন॥

রাই বলে আই আই এ বড় অদ্ভুত।
কেনে হেন মিথ্যা কথা কহ নন্দসুত॥
চারি দিকে সখিগণ বলে ধীরে ধীরে।
কভু নাহি শুনি দানি যমুনার তীরে॥
আজি নহে কালি নহে বার মাস জাই।
কখন এখানে দানি দেখিতে না পাই॥
দধি লয়ে যাই মোরা কুলে কুলবতি।
ছাড়িতে না পারি জাতিবিত্তি জাই নিতি।
পুর্ব্বাপর শুনেচি এ পারাপার ঘাট।
আজি বন্ধু কেন তুমি কর এই ঠাট॥
পথ ছাড়ি দেহ আর না কর বিরোধ।
বুঝিলাম হও তুমি বড়ই নিবোধ॥
মথুরা নগরে আছে কংস নৃপবর।
সদা জাতায়াত করে তার অনুচর॥
দেখি গিয়ে এই কথা বলি গিয়ে তাকে।
তখনই প্রমাদ শুন হবে মুহূর্ত্তেকে॥
তোমারে দানিব তারা এই দান দিবে।
লুটিয়ে নন্দের পুরি লইয়ে জাইবে॥

* * *

ছাড় কলা কালাহে বিলম্ব কর কেনে।
কখন হইবে বিক্রী ভেবে দেখ মনে॥
আর তাতে কখন এখানে নাহি দানি।
নিতি নিতি জাই মোরা জতেক গোপিনি॥
এই মত সখিগণ বলিল সভাই।
শুনিয়ে কহেন তবে নাগর কানাই॥
নিতি নিতি জাও বিকে মথুরা নগরি।
ভালই বচন তুমি বলিলা সুন্দরি॥
সর্ব্বদা আমি তো এই ঘাটে নাহি থাকি।
নাহি জানি কখন গিয়েছ সব সখি॥
এ ঘাট হয়েচে মোর দ্বাদস বৎসর।
এতো দিন বাকী আছে সবাকার কর॥
নিতি নিতি গিয়েচ আমারে দিয়ে ফাকী।
আজ আমি বুঝে লব শুন সব সখি॥
দধি দুগ্ধ চারি পোন ঘোলে কিছু উনো।
খির ঘৃত নবনি ছেনাতে চাহি দুনো॥

এই হিসাবেতে বারো বৎসরের লব।
তবে মথুরার বিকে জাইবারে দিব ॥
আজ আমি লাগ পাইয়াছি সভাকার।
বুঝিয়ে লইব দান গেছো যত বার ॥
সকলে আমার গোণ্ডা আগে ফেলি দাও।
তবে সে মথুরা বিকে জাইবারে পাও ॥
এই মত করি যদি বলিল কানাই।
কহিতে লাগিলা তবে রসবতি রাই ॥
দান দিব বন্ধুহে তাহাতে নাই খেতি।
মিথ্যা কথা বল এত অনুচিত অতি ॥
এ ঘাটে তুমি হে দানি দ্বাদস বৎসর।
কেমনেতে এ কথা বলিলে নটবর ॥
দশম বৎসর হইল বয়েস তোমার।
কে [না] জানে বৃন্দাবনে বাস আছে যার ॥
দশম বৎসরের জসদার নিলমণি।
বারো বর্ষ এই ঘাটে আছ তুমি দানি ॥
বল দেখি বন্ধু তুমি আমার নিকটে।
পূর্ব্বে দুই বর্ষ দান কে সাধিল ঘাটে ॥

এই কথা কৈল যদি রসবতি রাই।
শুনি মনেতে লজ্জা পাইলা কানাই ॥
মুখেতে বলেন কৃষ্ণ শুন বিনদিনি
দ্বাদশ বৎসর আমি এই ঘাটে দামি ॥
দশ বর্ষ সাধি দান আসিয়া ব্রজেতে।
দুই বর্ষ লইনু দান গোলোক হইতে ॥
এই বারো বৎসর আমার ঘাটখানি।
বারো বৎসরের কর দেহতো গোপিনি ॥
শুনিয়ে কৃষ্ণের কথা রাধে বিনদিনি।
ইসদ হাসিয়ে মুখ ফিরান তখনি ॥
কৃষ্ণ কন কেনে ইবে ফিরালে বদন।
কর দিতে হবে বলি করিলে এমন ॥

* * *

দানখণ্ড বিস্তার নাহিক ভাগবতে।
লিখিলাম আমি ইহা হরিবংশমতে ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের দানলীলার বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ধারার অনুসরণ বিস্ময়কর।

নৌকাখণ্ড

কৃষ্ণের এ কথা শুনি কন রাধে বিনদিনি
নিবেদন করি বংশিধারী।
তোমার তরি উপরে উঠিতে হে ভয় করে
সির্ন্ন জির্ন্ন তব তরি হেরি ॥
জমুনা তরঙ্গ উছলে টলমল করি দোলে
ঝলকে ঝলকে উঠে নির।
কেরুয়াল হাথে করি চাপিয়ে বসেচি হরি
তথাপি না পারি হতে স্থির ॥
আমরা নারি অবলা তাহাতে গোপের বালা
শঠতা না কোন কালে জানি।
তরঙ্গে হেলিছে তরি দেখি মোরা ভয়ে মরি
ভাবি মোনে যাইব কেমনে ॥
রাধার বচন শুনি কন তবে চক্রপাণি
শুন রাধে বলিব তোমায়।
হৃদয় কাষ্ঠের এই(=মুই ?) তরণি করেছি এই
মোন বাতাসেতে উড়ি জায় ॥

মোনে ভয় নাহি করি সভে আসি চাপ তরি
এখনি ও পার লয়ে জাব;
ভাণ্ড পিছে লব বুড়ি রাধার লইব সাড়ি
সখি পৃতি আনা আনা লব ॥

... ...

তরি করে টলমল চঞ্চলা গোপী সকল
সকাতরে বলয়ে কৃষ্ণেরে।
কী কর কী কর হরি দেখ হে ডুবয়ে তরি
কেরুয়াল না বাহ কী করে ॥
জমুনা তুফান অতি ঘোরতরা বেগবতি
দুকূলে বহিছে কানে কানে।
ঘন ঘন ঘুরে তরি বুঝি বা হে বংশিধারি
জীবনেতে হারাই জীবনে ॥

বিদেশিনীমান

গীত গান বীণাস্বরে মিলাইয়া তান।
শ্রবণে শুনিতে রাধা পাইলেন গান॥
বেগ্রা হ'য়ে কন রাই বিসাখা চাহিয়ে।
দেখ সখি কেবা যায় বীণা বাজাইয়ে॥
নিকটেতে তাহারে ডাকিয়ে আন দেখি।
শুনি শীঘ্র উঠিল বিসাখা ছয় সখি॥
ডাকিল তখন শ্যামে নয়মস্তঙ্গিতে।
আইলা নাগররাজ রাধার সাক্ষাতে॥
বসাইল কমলিনী আপনার পাশে।
কহ নিজ বিবরণ বলিয়া জিজ্ঞাসে॥

কি নাম তোমার কোন দেশে নিবসতি।
বীণা যন্ত্র করে কেন ধরেচ যুবতি॥
তব প্রাণনাথ বল কি দোষে তেজেছো।
একাকিনি হয়ে কেন ভ্রমণ করিছ॥
শুনিয়ে কহেন শ্যাম শুন কমলিনি।
উদাসিনি হই মোর নাম বিদেসিনি॥
কি কব তোমারে প্রেমদায়ে ঠেকেচি।
সেই হেতু বীণা লয়্যা সদা ভ্রমিতেছি॥
আপনি আমারে ছাড়ি গেল মোর পূরে।
একাকী রহিতে নারি তারে না দেখিয়ে॥

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'

১৮৫৭ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' লিখিয়াছিলেন :—

> প্রশংসিত বাবুর বয়ক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবেক না। ঐ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে; গ্রন্থ রচনায় কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না; কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কালমধ্যে নানা গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রলালের উক্তিতে কোন ভুল নাই। ১৮৫৭ সনের পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ সত্য সত্যই একখানি সাময়িক পত্র বাহির করিয়াছিলেন; তাহার নাম 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। ইহা কালীপ্রসন্ন সিংহ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। কিন্তু এই পত্রিকাখানির কথা এত দিন কাহারও জানা ছিল না; এমন কি, কালীপ্রসন্নের ইংরেজী ও বাংলা জীবনচরিত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষও ইহার সন্ধান দিতে পারেন নাই। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার মলাটের অনুলিপি দিতেছি :—

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।

মাসিক প্রকাশ্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত।

বাঙ্গাল সুপিরিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা লেখা থাকিত। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ :—সভ্যতার বিষয়, পৃ· ১-৯; চাঞ্চল্য (ক্রমশঃ প্রকাশ্য), পৃ· ৯। ১০ম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা হইতে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ—২০ এপ্রিল ১৮৫৫—জানা যাইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

> যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্তব্যক্তি ব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রিকা যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহার মূল্য /০ একআনা মাত্র।
>
> যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভা, ১৭৭৭ শক, ৮ বৈশাখ, ১২৬২ সাল
>
> শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক

সভ্য মাত্রেই বিনা মূল্যে একখণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বরচিত। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি এ-যাবৎ কেহই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই কারণে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন আছে। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'সভ্যতার বিষয়' প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সভ্যতার বিষয়।—অসভ্যাবস্থা দূরীকৃত করিয়া সভ্যতার সোপানারূঢ় হইতে সকলেরই প্রধানোদ্দেশ্য, কিন্তু কি কি উপায়াবলম্বন করিলে এতৎ মাঙ্গলিক বিষয়ানুষ্ঠান হইতে পারে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের অনুবর্ত্তী প্রায় কাহাকেই দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব এই সর্ব্বমঙ্গল প্রদায়ক বিষয়ের কোন কোন উপায়াবশ্যক করে, তাহা পশ্চাৎ ভাগে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

বিদ্যাই ইহার প্রধান সোপান স্বরূপ। ভূমিতে হলযোজনাক্রিয়াদি দ্বারা শস্যাদি রোপিত হইলে যেমত ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনোমধ্যে বিদ্যাবীজাঙ্কুরিত না হইলে সরলান্তঃকরণ সদ্ভাব উপচিকীর্ষা ন্যায়পরতা ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা মন কখনই বিভূষিত হইতে পারে না। যদি এই রসার্দ্রিত না হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকে, তবে কেবল অনিষ্টকর এবং অমাঙ্গলিক বিষয়ানুষ্ঠানানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বলোকাপ্রিয় এবং অশেষবিধ যন্ত্রণার ভাজন হইতে হয়। মানসিক বৃত্তির চালনা থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তি লাভ এবং পরমাশ্চর্য্য বিষয়ানুশীলনে, সর্ব্বদেশোপকারে, মন আবদ্ধ থাকে। ভূতত্ত্ববেত্তা, ভূগোলবেত্তা, জ্যোতির্ব্বেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, বিশ্বজ্ঞানবেত্তা, এবং অন্যান্য বিষয়ে সুপণ্ডিত হওয়া বিদ্যোজ্জ্বল ব্যতিরেকে হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মানসিক শক্তির যত প্রবলতা হইবে, ততই সুখের যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবেক, বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা হেতু নানা বিষয়ে সুবিধা এবং শারীরিক ক্লেশের অনেক হ্রাসতা লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু সৎস্বভাবান্বিত, সরলান্তঃকরণান্বিত, পরম কৃপান্বিত মহাপূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিদিগের বিদ্যালোচনা, জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মালোচনা, এবং সর্ব্বমঙ্গলালোচনা স্বভাবাবস্থিত হইলেই অতি মূঢ় অজ্ঞ ব্যক্তিরাও নানা বিষয়ে মহোপকৃত হইতে পারে। অতএব এতাদৃশ সৎসংসর্গে অবস্থিতি করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হায়! অস্মদ্দেশে তাদৃশ জ্ঞানানুশীলন না থাকাতে যে কতই অন্যায় এবং অযুক্তি যুক্ত ব্যবহার সংঘটিত হইয়া আসিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে।

জাত্যভিমান, যাহা এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে বিষম শূল স্বরূপ হইয়া অশেষ যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত করিতেছে। কারণ অধুনা ইউরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডে যেরূপ সুপ্রণালী ক্রমে বিদ্যানুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, আসিয়া খণ্ডে তাহার কিছুমাত্রও নাই। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এতদ্দেশীয় লোকেরা অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক, স্বীয় মানব জন্মের সার্থকতা লাভে বঞ্চিত হয়েন। যেহেতু তাহার স্বীয় স্বজন বন্ধুবর্গ এবং পরিবারেরা সেই মহাত্মাকে সমুচিত সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া পরিত্যাগ করে, ও এতদ্রূপ পরিত্যক্ত হইতে অনেক মহাত্মাকে দৃষ্টি গোচর হইতেছে। এবং এই অনিষ্টকর দেশাচার অস্মদ্দেশে বদ্ধমূল হওয়াতে যে আরও কত শত প্রকার দুর্ঘটনা দিন দিন সংঘটিত হইতেছে তাহা অবচনীয়। দেখ যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন নিষ্ঠুর দেশাচারের অসহ্য বিষমবিষদন্ত দংশনাশঙ্কায় তাহাতে অপ্রবৃত্ত হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করেন। যেহেতু সকলেই এক কর্ম্ম প্রাপ্তির আশার উপরে নির্ভর করিলে কখনই তদ্দ্বারা সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে না। যেমন বিন্দুমাত্র অনল সংযোগে মহার্ণবের বারি উত্তপ্ত হয়

না; তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণে এক কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইলে তদ্দারা কখনই সুশৃঙ্খলরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আহা। অস্মদ্দেশীয় লোকেরা দিন দিন নিস্তেজ ভীরুস্বভাব দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত কেন হইতেছে ও কি নিমিত্তই বা পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহ দ্বারা বিষম দ্বেষানলে অহরহ দগ্ধ হওত দুষ্ক্রিয়াশক্ত প্রবৃত্ত দুঃসহ রোগাক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহার কারণানুসন্ধান করিতে হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবেক যে কৌলীন্য ব্যবস্থানুসারে উদ্বাহ নির্ব্বাহই ইহার মূলীভূত কারণ।

হায় এমৎ মহানন্দের কালোপস্থিত আমাদিগের কবে হইবে, যেদিনে এই সর্ব্ব বিষয় হন্তা মহদ্বিষয়ানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকারী ধর্ম্মানুশীলনের বৈরী স্বরূপ মন বিচ্ছেদের মূলাধার নিরপরাধির প্রাণহর্ত্তা এবং দেশোচ্ছিন্ন করিবার মুখ্য কারণ দেশাচার দূরীভূত হইবে, তখন এতদ্দেশের সৌভাগ্যের আর পরিসীমা থাকিবেক না।

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, তিনি এই সুখকর মনোহর জগৎসংসার সৃজন করিয়া ইহাতে যে সমস্ত অদ্ভুত নৈপুণ্যতা করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্লতার হিল্লোলে আর্দ্র হইতে থাকে। তিনি সর্ব্বদেশের স্বভাবাদি বিভিন্ন করিয়া নানা আশ্চর্য্যাশ্চর্য্য, অশেষ হিত সমৃদ্ধিত এবং গুণবিশিষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারা পৃথিবীকে মনুষ্যের সুখাকর স্বরূপ করিয়াছেন। মানবগণ দ্রব্যাদির গুণজ্ঞ এবং সংযোগ বিয়োগাদির মর্ম্মজ্ঞ বিষয়ে যত নৈপুণ্যতা প্রকাশ করিবেন, ততোধিক পরিমাণে সুখের আতিশয্য বৃদ্ধি হইতে পারিবে। কাষ্ঠাদি জলসংযুক্ত হইলেই কাষ্ঠ জলোপরি ভাসমান হইয়া থাকে। এবং ধাতু সংযোগীত বিষয়াদির নিগূঢ় তত্ত্বাবধারণেতেই নাবিকতা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ানুশীলনের বিশেষ প্রাচুর্য্য লাভে, কত শত দেশ ইহার উপকার পাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু চুম্বক পাথরের প্রকাশ, পদার্থ বিদ্যানুকুল্যের মহাশ্চর্য্য,"Steam engine" অর্থাৎ দ্রুত শিখা নিঃসারিত, জল স্থল উভয়স্থ এবং মনভ্রমণানুযায়ী শকট, ও Telescope অর্থাৎ দূরদৃষ্টি সমীপকারী বোধক যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ ও প্রকাশতাতে অবনীমণ্ডলস্থ তাবৎ জাতি মাত্রেই এই হিতাভিলাষিণী পরমোপকারিণী এবং দেশবিদেশের সভ্যতা উন্নতির আদিকারণ স্বরূপ পরমামৃতপানে মন আনন্দ রসার্দ্রিত হইয়া থাকে। যথেষ্ট দ্রব্যোৎপাদক এবং নদ্যাদি পরিবেষ্টিত দেশাদিতে বাণিজ্যাদির বিশেষ আধিক্য থাকিবার, তত্তদ্দেশে সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিব্যূহের নির্ম্মল ও সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রাখর্য্যতাতে যে বিদ্যুৎ যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহার আনুকূল্যে বাণিজ্য দেশ পরিভ্রমণ প্রাণীর প্রাণরক্ষা অজ্ঞানির জ্ঞানচর্চ্চা বৈরী হইতে রাজ্য মোচন সংবাদাদি প্রেরণাপ্রেরণের সদুপায় দুর্ভিক্ষ হইতে দেশ মুক্ত হওয়া ইত্যাদি সুচারুরূপে নিষ্পাদন হইতেছে। বাণিজ্য দ্বারা দেশীয় লোকের সাহস সভ্যতা এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে। কোন্ কোন্ কর্ম্মাসক্ত হইলে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সহকারে সভ্যতার উন্নতি হইতে থাকে, তাহা পশ্চাদ্ভাগে বর্ণনা করা যাইতেছে। যে যে ব্যক্তিরা পরিশ্রমাবলম্বন করিয়া নানা বিষয়োপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণে যত্নবন্ত থাকে তত্র দেশে এই এই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবার সভ্যতার দেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকালের সহিত বর্ত্তমান কালের অবস্থার উন্নতির বিষয় তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এক্ষণকার লোকেরা অনেকাংশেই সভ্যতাতে পদার্পণ করিয়াছেন। দেশ দেশান্তরে গমনাগমন এবং সংবাদাদি প্রেরণাপ্রেরণের দিন দিন যেরূপ সদুপায় হইতেছে পূর্ব্বে ইহার কিছুমাত্র ছিল না, কত শত ব্যক্তি ভূমি হইতে ধাতু খনন করিতেছে, কেহ বা অতি দুস্তর গম্ভীর ভয়ানক মহার্ণব হইতে মুক্তাদি বহুমূল্য প্রস্তর সকল উত্তোলন

করিতেছে, কেহ বা মেষ প্রভৃতি পশুদিগের লোম সকল সংযোজনা করিয়া অত্যুত্তম বস্ত্রসকল প্রস্তুত করিতেছে কেহ বা কৃষিকর্ম্মে আসক্ত হইয়া প্রগাঢ় পরিশ্রমপূর্ব্বক সুস্বাদু শস্যাদি প্রস্তুত করণান্তর লোকদিগের জীবনদান করিতেছে। কত কত ব্যক্তিরা অতি সুমনোহর অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্যের সুখাবাস করিয়া দিতেছে। এবং কত শত গ্রন্থকর্ত্তারা স্ব স্ব দেশের অবস্থা এবং রীতিনীতি আচার ব্যবহার সকল অতি সুললিত ভাষায় গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পৃথিবীর অশেষ প্রকার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। এবং সংবাদদাতারা দিন দিন দেশের অবস্থানুসারে নানা প্রকার সংবাদ পত্রাদি প্রকাশ পূর্ব্বক পৃথিবীর চতুর্দ্দিগে বিস্তারিত করিয়া লোকদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার দিন দিন সুসম্পন্ন হওয়াতে পৃথিবীর অশেষ প্রকারে মঙ্গলোন্নতি হইতেছে নাবিকেরা জাহাজারোহণ পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া তত্তদ্দেশস্থ দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করত বিনিময় করাতে যে সকল দ্রব্য তাহাদিগের প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা মাত্র ছিল না তাহা অনায়াসে আবাসে অবস্থিতি করিয়া সম্ভোগ করিতেছেন এতদ্রূপ বাণিজ্য ব্যবসার দ্বারা লোকেরা শিল্পদক্ষ ও পরিশ্রমী হয়, যদিও এতদ্দারা অশেষ প্রকারে ক্লেশ নিবারণ এবং মঙ্গল সাধন হইতেছে বটে, কিন্তু সর্ব্বলোক হইতে আসক্ত হইলে বিপর্য্যয় হইয়া উঠে মনুষ্যের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে নানাবিষয়াবশ্যক, সুতরাং সকলেই এককর্ম্মাসক্ত হইলে তদ্দারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া, বরং নানা প্রকারেই অমঙ্গল ঘটে। দেশ পর্য্যটন দ্বারা মনুষ্যের অত্র সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা বৃদ্ধি এবং উপকার বর্দ্ধন হয় জগদীশ্বর এই পৃথিবীর স্থানে ২ যে সমস্ত অদ্ভুত কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন দেশভ্রমণ দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থ অবলোকন করিয়া তাহার যথার্থ তাৎপর্য্যাবগত হইলে অন্তঃকরণ আনন্দ সলিলে প্লাবিত হইতে থাকে, এবং নানা দেশীয় লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবত ব্যবহারাদি জ্ঞাত হইয়া ন্যায় অন্যায় বিবেচনা পূর্ব্বক তদ্বিষয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। অনেক অনেক মহাত্মারা কহিয়াছেন যে ইহা দ্বারা স্মরণের প্রগাঢ়তা, চরিত্রের সংশোধন, বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা হয়, এবং যিনি যথার্থরূপে জ্ঞানানুশীলনে উৎসুক হয়েন, তিনি জগদীশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যে সকল মহা মহা আশ্চর্য্য বিষয় আছে তাহা সন্দর্শন করিলে অভিজ্ঞতালাভ করত মনোমধ্যে এই বোধ করেন যে পরমেশ্বর তাহার জ্ঞানের শিক্ষার জন্য উপদেশক স্বরূপ হইয়াছেন। মনুষ্যের মন কোন বিষয়েতেই এতাধিক আনন্দিত হয় না যদ্রূপ তত্বানুবেত্তা হইয়া ভ্রমণ বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করে। পূর্ব্বকালে যাঁহারা বিশ্বজ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং স্থির মনোযোগের সহিত মনুষ্যের স্বভাবাদি বিষয়ের তত্বানুসন্ধান লইতেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের দর্শনকারি বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। গ্রীস দেশীয় প্রায় সকল সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা মিসর দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই ভারতবর্ষে জ্ঞানান্বেষণ জন্য আসিয়াছিলেন (Anacharsis) নামে একজন (Sythian) আপনদেশ উজ্জ্বল করিয়া গ্রীস দেশ পর্য্যটনকারি বলিয়া গণনীয় হয়েন ঐ সময়ে তিনি গ্রীস হইতে অনেক বিদ্যা ও জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন।

হায়! দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশীয় লোকেরা এই সমস্ত হিতজনক বিষয়ানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ প্রযুক্ত সামান্য লোকদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে কুসংস্কাররূপ বিষম বৃক্ষ বপন করাতে মহানর্থের কারণ হইয়াছে। তাহারা পৃথিবীকে ত্রিকোণ এবং ইহাতে সপ্ত সমুদ্র প্রভৃতি অতি অপকৃষ্ট মত সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন। যাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া দিলেও স্বাবলম্বিত মত ঈশ্বর প্রণীত জ্ঞানে তাহাতে হেয় এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, সুতরাং নির্ম্মল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের সহিত তাহাদিগের আন্তরিক প্রণয় না হওয়াতে মনোবিচ্ছেদ হেতু অশেষ বিপদ উৎপত্তি হয়। ঐক্যতা যে কি

পরমোৎকৃষ্ট পদার্থ তাহাতে তাহারা এককালে বঞ্চিত থাকায় পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহোপলক্ষে সাধ্যমত অনর্থ অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াও পরানিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। কেহ কোন ব্যয়সাধ্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠানার্থে তাহারদিগের নিকট যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলে কখনই তাহাতে সম্মত হয়েন না। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহারা স্বীয় বারাঙ্গনা ও সুরা সেবন প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকাতরে যে ব্যয় স্বীকার করেন, তদ্দারা অশেষ প্রকার দেশের হিত সাধন ও মঙ্গল বর্দ্ধন হইতে পারে। কোন কোন স্থানে বারয়ারি পূজোপলক্ষে বৎসর বৎসর যাহা ব্যয় করিয়া থাকেন, তদ্দারা অনায়াসেই পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া বালকবৃন্দের জ্ঞানানুশীলন, লোকদিগের গমনাগমনোপযোগী বর্ত্ম, দুর্দ্দান্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পীড়া শান্তির নিমিত্ত ঔষধালয়, পিপাসাতুর ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি পরমোপকার-জনক সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দেশোজ্জ্বল করিতে পারে এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। ঐকৈক্য মতাবলম্বন পুর্ব্বক কতদিনে এতদ্দেশীয় লোকেরা অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত হইবেন তাহা স্মরণ করিলে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই সমস্ত অন্যায় বিষয়ের কারণানুসন্ধান করিলে ইহা অবশ্যই বোধ হইবে যে জ্ঞানের অনুশীলন ও ধর্ম্মের ঐক্যতা না থাকাতে এতাদৃশ বিপদোৎপত্তি হইতেছে। হায় এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিল না যে ইংরাজেরা কেবল ঐক্যতাবলম্বন পুর্ব্বক এদেশে আগমন করিয়া সুকৌশলে দলবলে রাজ্য গ্রহণান্তর স্বাধীনরূপে শাসন করিতেছেন। প্রায় তিন শত বৎসরাতীত হইল আমেরিকা দেশ প্রকাশ হইয়াছে, পূর্ব্বে তত্রস্থ লোকেরা অসভ্যাবস্থায় থাকাতে ইংরাজদিগের অধীন ছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরমোৎকৃষ্ট একতারূপমূল তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকাতে অল্পদিনের মধ্যেই সেই সমস্ত সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া সভ্যতাপথাবলম্বী হওত স্বাধীনরূপে রাজ্য শাসন এবং প্রজা পালন করিতেছেন। হায় মনোদুঃখের বিষয় স্মরণ করিলে নয়ন হইতে অনবরত বারি নিঃসৃত হইতে থাকে, যে অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তিরা আমেরিকা যে একটি দেশ আছে তাহা বিশেষরূপে অবগত নহেন।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার ২য় সংখ্যার মলাটও প্রথম সংখ্যার অনুরূপ। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১-২০। ইহাতে মুদ্রিত রচনাগুলির নাম:— বাল্য বিবাহ (পৃ· ১১-১৩), কৌলীন্য (পৃ· ১৪-১৭), চাঞ্চল্য (পৃ· ১৭-১৮), বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা (পৃ· ১৮-২০)। আমরা কয়েকটি রচনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

বাল্য বিবাহ।—বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে যে সকল কুৎসিত প্রথা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া একটি সামান্য কুপ্রথা নহে। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইলে ইহা নানা অনিষ্টের মূল। দেখ মাতা পিতা পুত্রটির পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই কিরূপে কন্যাসাত করিবেন সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকেন। কেবল চিন্তিত থাকেন এমত নহেন অতীব যত্ন সহকারে কুলাচার্য্যকে সমাহ্বান করিয়া কন্যা অন্বেষণে নানা দিগ্দিগেশে প্রেরণ করেন। জননী, সুন্দরী পুত্রবধূর মুখ নিরীক্ষণাভিলাষে নানা দেবালয়ে নানাবিধ মানসিক করিয়া থাকেন ফলতঃ মাতা পিতা শীঘ্র শীঘ্র বধূসহিত পুত্রের কমল বদন নিরীক্ষণ করিতে পারিলেই আপনাকে অত্যন্ত ভাগ্যশালী ও কৃতার্থম্মন্য বোধ করেন। ইহা অপেক্ষা বৈদিক মহাশয়দিগের পাণিগ্রহণের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি না আশ্চর্য্য হইবেন। অপরাপরে পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার

উদ্বাহের চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু বৈদিক মহাশয়েরা গর্ব্ভে গর্ব্ভেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন ফলতঃ ইহাতে যে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাঁহারা ভ্রম ক্রমেও তাহার অনুধাবন করেন না।

অনিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা দেখিতে হইবে যে প্রাণিগণের জীবিত কাল অবস্থাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে যথা বাল্য, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য। কোন্ অবস্থায় কি কি কর্ম্ম করিতে হইবে নীতিশাস্ত্রে ইহার নিরূপণ আছে যথা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসাদি যৌবনে ধনোপার্জ্জনাদি বার্দ্ধক্যে পুণ্যসঞ্চয়াদি। যদ্যপিও বাল্যকাল ব্যতীত অন্য সময়ে বিদ্যাভ্যাসাদি হইতে পারে কিন্তু বাল্যকালে মেধা সমধিক থাকে সে সময়ে অনায়াসেই যত শিক্ষা করিতে পারা যায়, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তত শিখিতে হইলে প্রগাঢ় পরিশ্রম অপেক্ষা করে এবং তাদৃশ সুচারু হইবারও সম্ভাবনা নহে। যোগ্য সময়ে ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যত শস্য জন্মে অসময়ে কি সেরূপ হয়? অতএব বাল্যকালকেই বিদ্যাভ্যাসের উৎকৃষ্ট সময় বলিতে হইবে কিন্তু আমাদিগের দেশে সকলি ইহার বিপরীত। দেখ বাল্যাবস্থাতে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়া যখন উত্তরোত্তর স্ত্রীপুরুষের প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া উঠে তখন বিদ্যাভ্যাসাদিতে অপেক্ষাকৃত অনেক অযত্ন ও ব্যাঘাৎ জন্মে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই রূপেই অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অপেক্ষাকৃত অন্য দেশস্থ লোক হইতে সমধিক রূপে মূর্খতাজালে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অপর, বাল্যকালে বিবাহ হইলে হতবীর্য্যও হইতে হয় তাহার প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রায়ই অন্যদেশীয় লোক হইতে দুর্ব্বল হইয়া থাকে সুতরাং দুর্ব্বল হইলে ইহারা যে কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রত্যাশা করাও বৃথা। এই বাল্য বিবাহ এদেশের দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ। দেখ যখন পুত্রের বয়ঃক্রম অল্প তখন সে ভবিষ্যতে বিদ্বান হইবে কি মূর্খ হইবে; সুশীল হইবে কি দুঃশীল হইবে; সম্পন্ন হইবে কি দীন হইবে; তাহা জানিতে পারা যায় না। সেই সময়ে তাহার বিবাহ দিলে যদ্যপি সে উপার্জ্জন করিতে অশক্ত হয়; তবে তাহাকে পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণ করিতে যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হয় তাহা বর্ণনাতীত। আহা তাহার স্ত্রীপুত্রাদি পর্য্যাপ্ত অন্নাচ্ছাদনাদির অভাবে নিরন্তর দুঃখে সময়াতিপাত করে। অতএব যখন কৃতবিদ্য হইয়া উপার্জ্জনাদি করিতে পারিবে তখনি মাতা পিতার বিবাহ দেওয়া যথার্থ স্নেহের কর্ম্ম।

আরো স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে পরস্পর অপ্রণয় দৃষ্ট হয় বাল্য বিবাহকে তাহার এক প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে; কারণ বিবাহ কালে শিশু বরকন্যা পরাধীন ও সদসদ্বিবেক-হীন; সুতরাং মাতা পিতা যদ্যপি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অন্যায় বিবাহ দেন তবে ভবিষ্যতে কিরূপে দম্পতি সুখে কালযাপন করিবে। কিরূপেই বা তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিতে পারে আরো বাল্যকালে উদ্বাহ দেওয়ায় এক ভয়ানক ঘটনা হইয়া থাকে। বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহেন এবং প্রত্যক্ষও করা যাইতেছে যে বাল্যকালে অধিক পীড়াদি ঘটে এবং তাহাতে অনেকেই কালকবলে নিপতিত হয় সুতরাং পতির কাল হইলে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে পুনরুদ্বাহ না থাকায় বালিকা বিধবা যাবজ্জীবন দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে অতএব এই সকল দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া অতি অনিষ্টকর বাল্য বিবাহ যাহাতে রহিত হয় তাহাই শীঘ্র করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা }
১০ মাঘ ১৭৭৬ শক }
শনিবার যোড়াসাঁকো }

কৌলীন্য—আমাদিগের দেশে এক্ষণে যেরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রচলিত আছে; ইহাকে শত শত অনর্থের বীজস্বরূপ বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

ইহা প্রথমত কোন্ অভিপ্রায় প্রচলিত হইয়াছিল এবং আপাততঃ কৌলীন্য স্থাপনের মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে না পারিয়া কেবল ইহাকে বংশ পরম্পরাগত করায় প্রত্যহ যে রাশি রাশি অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তদ্বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে; শ্রোতা মহাশয়েরা পক্ষপাত রহিত হইয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহা রহিত করা উচিত কি না? অধিক পূর্ব্বে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রচলিত ছিল না। বৈদ্যবংশোদ্ভব নৃপতি বল্লাল সেনই আপন অধিকার কালে সকলের গুণদোষাদি পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহারা সদ্‌গুণান্বিত ধার্ম্মিক ও সুশীল তাঁহাদিগকেই মর্য্যাদাসূচক কুলীন উপাধি প্রদান করেন। এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত উক্ত গুণাদি বিহীন তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিদূন মৌলিকাদি উপাধি দান করেন ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে তিনি, সকলেই অসামান্য মান্যসূচক কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া সুখে অবস্থান করিবে। এই প্রত্যাশায় "আচারো বিনয়ো বিদ্যা" ইত্যাদি যে সমস্ত কুলীনের লক্ষণ আছে তদনুগামী হইবে, তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিক ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যত ধার্ম্মিক ও সুশীলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ততই সংসার হইতে দুষ্কর্ম্মপ্রবাহ মন্দীভূত হইয়া সকলে সুখে অবস্থান করিতে পারিবে এই নিমিত্তই সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই অভিপ্রায়কে অতি উত্তম বলিতে হইবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দোষ গুণাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল কুলীনের পুত্র হইলেই আপন পিতার পদের উত্তরাধিকারী হইবে যদ্যপি সহস্র সহস্র দোষের আধার হয় তথাপি জনসমাজে তাহার পিতার ন্যায় মান ও আদরাতিশয়ের কোন হানি হইবে না। এইরূপে কৌলীন্য মর্য্যাদা কুলক্রমাগত হওয়ায় পূর্ব্বলিখিত কুলীন শ্রেণী স্থাপনকর্ত্তার সদভিপ্রায় বিপরীত হইয়াছে। সকলের ভদ্র হইবার উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং যাহারা বাল্যকালাবধি অতিশয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয়াদি স্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন পূর্ব্বক ভদ্রতার পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছেন তাঁহারা আপন অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট মূর্খতম অধার্ম্মিক কুলিনসন্তানদিগের মান ও গৌরবাদি এবং আপনাদিগের অনাদরাদি দেখিয়া অত্যন্ত হতোৎসাহ হয়েন। আর তাহাদিগের পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাধ্যয়নাদি বিষয়ে যত্ন থাকে না।

আহা আমাদিগের দেশের লোকের কি ভ্রমান্ধতা ও বদ্ধমূল কুসংস্কার। অস্মদ্দেশীয় অসংশোধিতচিত্ত পরম্পরাগত কুসংস্কারবশত লোকেরা অশেষ দোষের আকর স্বরূপ কুলীনের পুত্রকে পাদানত হইয়াও নানাবিধ অর্থব্যয় পূর্ব্বক কন্যাদান করিয়া "আমি অদ্য কৃতার্থ হইলাম আমা অপেক্ষা আর ভাগ্যশালী লোক ভুবনে পাওয়া ভার অদ্য আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত স্বর্গে গমন করিল" ইত্যাদি বিবেচনা করিতে থাকেন আর একব্যক্তি বিদ্বান্ সুশীল সুরূপ ধার্ম্মিক মৌলিকাদিকে বিবাহ করিতে হইলে প্রভূত অর্থ প্রয়োজন করে এবং অর্থাভাবে শত শত ব্যক্তিও বিবাহ করিতে পারে না এই সকল অবিচার অন্যায় আচরণ দর্শন করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না দুঃখিত হইবেন? বর্ত্তমান কৌলীন্য মর্য্যাদা বর্ত্তমান থাকিলে কেবল পূর্ব্বপ্রদর্শিত অবিচার ঘটে এরূপ নহে ইহাতে আর [এক] ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কুলীন মহাশয়েরা অর্থলাভ প্রত্যাশায় অথবা কন্যাকর্ত্তার আগ্রহাতিশয়ে বশীভূত হইয়া এক এক জন, শত শত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারা এমত কোন ক্ষমতা বিশেষ প্রাপ্ত হন নাই স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা ও মনোরক্ষাদি করিবেন। হয়ত কেহ বিবাহ করিয়া

অবধি আর স্ত্রীর নিকট যান না কেহবা বার্ষিক কিম্বা মাসিক নিয়মে শ্বশুরালয়ে গমন করেন, কেহ কেহ দশ কিম্বা দ্বাদশ বৎসরের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া যদ্যপি মর্য্যাদার টাকা না পান তবে স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণাদি না করিয়া অবিলম্বে ক্রোধভরে স্থানান্তরে গমন করেন। ইহাতে সেই স্ত্রীসকল যে কি পর্য্যন্ত দুঃখে কালযাপন করে তাহা বর্ণনাতীত। কোন কোন স্ত্রী দুঃসহ যৌবন যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যভিচার দোষে দূষিতা হয় এবং এইরূপে ক্রমশ বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে যে কুলীন মহাশয় শত শত স্ত্রীকে বিবাহ করেন্ তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলে একেবারে তাঁহার সকল পত্নী বৈধব্যদশাগ্রস্তা হয় তখন তাহারা আর যথেচ্ছ উপভোগাদি করিতে পারে না, কেবল প্রাণধারণোপযোগি একসন্ধ্যা যৎকিঞ্চিৎ ফলমূলাদি আহার করিয়া দিন যাপন করে তিথিবিশেষে জলগণ্ডুষ মাত্রও খাইতে পায় না। আহা! তাঁহাদিগের এই সমস্ত যন্ত্রণা অবলোকন করিয়াও কেহ পরমকারুণিক জগদীশ্বরের অনভিপ্রেত অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্যের নিরাকরণ বিষয়ে সাহস পূর্ব্বক হস্তক্ষেপণ করেন না যদ্যপি এক্ষণে অনেক ব্যক্তির মনোমধ্যে কৌলীন্য প্রথা রহিত; বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহদান; এবং এক স্ত্রী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম মঙ্গলাকর কার্য্য সকল কর্ত্তব্য কলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু তাহারা কেবল লোকনিন্দাভয়ে এতদনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছেন না সকলে যাবৎ না সাহস পূর্ব্বক ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া এই সকল বিষয় প্রচলিত করিবেন তাবত অস্মদ্দেশের দুরবস্থা সকল নির্ব্বাসিত হইতে পারিবে না; অতএব সকলেরই হিতকর নিয়ম স্থাপনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য ইতি।

বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।—অন্য অন্য দেশ হইতে হিন্দুস্থান অধিকার করিতে সকল রাজার ইচ্ছা আছে। কারণ ভারতবর্ষীয়েরা ধনশালী বলিয়া লোকে বিখ্যাত আছে। ইহার উর্ব্বরা ভূমি, সুস্থকর বায়ু দেখিয়া মহামহা যোদ্ধারা লোলুপ হইয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, বস্তুত ধনলোভ ও আধিপত্যের ইচ্ছা থাকিতে স্থির থাকা যায় না।

হিন্দুরা যে অতি প্রাচীন বংশ তাহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে, যে দেশ অতি বৃহৎ, যেখানে জীবন ধারণ উপযোগী ভক্ষণীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে দেশে কেন না অগ্রেই বসতী হইবে, যাঁহারা অগ্রে এস্থানে বসতি করিয়াছিল তাঁহারা এই দেশজাত শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিত সুতরাং তাহারদিগের অন্য স্থানে যাইবার কোন ইচ্ছাও হইত না।

ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিরা ইহার কোন বৃত্তান্ত লিখিয়া যান নাই দেশস্থ করিয়া যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল অলৌকিক রচনায় পরিপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থকারেরা ইহার ইতিহাস যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া গিয়াছেন তৎপাঠে জানা যায় যে বহুকালাবধি ভারতবর্ষ বিজাতীয় রাজগণের অধীনে আছে। প্রথমতঃ মুসলমানদিগের অধীনে ছিল, পরে ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে, এক্ষণে ইংরাজ এবং মুসলমানদিগের অধীনে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে। রাজনীতি অনভিজ্ঞ দুর্দান্ত মুসলমানদিগের অধীনে ধর্ম্ম কর্ম্ম স্ব ইচ্ছামতে করিবার বিষয় কি ছিল। যখন ইচ্ছা হইত তখনই আসিয়া বলপূর্ব্বক প্রজাদিগের অর্থ অপহরণ করিত। এরূপ অবস্থায় সকলেই পরিশ্রম করণে পরাঙ্মুখ ছিল শ্রমফল লাভ করিতে না পারিলে কি নিমিত্ত শ্রম করিবে সুতরাং কৃষি কার্য্যের উন্নতি ছিল না। কৃষকরূপ স্বামী বিরহে বহু শস্য উৎপাদক ভূমিসকল সতী

যুবতী বিধবার ন্যায় রোদন করিত বিদ্যার অনালোচনা হেতু ব্যক্তিদিগের মন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকিত। এবং তাহারা প্রজাদিগের ধর্ম্ম জানিত না সুতরাং রাজবিদ্রোহিতা করিত, এবং রাজারা সুখে রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে মুসলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়। হিন্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য অধিকার করিবার সদুপায় করিয়া দিলেন। কিন্তু ব্রিটীশ, গবরণমেণ্ট ও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমলজ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকৃতবিদ্য হইলেও তাহারদিগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম একজন বাঙ্গালি নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাঁহার সময়ে যোগ্যব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজ্য হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের, রাজধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ধ থাকে পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদিগের বৃটীশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবরমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র ফাইল।—
রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-বার্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

প্রবন্ধ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—বলদেব পালিত। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১১৬-২০।

উনবিংশ শতাব্দীর এই বাঙ্গালী কবির ও তাঁহার কাব্যের পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুথির পরিচয়। প্রবর্ত্তক, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৩২১-৩।

পাঁচখানি বৈষ্ণব পুথির বাহ্যিক পরিচয় আদ্যন্ত নির্দেশ।

শ্রীকামিনীকুমার রায়—পালাগানে মানুষ ও প্রকৃতি। বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৬৩৪-৪০।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মৈমনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা' নামক প্রকাশিত গ্রন্থের গীতিকাগুলির মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক এবং একের উপর অন্যের প্রভাবের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার আভাস প্রদান।

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়—বাংলা পদ্যসাহিত্যে হাস্যরস। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১৪০-৭।

বিজয় গুপ্ত, মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ভারতচন্দ্র, এন্টুনি ফিরিঙ্গি, গোপাল উড়ে, কৈলাস বারুই, দাশরথি রায়, ভোলা ময়রা, ঈশ্বর গুপ্ত ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অন্য কয়েক জন কবির রচনা হইতে হাস্যরসের আংশিক নিদর্শন উদ্ধার।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী—প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক হরপ্পা, মোহেন্‌-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থান খননের ফলে প্রকাশিত সভ্যতার নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রামরাম বসু—রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত রামরাম বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সহ। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ।

প্রবন্ধ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—ভারতীয় সঙ্গীত। ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৭১৩-৭১৬; ভারতীয় সঙ্গীত, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৯৩৫-৭; ভারতীয় সঙ্গীতের যুগবিভাগ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৮২-৩।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আধুনিক কালে কৃত আলোচনার আভাস প্রদানপূর্ব্বক এইরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতা প্রতিপাদন ও ইহার যুগচতুষ্টয় (প্রাগৈতিহাসিক যুগ, মধ্য যুগ, মুসলমান যুগ ও বর্ত্তমান যুগ) নির্দেশ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিবমূর্ত্তি। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ২৫-৭।

বিক্রমপুরের আপরকাঠি গ্রামে প্রাপ্ত ও আরিয়াল গ্রামের চিত্রশালায় রক্ষিত সদাশিবমূর্ত্তির বিবরণ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার—উত্তর-বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১৩৮-৯।

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীন কালের নিদর্শন—মুদ্রা ও তাম্রলিপির সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা—প্রাচীন ভারতের ব্যাধি। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১৪৯-৫০।

বৌদ্ধসাহিত্যে প্রসঙ্গতঃ যে সমস্ত পীড়া ও তাহাদের উপশমের যে ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণ।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ—মোসলেম জগতে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা। মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৮১-৮।

পারস্য, বোগদাদ প্রভৃতি স্থানে মুসলমান নরপতিগণ-প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিবরণ।

এনামুল হক—বঙ্গে ইস্‌লাম বিস্তার। মাসিক মোহাম্মদী, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৪৮-৫২; অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ৯৯-১০৪; পৌষ '৪৩, পৃঃ ১৫৩-১৬০।

৮০০ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ ও ১২০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাণিজ্য, রাজ্যবিস্তার ও ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় আগত মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচারার্থে কৃত কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—যুধিষ্ঠিরের সময়। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪৩, পৃঃ ১-৯।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধবৎসর এবং পঞ্চ পাণ্ডব ও দুর্য্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুসময় নিরূপণ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—(১) রাজা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন (১৭৯৭-১৮১৪)। প্রবাসী, কার্ত্তিক '৪৩, পৃঃ ৩২-৪৩। (২) মাতা-পুত্র। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪৩, পৃঃ ২৬৪-৭০। (৩) গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী। প্রবাসী, পৌষ '৪৩, পৃঃ ৩৪৭-৩৫৪।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকাল

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত ব্রজবুলীসাহিত্যের ইতিহাস (A History of Brajabuli Literature, Calcutta University, 1935) গ্রন্থের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, বিশেষজ্ঞদের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল ১৫২৫ খ্রীঃ অঃ। তাহার পরেই লিখিয়াছেন, ভাষা সমধিক প্রাচীন হইলেও তন্মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে উহার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষ পাদ অথবা পরবর্ত্তী শতাব্দীর প্রথম পাদ নির্দ্দেশ করিতে বাধে। এবং শেষে মন্তব্য করিয়াছেন, খুব নেক্‌নজরে দেখিলেও বইখানাকে ১৫শ শতকের শেষার্দ্ধের পূর্ব্বে লওয়া যায় না। তাঁহার যুক্তি,—(১) সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ থাকিলেও উহা দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান ও নৌকাখণ্ড লক্ষিত হইয়াছে, ইহা বলা সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে গীতগোবিন্দের সহিত উল্লেখে চণ্ডীদাসও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন, এমনটাই বুঝায়। চণ্ডীদাস নামের পূর্ব্বে শ্রী' সংযুক্ত থাকাতেও একটু আপত্তির কারণ হইয়াছে। কেন না, জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বেই সাধারণতঃ শ্রী' ব্যবহৃত হয়। তাহার অন্যথা হইলেও সনাতন গোস্বামী যা'র-তা'র নামের আগে শ্রী' লিখিতে পারেন না। (২) মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিত-গ্রন্থগুলিতে চণ্ডীদাস বা তাঁহার রচিত গ্রন্থের অনুল্লেখ। (৩) মুরারি গুপ্তের দান-লীলা ও নৌকা-লীলা, রূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী এবং কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়োক্ত দান-বিনোদের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনাগত বৈষম্য।

(১) সনাতনের দৃষ্টিতে চণ্ডীদাস বড় ছিলেন না, কে বলিল? ঐ দান ও নৌকা-লীলাই যে কবিকে বড় করিয়াছিল। সংস্কৃত কবির সহিত ভাষা-কবির উল্লেখ দৃষ্টিকটু হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজই বা তাহা কেমন করিয়া করেন? এবং তাদৃশ দৃষ্টান্তও একান্ত দুর্লভ নহে।

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেব-কবীশ্বরঃ।
লীলা-শুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দনঃ॥
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ কবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্ত্তন্তে সিদ্ধ-রূপিণঃ॥

(২) এখন দেখা যাউক, প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে কে কে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যের উল্লেখ বা ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(ক) জয়ানন্দ মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতকারদের অন্যতম এবং তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল (১৫৫৮-১৫৭০ খ্রীঃ অঃ) প্রামাণিকও বটে। তিনি লিখিয়াছেন,—

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

(খ) স্পষ্টতঃ না বলিলেও বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে (১৫৫৭ অথবা ১৫৭৩ খ্রীঃ অঃ) চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়।

(গ) তার পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের (১৫৮১ খ্রীঃ অঃ) একাধিক স্থলে গীতগোবিন্দের সহিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।

(ঘ) নিত্যানন্দদাস তৎপ্রণীত প্রেমবিলাসে (১৬০০ খ্রীঃ অঃ) লিখিয়াছেন,—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাগানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে।
সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত।

সুকুমার বাবু এই চণ্ডীদাসকে নরোত্তম-শিষ্য মনে করেন। কিন্তু বিদ্যাপতির সহিত একত্র উল্লেখ থাকায় সম্ভবতঃ ইনি বড়ু চণ্ডীদাস। উদ্ধৃত বাক্যসমূহের লক্ষ্য যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া বিচার করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে আর কেহ চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ করেন নাই, এই হেতুবাদে কৃষ্ণদাসের উক্তি অগ্রাহ্য হইবে, এ কেমন যুক্তি? একই বিষয় বা ঘটনার বর্ণনা যে সকলকেই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

(ঙ) মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃতে দান-লীলা ও নৌকা-লীলা যথাক্রমে গোবর্দ্ধন-সান্নিধ্যে এবং মানস গঙ্গায় সংঘটিত হয়। দানকেলিকৌমুদীর দান-লীলাও গোবর্দ্ধনপার্শ্বে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান-লীলা মথুরার পথে বা অন্যত্র এবং নৌকা-লীলা যমুনায় সম্পন্ন হয়। এই অনৈক্য দেখিয়া সুকুমার বাবু বলিতে চান, সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার হইলে রূপ গোস্বামী দান-লীলা কখনই অপরত্র ঘটাইতেন না। উত্তরে বলা যাইতে পারে, লীলাদ্বয় বর্ণনা ইতিহাস পর্য্যায়ের নহে। প্রাচীন পুরাণ, এমন কি, ইতিহাসের মধ্যেও ত যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আর রূপ গোস্বামী তাঁহার পদ্যাবলীতে যমুনায় নৌকা-বিলাসের কবিতাই বা উদ্ধার করেন কেমন করিয়া? খোঁজ করিলে যমুনায় নৌকা-বিলাসের বিবরণ বিস্তর পাওয়া যাইবে। সুকুমার বাবুর আর এক যুক্তি, বৃন্দাবন ও মথুরা যমুনার একই পারে;

কাজেই নৌকা-লীলা যমুনায় হয় না। অধুনা বৃন্দাবন ও মথুরা যমুনার এক তীরেই বটে; কিন্তু সে কালে বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে যমুনা প্রবাহিত হইত। [এ বিষয়ে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ৺নন্দলাল দে বিরচিত ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক অভিধানাদি দ্রষ্টব্য।]

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনা-কাল সম্বন্ধে সুকুমার বাবুর যুক্তি-পরম্পরা অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিতে হয়।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

শাহ মোহাম্মদ সগীর*

(পঞ্চদশ শতাব্দী)

প্রাচীনতম মুসলমান কবিদিগের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর অন্যতম। তদ্রচিত "য়ুসুফ জোলেখা" নামক একখানি চমৎকার কাব্যগ্রন্থই তাঁহাকে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। এই গ্রন্থের ১০৯৪ মঘী অর্থাৎ (১০৯৪+৬৩৮) ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের একখানি প্রতিলিপি এবং পরবর্ত্তী আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আমাদের নিকট সংগৃহীত আছে।

ইহা একখানি বিরাট্ গ্রন্থ। প্রাচীন কালে খুব বেশীসংখ্যক কবি এত বড় বিরাট্ কাব্য রচনা করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় বিরাট্ গ্রন্থে কবি তাঁহার কোন পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই; এমন কি, সমগ্র কাব্যে মাত্র কয়েকটি ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন। আবশ্যক ভণিতাগুলি এইরূপ,—

১

"কহে সাহা মোহাম্মদ ইছুফ জলিখা পদ
দেসি ভাসা পয়ার রচিত।"

২

"ইছুফ জলিখা কিচ্ছা কিতাব প্রমাণ।
দেসি ভাসে মোহাম্মদ ছগিরিএ ভাণ॥"

৩

"মোহাম্মদ ছগিরি দাসের দাস তান।
তাহা হোন্তে বড় ভাগ্য মোর নাহি আন॥"

এই ভণিতাগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, কবির প্রকৃত নাম "শাহ মোহাম্মদ সগীর।" কবি সম্বন্ধে ইত্যধিক আর কোন সংবাদ জানিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার "শাহ" উপাধি দেখিলে মনে হয়, তিনি কোন সাধকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"য়ুসুফ জোলেখা" কাব্যের ভাষা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১৪৮০ খ্রীঃ) রচিত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" মধ্যবর্ত্তী ভাষা। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" ও তৎপরবর্ত্তী "পরাগলী মহাভারতের" ভাষায় কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। অথচ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" এবং "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "য়ুসুফ জোলেখা"র ভাষায়ও প্রভেদ বিস্তর; কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" ভাষায় যত প্রভেদ, তত নহে। অপিচ "য়ুসুফ জোলেখা"র ভাষা অনেক বিষয়ে "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" ও "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের" ভাষার মধ্যবর্ত্তী হারানো সূত্রকে ধরাইয়া দেয়।

---

* ১৩৩৩।১৭ই ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এ সকল বাদানুবাদ না করিয়া, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কবি শাহ মোহাম্মদ সগীরের ভাষা, কবি জৈনুদ্দিন বা তৎসমসাময়িক মালাধর বসুর ভাষা হইতে প্রাচীন। এই প্রাচীনত্বের দাবীর প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—

১। কবি সগীরের ভাষার যে সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা প্রাকৃত-ভাবাপন্ন শব্দের বহুল প্রয়োগ। যথা,—

"তোহ্মা জথ সখি আছে নৌআলি জোবন।
তাসব পাঠাই দেঅ জাউ বৃন্দাবন॥
ইছুফকে বোলহ জাউক নিবুবনে।
তুলিয়া আনৌক পুষ্প তোহ্মার কারণে॥

আমাত্য কুমারি জথ রূপে কামাতুর।
লাস বেস করি জাউ বৃন্দাবনপুর॥
জথেক নাগরিপনা কামাকুল রূপে।
ইছুফ ভোলাউ গিয়া যুবতি আলাপে॥"

"হেন মত ইছুফ জলিখা নিবাসন্ত।
জলিখার কি ভাব ইছুফে ন জানন্ত॥
ইছুফে জানন্ত মোখে গৌরব করন্ত।
বহুল আদর করে এহি অনুবন্ধ॥"

আলোচ্য কাব্যে ব্যবহৃত প্রাচীন ভাবাপন্ন কতকগুলি শব্দের নমুনা দিলাম।— নৌআলি জোবন (নব যৌবন); গারুরি (বিষবৈদ্য); হাকলি-বিকলি (অস্থিরতা, চাঞ্চল্য); উয়ারি (দালান, পুরী); ওসমিদ (মেলামেশা, সদ্ভাব); আওরে (আড়ালে); আওর (এবং); খেরি (ক্রীড়া); কটোরা (বাটি বা পাত্র); ডাকোয়াল (আহ্বানকারী, ঘোষণাকারী); অন্ধক (আঁধা লোক); লড়ি (লাঠি); অথান্তর (অবস্থান্তর); উশ্চা, উশ্ছা (উৎসাহ); গরুয়া, গুরুয়া (গুরু বা ভারী); উপস্কার কৈলা (মুছাইয়া দিলেন); উজাগর (ভোর, কাটাইয়া দেওয়া); ঝামর বদন (রুক্ষ-শুষ্ক); দির্ঘল (দীর্ঘ); মউলিত (মুকুলিত); বিখোলিত (স্খলিত); উফর-ফাফর (হতভম্ব, হতবুদ্ধি); উঝর (উজ্জ্বল); অকুমারি (কুমারী); বালি (বালিকা); বৃন্দাবন (বাগান, উদ্যান); ঘাটিল (ক্ষয় হইল); আবহো (এবেও); পিউ (প্রিয়া); জিউ (জীবন); সাচা (সত্য); কভো (কভু); খাঁখার (কলঙ্ক); পুত্রবাচ (পুত্রসম জ্ঞান করা); কমন (কেমন); আউল বাউল (পাগলের ন্যায় উস্কু-খুস্কু অবস্থা); উভা (দাঁড়াইয়া থাকা); ভাগ (ভাগ্য); সাখি (সাক্ষী বা সাক্ষ্য) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্র "ষ" বর্ণ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে "খ" বর্ণে পরিণত হইয়াছে,—বিখ, নিমেখ, ঔখদ, পেখিলুঁ, বিখধারা, বরিখ, বরিখেক, পুরুখ। (দিঠ, তছুপরে, জনি, দেহা, নেহা, ছোহন প্রভৃতি শব্দও দ্রষ্টব্য)।

২। "যুসুফ জোলেখা" কাব্যের ব্যাকরণ এই কাব্যের প্রাচীনত্ব দাবীর পক্ষে একটি প্রধান কারণ। ইহার ব্যাকরণ প্রধানতঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের" অনুসারী, এবং যে স্থলে ইহা

"শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" হইতে একটু পৃথক্, তৎস্থলে ইহা "কৃষ্ণকীর্ত্তন" ও তৎপরবর্ত্তী যুগের মাঝামাঝি কালের রূপ বলিয়া অনুমান করা যায়। এই স্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

সন্ধি :—মনরঙ্গ, মনুদাস, কামতুর, করঘাত, বুন্দেক (বিন্দু+এক) প্রভৃতি।

কর্ম্মকারকে :—রাজাক, নৃপতিক, দূতক, ভাইক প্রভৃতি সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বনাম,—উত্তম পুরুষ :—আহ্মি, মুঞি, মোহোর, আহ্মাসব, আহ্মাক, আহ্মারে প্রভৃতি।

মধ্যম পুরুষ :—তুহ্মি, তোহ্মার, তুহ্মিসব, তোহ্মাক ইত্যাদি।

নামপুরুষে :—সে, সেহি, তাক, এহি, তান, কেহো, কোহ্, কোন।

ক্রিয়াপদ, বর্ত্তমান কাল,—

প্রথম পুরুষ :—(ক) প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের—

থাকোঁ, দেখোঁ, করোঁ, মাগোঁ, লাগোঁ প্রভৃতি রূপ।

(খ) প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের—

থাকো, ফিরো, করো প্রভৃতি রূপ।

নাম পুরুষে :—(ক) প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের—

কহন্তি, বোলন্তি, ধাবন্তি, জোগায়ন্তি প্রভৃতি রূপ।

(খ) প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের—

নেহালন্ত, বাখানন্ত, জানন্ত, চাহন্ত প্রভৃতি রূপ।

(গ) আবার কোথাও কোথাও—

ধাবএ, রবএ, আছএ, পারিএ প্রভৃতি রূপ।

অনুজ্ঞা :—কৈয়ার (তুলঃ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন "কহিআর" অর্থ—কহ)

"পুন তুহ্মি কৈয়ার বচন। মূর্চ্ছিত হইলা কি কারণ॥"

দিয়ার (তুলঃ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন "দিআর" অর্থ—দাও)

"দিয়ার আপনা নাম, বাস তুহ্মি কোন গ্রাম।"

নাম পুরুষের অনুজ্ঞা :—

আছউক, জাউ, জাউক, আনৌক, ভোলাউ, দেখৌ, জানউ, আছউ, বোলাউ প্রভৃতি রূপ।

অতীত কালের উত্তম পুরুষের তিন প্রকার রূপ, যথা—

(১) দিলুঁ, সমর্পিলুঁ, কহিলুঁ প্রভৃতি। (অল্পসংখ্যায়)

(২) দিলুম, কহিলুম, জানিলুম প্রভৃতি। (অত্যল্পসংখ্যায়)

(৩) দিলু, কহিলু, জানিলু প্রভৃতি। (অধিকসংখ্যায়)

অতীত কালের নাম পুরুষের এক ও বহুবচনে—ভেটিলেন্ত, করিলেন্ত, দিলেন্ত প্রভৃতি রূপ।

কবি সগীর শুধু কাব্যের খাতিরে এই কাব্য রচনা করেন নাই। ইহার রচনার পশ্চাতে ধর্ম্ম-প্রেরণা সুস্পষ্ট। "শাহ্" উপাধিধারী অর্থাৎ সাধকবংশীয় কবির প্রাণে কাব্যের মধ্য দিয়া

ধর্ম্ম-কাহিনীর প্রচার-প্রেরণা কিছুই অস্বাভাবিক নহে। বাঙ্গালা ভাষাভাষী মুসলমানদিগকে "দেসিভাষা"র সাহায্যে মুস্‌লিম্ উপাখ্যান শুনান তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও কবি যে কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহাকে অনায়াসেই রসাশ্রয়ী ধর্ম্ম-কাহিনী বলা যায়। এই বিষয় কবি অজ্ঞাত নহেন; তাঁহার কাহিনীর এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন। তাই দেখিতে পাই, কাব্যের প্রারম্ভে ভূমিকায় কবি আমাদিগকে জানাইতেছেন,—

"কহিব কিতাব চাহি সুধারসপুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি॥"

এই স্থলে ভক্তজনকে কবির সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইবার প্রস্তাব লক্ষণীয়। বলিতে কি, তিনি সত্যই আমাদিগকে এক অপূর্ব্ব সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইয়াছেন। আর একটিবার কাব্যের শেষে এই কথাও জানাইয়া দিয়াছেন,—

"পোথার বৃত্তান্ত জেবা চিত্ত দিয়া শুনে।
তাক কৃপা করে বহু প্রভু নিরঞ্জনে॥
ইছুফ জলিখা জেবা মন দিয়া সুণে।
আদি অন্ত শুনিলে সে ভাব হএ মনে॥
... ...
একচিত্তে সুণে জে এই সব পরস্ত'ব।
পুণ্য বাড়ে দুক্ষ হরে যসকৃতি লাব॥"

কবি যাহাই বলুন, অধুনা কেহ এই বিরাট্ কাব্য পড়িয়া পুণ্য বাড়াইবার, দুঃখ হরণ করিবার বা যশকীর্ত্তি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন কি না, জানি না; তবে এই কথা সত্য যে, পাঠক এখনও এই কাব্য পাঠ করিয়া ইহার "সুধারসে শ্রুতিঘট" ভরিতে পারিবেন। প্রধানতঃ এই ভরসায় আমরা কবি-বর্ণিত কাহিনীটুকুর যথাসম্ভব সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

তৈমুস নামক কোন নরপতির কন্যা জোলেখা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহার অপরূপ লাবণ্যে সুর-নর মুগ্ধ ও বিস্মিত হইত। নিঃসন্তান রাজদম্পতি বহু দান-ধর্ম্ম ও আরাধনা করিয়া জোলেখা সুন্দরীকে লাভ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে রাজকুমারী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভাবের সঞ্চার হয়। এই সময়ে তিনি বৎসরে এক এক বার করিয়া তিন বার তাৎকালিক মিসরাধিপতি যুবকরাজ আজিজ-মিসিরকে স্বপ্নে দেখেন। এই স্বপ্নের পর জোলেখার অবস্থা যাহা হইল, তাহা তিনি স্বয়ং সংক্ষেপে সখীর নিকট বর্ণনা করিতেছেন,—

"প্রথম বরিখ সপ্ন দেখাইলা ছল।
বুদ্ধি শুদ্ধি প্রাণ মোর হরি নিল বল॥
দ্বিতিয় সপ্নন দেখি জুতি হরি নিল।
ইঙ্গিত আকার মুঞি এক ন জানিল॥
ত্রিতিয় সপ্নেত দিল জাতি পরিচয়।
আজিজ মিশ্বির নাম কহিল নিশ্চএ॥"

তৃতীয় স্বপ্নের পর প্রেমোন্মাদিনী জোলেখা শান্তভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল যে, তিনি স্বয়ম্বরা হইবেন। এই সংবাদে নানা দিগ্দেশ হইতে দূতগণ বিবাহের "পয়গাম" (প্রস্তাব) লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। জোলেখা একে একে সকলকে বিদায় দিলেন এবং স্বপ্নদৃষ্ট আজিজ-মিসিরের দূত আসিয়া না পৌঁছায় নিতান্তই চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। নরপতি তৈমুস যথাসময়ে আজিজ মিসিরের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বীয় কন্যার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন, এবং নিজেই সাধিয়া জোলেখার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আজিজ-মিসির সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে গোলযোগ বাধিবার ভয়ে বিবাহের জন্য তৈমুস রাজার রাজ্যে গমন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সংবাদ দিলেন। অধিকন্তু তিনি স্বীয় দূতের দ্বারা তৈমুস-রাজের নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন দয়া করিয়া জোলেখাকে মিসরে বিবাহের জন্য প্রেরণ করেন। তৈমুস অগত্যা এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

যথাসময়ে রাজা তৈমুস স্বীয় কন্যা জোলেখাকে মিসরে মহাসমারোহে বিবাহের জন্য প্রেরণ করিলেন। জোলেখা মিসরে উপস্থিত হইলে, আজিজ-মিসির ভাবী পত্নীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মহাধূমধামে অগ্রসর হইলেন। যথোচিত অভ্যর্থনা করা হইলে উভয় দল রাজধানী অভিমুখে চলিল। এই সময়ে প্রেমাতুরা জোলেখা স্বীয় হস্তিপৃষ্ঠ হইতে জনতা-বেষ্টিত আজিজ-মিসিরকে দেখিবার জন্য স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট নিবেদন করেন। ধাত্রী হস্তিপৃষ্ঠের 'কনক-রচিত আম্বারী' কাটিয়া একটি সুন্দর গবাক্ষ প্রস্তুত করিলেন এবং বলিলেন,—

"এহি গবাক্ষের পন্থে দেখ পরতেক।
জেন মত আজিজের কান্তি রূপ রেখ॥
সেই রন্ধ্রপন্থ দিআ কৈল নিরক্ষণ।
মূর্চ্ছিত পরিল দেখি হই অচেতন॥"

জোলেখা চেতনা হারাইয়া বহু ক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। ধাত্রী তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না দেখিয়া,—

"সখিগণে পুষ্পজল সিঞ্চে ধাত্রি সঙ্গে।
বিচিত্র চামরে বাও করে কন্যা অঙ্গে॥"

কিয়ৎক্ষণ পর জোলেখা সংজ্ঞা লাভ করিলে,—

"ধাত্রি আদি সখিগণে পুছিলেন্ত বাত।
কেহ্নে হেন গতি কন্যা কহত আক্মাত॥"

এইরূপে সখীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমাকুলা জোলেখা যে উত্তর দিলেন, তাহা বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মদাহী। সখীদের প্রশ্নে তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় অবরুদ্ধ ব্যথা গুমরিয়া উঠিল, প্রেমবঞ্চিত ভরা-যৌবনের যাবতীয় স্মৃতি একে একে তাঁহার দগ্ধ মর্ম্মপটে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিল; তিনি ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুদ্গারী আগ্নেয় গিরির ন্যায় হৃদয়ের যাবতীয় সঞ্চিত বেদনা একটির পর একটি করিয়া উদ্গার করিতে লাগিলেন।—

রাগ কোরা—লম্বিকা ছন্দ।

(লাচারি)

শুন শুন সখি,
আর তরে হইলুঁ দুখি,
প্রাণের সখি ল!
প্রথম সপ্নেত দেখি হৃদয় অন্তরে কামহতা।
এ তিন বরিখ ধরি,
রজনি বসিআ ঝুরি
প্রাণের সখি ল!
বিরহ আনলে পুরি কাহাত কহিমু এহি কথা? ধ্রু।

মোর হেন বিপরিত কাজ,
কলঙ্কিনি জোবন সমাজ,
সে জন ন হএ এহি,
সপ্নেত দেখিলুঁ জেহি,
প্রাণের সখি ল!
মোর তরে গেল কহি, সেই মোর পরমার্থ বাণি।
দোসর সপ্নের কথা,
কহিতে মরম বেথা,
প্রাণের সখি ল!
কহিল সে মোকে কথা,
য়াকুল হইলুঁ তথা, শুনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি।

চঞ্চল হইল মতি,
চপল হৃদএ গতি,
প্রাণের সখি ল!
প্রমাদ হইল অতি কথা পাইমু তাহান উদ্দেশ।
ত্রিতিয় সপ্নেত দেখি,
আঞ্চলে ধরিলুঁ পেখি,
প্রাণের সখি ল!
প্রতক্ষে দেখিলুঁ আখি চিন্তিতে হইল তনু সেস।
মুঞি নারি কামরতা,
বিধি মোর বিড়ম্বিতা,
প্রাণের সখি ল!
আপনা রাখিমু কথা, পাসানে চাপিল কর মোর।
বিষম হইল কাজ,
যাইমু কমন রাজ,
প্রাণের সখি ল!
কহিতে আপনা কাজ, ভাবিতে হইল মন ভোর।
কহিমু কেমন বুদ্ধি,
কেবা জানে তার শুদ্ধি,
প্রাণের সখি ল!
কথা পাইমু গুণনিধি, কে মোর করিব প্রতিকার।
কহে মোহাম্মদ সার,
বিরহ সমুদ্র পার,
প্রাণের সখি ল!
করহ উদ্দেস তার, পির বিনে মনে নাহি আর।

জোলেখা নীরব হইলেন। তাঁহার আবেগময় বিলাপে সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব কারুণ্যের ভাব উদিত হইল। "আম্বারী"মধ্যস্থ আনন্দকোলাহল মুহূর্ত্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জোলেখা সুন্দরী সহসা অন্তরীক্ষ হইতে এক "আকাশবাণী" শুনিতে পাইলেন,—

উঠ উঠ আএ কন্যা তাপিত হৃদএ।
তোহ্মার মনের বাঞ্ছা পুরিব নিশ্চএ॥
আজিজ মিশ্চির তার নহে মনস্কাম।
শুকভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম॥
আজিজ মিশ্চির তোর পতি মাত্র লেখা।
তার জোগে হৈব তোর প্রভু সনে দেখা॥

জেবা তুহ্মি ভিত কর সঙ্গম তাহার।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে ন হৈব শৃঙ্গার॥

সত্তন মন্দির তোর বজ্রের কপাট।
তার স্তুক্ত নহে মুক্ত করিতে সে ঘাট॥

এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়া, তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের কোণে অলক্ষিতে একটি ক্ষীণ আশার বিদ্যুৎরেখা খেলিয়া গেল। যত যুগ যুগান্তের পরেই হউক, একদিন বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত হইবেন, এই আশ্বাসে তাঁহার প্রাণ চকিতে এক অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার এই মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল, "মৃত্যু-কায়া হোন্তে জেন আইল নিশ্বাস"। মিছিল পূর্ব্ববৎ মহাসমারোহে চলিতেছিল। যথাসময়ে জোলেখা রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজপুরীতে বিবাহের যথাবিধি আয়োজন হইয়াছিল। উভয়ে রাজপুরীতে পৌঁছিলে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে যথারীতি "পুষ্পশয্যার" ব্যবস্থা হইল। কিন্তু হায়, বিধাতার বিধান এমনই যে,—"কন্যা সঙ্গে রাজার নাহি ওসুমিস্"। কেন না, সুপুরুষ আজিজ-মিসির জোলেখার নিকটবর্ত্তী হইলেই রতিরসহীন হইয়া কাল যাপন করেন। ইহাতে জোলেখা আনন্দিতা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমাতুর হৃদয় উদ্দিষ্ট বাঞ্ছিতের বিরহে নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি কি ভাবে স্বামিরূপী শত্রুর পুরীতে বাস করিতেছিলেন, তাহার প্রতি শুধু মানস নয়নে, কল্পনার নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। এই সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সামগ্রী এবং বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি লাভ করেন নাই। দাবানলসদৃশ বিরহ নিয়তই তাঁহার হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাঞ্ছিতের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সতত চঞ্চল অবস্থায় কাল যাপন করিতেছিল। এই বিশাল রাজপুরীতে সর্ব্বদা সহস্র সহস্র দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার অন্তরের বেদনা, মর্ম্মের দাহ, হৃদয়ের পীড়া নিবেদন করিবার স্থান ছিল না। তাই বাধ্য হইয়াই তিনি—

"গগনে তারক দেখি চাহে একমন।
তার সঙ্গে কাহিনি কহএ সর্ব্বক্ষণ॥

তুহ্মিসব ভ্রমিতে আছহ রাত্র দিন।
তোহ্মা অবিদিত নাহি ভোবন এ তিন॥

দুঃখের কাহিনি কহি গোঞাএ রজনি।
বিসেস তাপিত মন বিরহ আগুনি॥

চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ উদএ হৈলে হএ আনমন॥

প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে।
রাদিত বদন তান প্রতি উসাকালে॥

এইরূপে নীরবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জোলেখা সুন্দরী দিন কাটাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল,—তাঁহার বেদনা-জর্জ্জর প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ

মানিল না। তাঁহার বাঞ্ছিত প্রিয়ের কোন উদ্দেশ তিনি লাভ করিলেন না। তাঁহার এই বিরহ-বিধুর চিত্র কবি মোহাম্মদ সগীর "বারমাসীতে" অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

এ দিকে জোলেখা সুন্দরী এইরূপ মর্ম্মদাহী বিরহানলে জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় শুদ্ধ এবং ধীরে ধীরে বাঞ্ছিত প্রিয়তমের প্রেমে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। আর ঐ দিকে তাঁহার প্রিয়তম য়ুসুফও জোলেখার সহিত বিধি-নির্ব্বন্ধ মিলনের জন্য নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া নানা জীবন-বিপর্য্যয় অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন। য়ুসুফের কবি-বর্ণিত জীবন-সূত্র ধরিয়া এইবার আমরা এ দিকে দৃষ্টিপাত করিব।

কেনান দেশে এয়াকুব নবীর আবির্ভাব হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একে একে দশ জন বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। য়ুসুফ তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত একাদশ পুত্র। কালক্রমে ইবন্ন আমীন নামে য়ুসুফের আরও এক ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। য়ুসুফ অনন্ত রূপ লইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া পিতা তাঁহাকে নিতান্তই আদর করিতেন; এই জন্য য়ুসুফের দশ ভ্রাতা তাঁহাকে অত্যন্ত হিংসা করিতেন। এই সময়ে—

"এক রাত্রি ইছুপ আপনা বাসঘর।
অচেতন হই নিদ্রা জাএ ঘোরতর॥
সব্যাগুথে অলক্ষিতে দেখিলা সপন।
হেন অপরূপ নাহি দেখে কোন জন॥
একাদশ নৈক্ষত্র আওরে রবি সসি।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভুমিতলে পসি॥
চৈতন্ত পাইআ সপ্ন বাপেত কহিলা।
সপ্নের বৃত্তান্ত জথ সকল জানাইলা॥

এয়াকুব নবী কাহাকেও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইতে য়ুসুফকে নিষেধ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি য়ুসুফকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, যেন তাঁহার দশ ভ্রাতা এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই জানিতে না পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, য়ুসুফ তাঁহার পর "নবী" হইবেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান দশ ও ভাবী এক, এই একাদশ ভ্রাতা কালক্রমে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে।

কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনই যে, এই স্বপ্নের কথা য়ুসুফের ভ্রাতৃগণের অগোচর রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের ভ্রাতার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সুতরাং তাঁহারা য়ুসুফকে পিতৃসন্নিধান হইতে সরাইয়া বধ করিয়া ফেলিতে ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইরূপেই নিষ্কণ্টক হইলে তাঁহারা পিতৃস্নেহের পূর্ণ অধিকারী হইবেন। পরামর্শের পর স্থির হইল, য়ুসুফকে মৃগয়ার ছলে বনে নিয়া হত্যা করা হইবে এবং পিতার নিকট তাঁহাকে বাঘে খাইবার কথা প্রচার করিয়া ভ্রাতৃহত্যার দায় হইতে নিস্তার লাভ করা হইবে।

যথাযুক্তি কাজ করা হইল। কপট মমতায় এয়াকুব নবীকে ভুলাইয়া, বালক য়ুসুফকে বনে নেওয়া হইল। বনে পৌছিয়াই ভ্রাতৃগণ অসহায় য়ুসুফকে হত্যার মানসে প্রহার করিতে

জেবা তুহ্মি ভিত কর সঙ্গম তাহার।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে ন হৈব শৃঙ্গার॥

রত্তন মন্দির তোর বজ্রের কপাট।
তার মুক্ত নহে মুক্ত করিতে সে বাট॥

এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়া, তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের কোণে অলক্ষিতে একটি ক্ষীণ আশার বিদ্যুৎরেখা খেলিয়া গেল। যত যুগ যুগান্তের পরেই হউক, একদিন বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত হইবেন, এই আশ্বাসে তাঁহার প্রাণ চকিতে এক অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার এই মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল, "মৃত্যু-কায়া হোন্তে জেন আইল নিশ্বাস"। মিছিল পূর্ব্ববৎ মহাসমারোহে চলিতেছিল। যথাসময়ে জোলেখা রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজপুরীতে বিবাহের যথাবিধি আয়োজন হইয়াছিল। উভয়ে রাজপুরীতে পৌঁছিলে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে যথারীতি "পুষ্পশয্যার" ব্যবস্থা হইল। কিন্তু হায়, বিধাতার বিধান এমনই যে,—"কন্যা সঙ্গে রাজার নাহি ওসৃমিস্"। কেন না, সুপুরুষ আজিজ-মিসির জোলেখার নিকটবর্ত্তী হইলেই রতিরসহীন হইয়া কাল যাপন করেন। ইহাতে জোলেখা আনন্দিতা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমাতুর হৃদয় উদ্দিষ্ট বাঞ্ছিতের বিরহে নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি কি ভাবে স্বামিরূপী শত্রুর পুরীতে বাস করিতেছিলেন, তাহার প্রতি শুধু মানস নয়নে, কল্পনার নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। এই সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সামগ্রী এবং বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি লাভ করেন নাই। দাবানলসদৃশ বিরহ নিয়তই তাঁহার হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাঞ্ছিতের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সতত চঞ্চল অবস্থায় কাল যাপন করিতেছিল। এই বিশাল রাজপুরীতে সর্ব্বদা সহস্র সহস্র দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার অন্তরের বেদনা, মর্ম্মের দাহ, হৃদয়ের পীড়া নিবেদন করিবার স্থান ছিল না। তাই বাধ্য হইয়াই তিনি—

"গগনে তারক দেখি চাহে একমন।
তার সঙ্গে কাহিনি কহএ সর্ব্বক্ষণ॥

তুহ্মিসব ভ্রমিতে আছহ রাত্র দিন।
তোহ্মা অবিদিত নাহি জোবন এ তিন॥

দুঃখের কাহিনি কহি গোঞাএ রজনি;
বিসেস তাপিত মন বিরহ আগুনি॥

চান্দ জেন মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ উদএ হৈলে হএ আনমন॥

প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে।
রূদিত বদন তান প্রতি উসাকালে॥

এইরূপে নীরবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জোলেখা সুন্দরী দিন কাটাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল,—তাঁহার বেদনা-জর্জ্জর প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ

মানিল না। তাঁহার বাঞ্ছিত প্রিয়ের কোন উদ্দেশ তিনি লাভ করিলেন না। তাঁহার এই বিরহ-বিধুর চিত্র কবি মোহাম্মদ সগীর "বারমাসীতে" অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

এ দিকে জোলেখা সুন্দরী এইরূপ মর্ম্মদাহী বিরহানলে জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় শুদ্ধ এবং ধীরে ধীরে বাঞ্ছিত প্রিয়তমের প্রেমে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। আর ঐ দিকে তাঁহার প্রিয়তম য়ুসুফও জোলেখার সহিত বিধি-নির্ব্বন্ধ মিলনের জন্য নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া নানা জীবন-বিপর্য্যয় অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন। য়ুসুফের কবি-বর্ণিত জীবন-সূত্র ধরিয়া এইবার আমরা এ দিকে দৃষ্টিপাত করিব।

কেনান দেশে এয়াকুব নবীর আবির্ভাব হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একে একে দশ জন বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। য়ুসুফ তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত একাদশ পুত্র। কালক্রমে ইবনু আমীন নামে য়ুসুফের আরও এক ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। য়ুসুফ অনন্ত রূপ লইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া পিতা তাঁহাকে নিতান্তই আদর করিতেন; এই জন্য য়ুসুফের দশ ভ্রাতা তাঁহাকে অত্যন্ত হিংসা করিতেন। এই সময়ে—

"এক রাত্রি ইছুপ আপনা বাসঘর।
অচেতন হই নিদ্রা জাএ ঘোরতর॥
সয্যাশুথে অলক্ষিতে দেখিলা সপন।
হেন অপরূপ নাহি দেখে কোন জন॥
একাদশ নৈক্ষত্র আওরে রবি সসি।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভুমিতলে পসি॥
চৈতন্ত পাইআ সপ্ন বাপেত কহিলা।
সপ্নের বৃত্তান্ত জথ সকল জানাইলা॥

এয়াকুব নবী কাহাকেও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইতে য়ুসুফকে নিষেধ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি য়ুসুফকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, যেন তাঁহার দশ ভ্রাতা এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই জানিতে না পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, য়ুসুফ তাঁহার পর "নবী" হইবেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান দশ ও ভাবী এক, এই একাদশ ভ্রাতা কালক্রমে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে।

কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনই যে, এই স্বপ্নের কথা য়ুসুফের ভ্রাতৃগণের অগোচর রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের ভ্রাতার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সুতরাং তাঁহারা য়ুসুফকে পিতৃসন্নিধান হইতে সরাইয়া বধ করিয়া ফেলিতে ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইরূপেই নিষ্কণ্টক হইলে তাঁহারা পিতৃস্নেহের পূর্ণ অধিকারী হইবেন। পরামর্শের পর স্থির হইল, য়ুসুফকে মৃগয়ার ছলে বনে নিয়া হত্যা করা হইবে এবং পিতার নিকট তাঁহাকে বাঘে খাইবার কথা প্রচার করিয়া ভ্রাতৃহত্যার দায় হইতে নিস্তার লাভ করা হইবে।

যথাযুক্তি কাজ করা হইল। কপট মমতায় এয়াকুব নবীকে ভুলাইয়া, বালক য়ুসুফকে বনে নেওয়া হইল। বনে পৌঁছিয়াই ভ্রাতৃগণ অসহায় য়ুসুফকে হত্যার মানসে প্রহার করিতে

আরম্ভ করিল। সরলপ্রাণ বালক য়ুসুফের এই নিঃসহায় অবস্থা বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয়-বিদারক। এই করুণ দৃশ্য দেখিলে মানুষের কথা দূরে থাকুক, পাষাণের হৃদয়ও গলিয়া যায়। এই দৃশ্য অঙ্কন করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

"কোহ্ন ভাই করঘাত অঙ্গেত মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণি বুলি কর্ণ মোচরিল॥
কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিআ চাপর।
একে একে কাড়ি লৈল গাএর কাপর॥
কেহো ভাই ক্রোদ্ধ হই মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত দয়াভাগে॥
সেহো ভাই ঠেলা দিয়া পেলে এক পাস।
আর ভাইকাছে গেল হইয়া হতাস॥
সেহো ভাই নিদয়া হৃদএ হৈআ মারে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র আড়ে॥
কোহ্ন ভাই মায়া নাই সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুস্মরি॥"

এইরূপ নির্ম্মমভাবে মারিতে মারিতে হঠাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সকলকে বলিলেন যে, আর এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে না মারিয়া, য়ুসুফকে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হউক। রক্তাক্তকলেবর য়ুসুফকে সত্য সত্যই এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হইল এবং তাঁহার শোণিত-সিক্ত বস্ত্র লইয়া আসিয়া এয়াকুব নবীকে বুঝান হইল যে, য়ুসুফকে বাঘে খাইয়াছে। কিন্তু এয়াকুব নবীর হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তিনি প্রিয়তম পুত্রের নিধন-সংবাদে শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং শোকাকুল হইয়া তিনি খেদ করিতে লাগিলেন,—

"মোর কর্ম্ম দোস, বিধি কৈল রোস,
কোন পাপ মোর বাধা।
জাই ভিন্ন দেস, ব্রহ্মচারি ভেস,
পুরিতে মনের সাধা॥
ঘরে ঘরে জাই, পুত্র যথা পাই,
পুত্র হেন ভিক্ষা মাগোঁ।
কোন ধর্ম্ম সিক্ষা, পুত্র দিব ভিক্ষা,
তান পদগত লাগোঁ॥"

কিছুতেই কিছু হইল না; এয়াকুব নবী পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া বিষাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু বারংবার তাঁহার মনে হইত যে, তাঁহার প্রাণপ্রিয় য়ুসুফ যেন বাঁচিয়া আছেন। য়ুসুফ সত্য সত্যই কূপে পড়িয়াও জীবিত ছিলেন।

য়ুসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার পরেই "মনিরু" নামক এক মিসরদেশীয় বণিকের নেতৃত্বে একদল বণিক্ ঐ বনপথে চলিতে চলিতে কূপ-সন্নিহিত কোন এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছিল। এই সময়ে তাহাদের জলাভাব ঘটে। তাহারা জলের অন্বেষণে বাহির হইয়া, নিকটেই কূপ দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং জলের জন্য দড়ি বাঁধিয়া কূপে "কুম্ভ" ফেলিয়া দিল। য়ুসুফ নীরবে কুম্ভে উঠিয়া বসিলেন। "সাধুগণ" তাঁহাকে পাইয়া মনিরুর নিকট লইয়া গেল। সাধু মনিরু এই অপরূপ বালকটিকে লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং বাণিজ্যযাত্রা বন্ধ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে য়ুসুফের দশ ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বণিক্‌দলে য়ুসুফকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনিরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"আমরা আমাদের দুষ্ট দাসকে কূপে ফেলিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তোমরা যখন তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছ, তখন হয় তাহার মূল্য দাও, নয় তাহাকে ফেরৎ দাও।" ইহাতে—

"সাধু বোলে মোর ঠাক্রি ধন নাহি আর।
তামার ঢেপুয়া লও এই মূল্য তার।"

মনিরু সাধু "তামার ঢেপুয়া" দিয়া য়ুসুফকে কিনিয়া লইলেন এবং যথাসময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মিসর দেশে পৌঁছিলেন। যেখানেই য়ুসুফকে লইয়া যাওয়া হইত, সেইখানেই তাঁহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিবার জন্য নানা স্থান হইত লোকজন ছুটিয়া আসিত। অচিরকাল মধ্যে য়ুসুফের সৌন্দর্য্যের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মিসররাজ আজিজ-মিসির য়ুসুফের কথা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে রাজপুরীতে লইয়া আসিতে সাধুর নিকট খবর দিলেন।

রাজাজ্ঞায় সাধু য়ুসুফকে লইয়া রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে য়ুসুফকে দেখিবার জন্য সমাগত হইল এবং সকলেই তাঁহাকে ক্রয় করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সাধু সুযোগ বুঝিয়া প্রচার করিলেন যে, য়ুসুফের শরীরের সমভার মহামূল্য সামগ্রীই এই ক্রীতদাসের মূল্য। এতৎসত্ত্বেও তাঁহাকে ক্রয় করিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু কেহই সফলকাম হইতেছিল না।

এই সময়ে জোলেখা তাঁহার প্রাত্যহিক নগর-ভ্রমণ হইতে উষ্ট্রারোহণে প্রত্যাবৃত্তা হইতেছিলেন। তিনি "গড়ের" অর্থাৎ রাজ-প্রাসাদের বহিঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জনকোলাহল শুনিয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন এবং ক্রীতদাসকে স্বয়ং একবার দেখিবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। য়ুসুফ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তাঁহাকে অবিকল স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিবৎ প্রতীয়মান হওয়ায়, জোলেখা ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি সর্ব্বস্বের বিনিময়েও য়ুসুফকে ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অতঃপর জোলেখা ও আজিজ-মিসির য়ুসুফকে ক্রয় করেন। এই সময়ে রাজানুগ্রহে রাজপুত্রবৎ সুখ শান্তিতে য়ুসুফ রাজপুরীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে জোলেখা উদ্ভিন্ন-যৌবনা যুবতীসুলভ নানা রঙ্গ-রস ও হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া দেব-চরিত্র য়ুসুফকে কামভাবে তৎপ্রতি প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু য়ুসুফ—

"জলিখার মনবাঞ্ছা দেখো সমদৃষ্টে।
ইছুফে হেরএ হেট মাথা পদপিষ্টে॥"

য়ুসুফের এহেন ঔদাসীন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুন্দরী জোলেখা স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন; তিনি সবিস্তারে জোলেখার যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁহার পদে নিবেদন করেন। য়ুসুফ কিছুতেই স্বীয় পুণ্যপথ হইতে টলিলেন না, কিছুতেই দেব-চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি নিস্পৃহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"বাপের গৌরবভয়ে হৈলু ভিন্নদেশ।
জলিখার ভাবে মোর কি আছে বিশেস॥
পুত্রবাচ দিয়া মোরে পুরীর ভিতর।
সমর্পিল জলিখার হাতের উপর॥
* * * *
কেহ জদি শুনে এহি দুরাচার বাণি।
ভোবন ভরিআ হৈব অযস কাহিনি॥

ধাত্রী বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। জোলেখা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই ভাবে য়ুসুফকে সৎপথভ্রষ্ট করা দুরূহ কাজ; সুতরাং অন্য পথ অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় নাই।

এইবার জোলেখা পুরীর বাহিরে এক সপ্তকক্ষ সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার নানা কক্ষে কামভাবোদ্দীপক নানা চিত্র ও বস্তুর সমাবেশ করা হইল। তাহা দেখিলে মানবের কথা দূরে থাক, দেবতার মনও টালিয়া যাইত। এই বিচিত্র মন্দিরে বাস করিবার জন্য য়ুসুফকে প্রেরণ করা হইল। কিছু দিন পর একদা জোলেখা এই মন্দির পরিদর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন। যথারীতি সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান যুগে জোলেখার এই সাজসজ্জার বর্ণনা বেশ উপভোগ্য বস্তু, সন্দেহ নাই,—

"জলিখা করএ বেস, চিকুর চামরি কেস,
বান্ধএ কানরি খোপা লাস।
নানা কুসুম্বিত জুতি, দেখি চমকিত মতি,
ঘন মৈদ্ধে নৈক্ষত্র প্রকাস॥
নয়ন খঞ্জন তুল, আঞ্জনে রঞ্জিত মূল,
চঞ্চল চকোর সমুদিত।
নিমেখে নির্ম্মল বাণ কটাক্ষেত সুসন্ধান,
বিরহিনি পন সচকিত॥
সিসেত সিন্দুর ভাসে, জেন রবি পরকাসে,
মুখচন্দ্রজুতি সমুদিত।
শ্রবণে শুম্ভিত মুতি, রতন কুণ্ডল জুতি,
তারাপ্রভা জিনিয়া বিদিত॥

গিমগত হিরা হার, রচিত সোবর্ণ সার,
গজমুতি বিরাজিত পান্তি।
তাহাত কুসুমমালা, বিসেস ষুভিত ভালা,
ঝিঝি সুতে গাথে কত ভাতি॥
কস্তুরি কুঙ্কুম বুন্দ, কপালে তিলক চন্দ,
জেন চন্দ্র নৈক্ষত্র পুরিত।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, কেসর সুগন্ধি সঙ্গ,
জিনি তনু কান্তি ষুসোভিত॥
কাকলি মণ্ডিত হার, সুরচিত পয়োভার,
বসন ভুসন আভরণ।
সুলৈক্ষ লাবণ্য বেস, মুহিত সকল দেস,
উনমত্ত নবিন জোবন॥
করেত কঙ্কণ বর, জেন চন্দ্র দিবাকর,
কনক মাণিক্য জুতি সার।
নানা অলঙ্কার রঙ্গ, সোবর্ণ রতন সঙ্গ,
রূপে সচি জেন অবতার॥
বাহুদণ্ডে তাড় ভারি সোবর্ণ উঝল ধারি,
চুনি মণি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
অঙ্গুরি মাণিক্য জরি, দশাঙ্গুলে ভরি পুরি,
বহুমুল্য জোবন বিধান॥
কটিত কিঙ্কিনি বাজে, জেন চন্দ্র ষুর সাজে,
কি কহিমু তাহার বাখান।
চরণে নপুর বাজে, কনক বরণ সাজে,
তার জুতি চমকে চরণ॥

এইরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিতা হইয়া সুন্দরী জোলেখা সপ্তকক্ষ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি য়ুসুফকে সঙ্গে লইয়া, একে একে কক্ষের পর কক্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শত প্রকারে সহস্র ভাবে প্রলুব্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। একটির পর একটি করিয়া যখন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন জোলেখা য়ুসুফের পদে আত্ম বিকাইয়া দিয়া বলিলেন,—

"মুঞি সুস্ক সস্য তুহ্মি জলদ নিপুণ।
বুন্দেক পড়িলে জল ন হৈবেক উণ॥
জাচক তুলনা আহ্মি তুহ্মি দাতা জন।
ভক্ষদান দিলে কত্তো ন টুটিব ধন॥
তুহ্মি সুধাকর আহ্মি ত্রিষ্ণাএ বিকল।
আহ্মা অল্প দিলে তোহ্মা ন টুটিব জল॥

তুহ্মি মোহা কল্পতরু ফলিত নির্ম্মল।
আহ্মা এক ফল দিলে ন হৈব নিফল॥
... ...
কৃপিনের ধন জেন করএ সঞ্চিত।
জাচক জনেরে কভো না কর বঞ্চিত॥"

ইহাতে যুসুফ টলিলেন না। তিনি বার বার ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন; বার বার ধর্ম্মনাশের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, তিনি চঞ্চল মূর্ত্তি পরিহার করিলেন এবং প্রশান্ত মনে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—

"খেমা কর মোর তরে কিছু কর দয়া।
অপকির্ত্তি হৈব তোহ্মা জগত ভরিয়া॥
... ...
খুধা হৈলে বিষ্টেক্ষ ভৈক্ষে নি ছুই করে।
তিষ্ণায় বহুল জল ন পিএ সত্বরে॥
পাথরে চাপিলে কর করিবেক কল।
জৌবন গরবে কম্মা না হৈঅ বিকল॥"

যুসুফের এহেন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া, জোলেখা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি কামাতুর মনে যুসুফকে জড়াইয়া ধরিতে সচেষ্ট হইলেন। পাপভয়ে যুসুফ ছুটিয়া পলাইলেন। জোলেখা পলায়নপর যুসুফকে তাড়া করিলেন; কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে যুসুফ যখন বাহির হইতেছিলেন, তখন জোলেখা যুসুফের জামার পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তিনি জামার কিয়দংশ জোলেখার হাতে রাখিয়া পলায়ন করিলেন। জোলেখার মাথায় বাজ পড়িল, তিনি শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন।

ইহার পর জোলেখা যুসুফের নামে সতীত্ব নাশের অপবাদ রটাইয়া দিলেন। আজিজ-মিসিরের হাতে যুসুফের বিচার হইল। আল্লার হুকুমে এক দুগ্ধপোষ্য শিশু সাক্ষ্য দিল। প্রমাণিত হইল যে, যুসুফের জামার পশ্চাদ্ভাগ যখন ছিন্ন, তখন নিশ্চয় তিনি এই ব্যাপারে নির্দ্দোষ। যুসুফ সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

এই ঘটনার পর একদা জোলেখা সখীদের সহিত যুসুফের অপরূপ রূপ-লাবণ্যের আলোচনা করিতেছিলেন। তাহারা যুসুফকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনা হইল। যুসুফ যখন সখীদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা নানা দ্রব্য ও ফলমূল আহার করিতেছিল; তাহারা যুসুফকে দেখামাত্রই এমনই মুগ্ধা হইল যে,—

"হাতেত তরুণ্ণা ফল কাতি খরসান।
হস্ত সমে ফল কাটে আন নাহি জ্ঞান॥
ঘুনিত্ত পড়এ জেন ফলরসধার।
কামভাবে নেহালন্ত মুখচন্দ্র তার॥
কর হোন্তে অবিরত পড়এ ঘুনিত্ত।
তথাপিহো নারি সবে চাহে একচিত্ত॥"

যুসুফকে দর্শন করিয়া জোলেখার সখীদের যে শোচনীয় অবস্থা হইল, তাহা দেখিলে মনে হয়,—

"জেন এক প্রদিপেত পতঙ্গ বহল।
পড়িতে চাহএ মিত্যু হইয়া আকুল॥
জেন এক সুধাতরু ফলন্ত উঙ্কল।
তলে থাকি সর্ব্বজনে খাইতে চাহে ফল॥
ধরিতে ন পারে ফল ন পড়এ হাতে।
খুদাএ বিকল সরিরেক্ত মর্ম্মঘাতে॥

ধীরে ধীরে জোলেখার সমস্ত কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। জোলেখা অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিলেন এবং আজিজ-মিসিরকে অনুরোধ করিয়া যুসুফকে বন্দী করাইলেন। এইরূপে রমণীর চক্রান্তে যুসুফ বন্দিজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরে আজিজ-মিসিরের মৃত্যু হইল। মিসরে এক নূতন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজা হইয়াই কোন অপরাধে দুইটি লোককে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এই দুই কয়েদীর সহিত কারাগারে যুসুফের পরিচয় হইল। একদা এই দুই কয়েদী দুইটি স্বপ্ন দেখিল। একজন দেখিল,—তাহার মস্তকস্থিত আহার্য্যপূর্ণ স্বর্ণথাল হইতে কাক ও চিল আহার্য্য সামগ্রী কাড়িয়া খাইতেছে। অপর ব্যক্তি দেখিল,—সে স্বর্ণের "কটোরা" লইয়া ভীতমনে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান। কয়েদীদ্বয় এই স্বপ্ন দুইটির ব্যাখ্যার জন্য যুসুফের শরণাগত হইল। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, শীঘ্রই প্রথমোক্ত কয়েদীর শিরশ্ছেদ ও দ্বিতীয়োক্ত কয়েদীর রাজানুগ্রহ লাভ ঘটিবে। ফলে তাহাই হইল এবং যুসুফের ব্যাখ্যার সত্যতা প্রতিপন্ন হইল।

অনন্তর মিসরের নবীন বাদশাহ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। ইহা কবির ভাষায় এইরূপ,—

সপ্ত বৃষ হৃষ্ট পুষ্ট অতি যুবলিত।
আর সপ্ত বৃস কৃস তনু দুর্ব্বলিত॥
খিনবল সপ্ত গরু বলবন্ত হৈয়া।
এহি সপ্ত বৃসক খাইতে গেল ধাইয়া॥
জেন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিয়া তাহাক ধরিল।
অহি সপ্ত পুষ্টতনু গরুক ভক্ষিল॥
আর এক অপুর্ব্ব দেখিল নৃপবর।
সপ্ত ছড়া গোহম (গোন্দম ?) পাছাইল তছু পর॥
শুক্লবর্ণ সপ্ত ছড়া তেহেন ঘুরিত।
জেহেন চামর দোলে অতি সুললিত॥
তাহার নিকট হোন্তে আর সপ্ত ছড়া।
পাছাইল তেহেন বর্জ্জিত জেন মরা॥
সপ্ত ছড়া মরএ জলিল পুর্ণ ছড়া।
সেই ক্ষণে বুথাইল জেম হই ঘরা॥

এইরূপ বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া রাজা পাত্রমিত্রকে ডাকাইয়া ইহার ব্যাখ্যা চাহিলেন। কেহই ঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েদীটি বাদশাহকে জানাইল যে, য়ুসুফ নামক যে কয়েদী আছে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ইহার সদুত্তর দিতে পারিবে না। বাদশাহ য়ুসুফকে কারামুক্ত করিয়া মহাসমারোহে রাজদরবারে উপস্থিত করিলেন। য়ুসুফ সকলকে স্তম্ভিত করিয়া ব্যাখ্যা দিলেন যে, মিসরে উপর্য্যুপরি সাত বৎসর অত্যধিক শস্য জন্মিবে এবং তৎপর ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর ধরিয়া অজন্মা হইবে। ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। রাজা য়ুসুফকে বলিলেন,—"য়ুসুফ, তুমি রাজকার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি; তোমাকে 'আজিজ-মিসির' (মিসরপ্রিয়, প্রধান মন্ত্রী ?) করিলাম; তুমি রাজ্যকে আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা কর।" য়ুসুফ "আজিজ-মিসির"-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই সাত বৎসর যাবৎ রাজ্যের স্থানে স্থানে রাজশস্যাগার স্থাপন করিয়া, তথায় সাত বৎসর যাবৎ শস্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মিসর-রাজের মৃত্যু হয়। সকলে মিলিয়া য়ুসুফকে মিসরের সিংহাসন দান করেন। য়ুসুফ রাজা হইয়াই দেশে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

এ দিকে জোলেখা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তখনও তিনি য়ুসুফকে ভুলিতে পারেন নাই। বহু বৎসর ধরিয়া মিসরের রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁহার বিশেষ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু য়ুসুফকে তিনি কিছুতেই হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। তিনি এখন ভিখারিণী; কিন্তু তথাপি পথের ধারে বসিয়া য়ুসুফের যাতায়াত নিরীক্ষণ করেন, চির উপেক্ষিত হৃদয়কে প্রিয়তমের দর্শনে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু য়ুসুফের আদেশে রাজপ্রহরীরা কোন রমণীকে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে দেয় না,—ইহাই জোলেখার অনুতাপ।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। একদা জোলেখা রাজপথের ধারে বসিয়া প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া য়ুসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। য়ুসুফ আদেশ দিলেন, এই বৃদ্ধা যাহা চায়, তাহা তাহাকে দান কর। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃদ্ধা য়ুসুফের দর্শন ব্যতীত আর কিছুই ভিক্ষা মাগিল না। তাঁহাকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল এবং যথাসময়ে য়ুসুফ বৃদ্ধাকে দর্শন দিলেন। এইখানেই য়ুসুফের সহিত জোলেখার নূতন করিয়া পরিচয় হয় এবং এখনও জোলেখা যৌবনের প্রেম পোষণ করিতেছেন দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া যান। বলা বাহুল্য, য়ুসুফ এখন "নবী"। জোলেখা তাঁহার পূর্ব্বযৌবন ভিক্ষা দিতে য়ুসুফকে অনুরোধ করেন। য়ুসুফের আশীর্ব্বাদে জোলেখা মুহূর্ত্তের মধ্যেই পূর্ব্বযৌবন লাভ করিলে, তিনি য়ুসুফকে জানাইলেন যে, এখন তাঁহাদের বিবাহে আর কোন বাধা নাই। খোদার হুকুমে য়ুসুফ ও জোলেখার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর জোলেখার গর্ভে একে একে য়ুসুফের দুই পুত্র জন্মে। এই সময়ে মিসরে সপ্তবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। য়ুসুফের পিতৃরাজ্য কেনান প্রদেশেও এই সময়ে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। মিসর ব্যতীত তখন আর কোথাও শস্য ছিল না। শস্য ক্রয়ের জন্য য়ুসুফের বিমাতার গর্ভজাত দশ ভ্রাতা এই সময়ে মিসরে আগমন করে। য়ুসুফ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলেন ও বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাহাদের মুখে য়ুসুফ জানিতে পারেন যে, তাঁহার পিতা এয়াকুব নবী তখনও জীবিত এবং ইবনু আমীন নামে তাহাদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। তিনি

ভ্রাতা ও পিতাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইলেন। যুসুফ তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলিলেন যে, ইবনু আমীনকে সঙ্গে লইয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে আরও অনুগ্রহ করিবেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত অপর ভ্রাতাদের সঙ্গে ইবনু আমীন শস্য ক্রয় করিবার জন্য মিসরে আসিয়া পৌঁছিলে, যুসুফের চক্রান্তে সে চোর বলিয়া ধৃত হইল এবং মিসরীয় আইন অনুসারে যুসুফ তাহাকে নিজের দাস করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিলেন।

ইহার পর ইবনু আমীনকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধ এয়াকুব নবীও মিসরে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিতাপুত্রে মিসরের রাজপ্রাসাদে মিলন হইল। জোলেখা আসিয়া—

"পাখালি নবির পদ নির্ম্মল করিলা।
জলিখা মস্তককেসে উপস্কার কৈলা॥

এই প্রসঙ্গে ভ্রাতাদের সহিত যুসুফের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। তিনি মধুপুর রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যা বিধুপ্রভার সহিত ইবনু আমীনের বিবাহ দিলেন। এইরূপে সকলে মিসরে সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

এইখানেই "যুসুফ জোলেখা" কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই কাব্যের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। যুসুফ ও জোলেখাই এই কাব্যের মূল নায়ক ও নায়িকা। ইহাদের চরিত্রের যাহা মূল বৈশিষ্ট্য, তাহা কবির সৃষ্ট নহে। "বাইবেল" ও "কোরআনে" এই দুইটি চরিত্রের সবল ও দুর্ব্বল দিকের চিত্র বেশ সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। কবি এই চিত্রগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার তুলিতে রং দিয়াছেন,—ইহাই কবির একমাত্র কৃতিত্ব।

চরিত্র সৃষ্টির দিক্ হইতে কবির কোন কৃতিত্ব না পাওয়া গেলেও, তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ কবি ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের আদর্শ তিনি যেথান হইতেই গ্রহণ করুন, বাঙ্গালা ভাষার এই চিত্র অঙ্কনে তিনি নানাভাবে মৌলিকত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বের প্রতিভা সর্ব্বত্র না হউক, এই কাব্যের অধিকাংশ স্থলে দেদীপ্যমান। এই কাব্যে মহাকাব্যসুলভ যে সৌন্দর্য্য (epic grandeur) রহিয়াছে, তাহা—কবি যে যুগে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন, সে যুগে নিতান্ত দুর্লভ না হইলেও অত্যন্ত সুলভও নহে। আদর্শ মানবীয় প্রেমের চিত্রকররূপে কবির বিশেষ কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্রকর হিসাবে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের আসরে উচ্চাসন না দিলে, তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হইবে।

বাস্তবিকই কবি মোহাম্মদ সগীরকে বেদনার কবি বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ব্যথার চিত্র অঙ্কনে এই কবি যেন সিদ্ধহস্ত। বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনা কবির লেখনীতে এমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, এক একবার কাব্য পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। কবির সহানুভূতির বৃত্তি এতই প্রবল যে, তিনি অতি সহজেই নায়কনায়িকার ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার নিজের মধ্যে তাহাদের বেদনা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন। এই জন্যই তাঁহার বর্ণিত দুঃখের চিত্রগুলি এতই করুণ; এই জন্যই এইগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। এইরূপ একটি চিত্রের নমুনা জোলেখার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে পাওয়া যায়:—

"নিসি উজাগর আখি ঝাম্বর বদন।
পবনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ॥
শুন রে পবন মোর দুক্ষের কাহিনী।
দণ্ডেক বরিখ মোর দীর্ঘল জামিনি॥
মোর পিয়া স্থানে গিয়া কহ রে সম্বাদ।
কেমোন মহাস্থ তান দাসি সঙ্গে বাদ॥
মলয়া সমির মোর সমন সমান।
এ চান্দ চন্দন দেহ দহএ নিদান॥
সঘন গহন ঘন বিদ্যু চমকিত।
নয়নে বহএ নির চিতা বিচলিত॥
কুসুম সুগন্ধি জথ আগর চন্দন।
আতপে তাপিত তনু দহএ মদন॥"

কবি প্রধানতঃ মহাকাব্যসুলভ সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা হইলেও, তাঁহার রচনা গীতিপ্রবণ। কাব্যের স্থলে স্থলে তিনি যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে সুন্দর সুন্দর গীতাবলীর সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার শিল্প-জ্ঞানের পরিচায়ক নহে, তাহা তাঁহার গীতি-প্রবণ হৃদয়ের সাক্ষ্যও বহন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রধানতঃ গীতিকবিতার যুগ। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যুগ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ন্যায় গীতি-কবিতারচকদিগের আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্য মালাধর বসু, জৈনুদ্দিন ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি কবির ন্যায় মহাকাব্যরচয়িতাদিগকে লাভ করিয়াছিল। মনে হয়—এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে কবি মোহাম্মদ সগীরের জন্ম; তাঁহাকে এই গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের যোগসূত্র বলিয়া ধরা যায়।

তাঁহার গীতগুলি কাব্যের নায়ক-নায়িকার বেদনাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিলেও, বঙ্গের তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কবিদের মধ্যে এইগুলির কোন কোনটির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। গল্পের প্রথমাংশে উদ্ধৃত "শুন শুন সখি" নামক গানটি পাঠ করিতে করিতে চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের" কোন কোন গানের শুধু ভাব নহে, ভাষার কথাও মনে পড়ে। আবার যখন আমরা পাঠ করি,—

"মুঞি জেন এক, পন্থিক দুখিক,
ত্রিষ্ণাএ বিকল হৈয়া।
জলের উদ্দেস, ন পাই প্রাণ সেস,
চলিলু বিফল হৈয়া॥
দিঠ ভরমএ, অন্তরে দহএ,
জলরূপ অনুমান।
গেলু সন্নিকট, পাইলু সঙ্কট,
নবিন রৌদ্রের বাণ॥"

তখন বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের সুপ্রসিদ্ধ "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" নামক কবিতাটির কথা মনে পড়ে; বিশেষ করিয়া এই কবিতার শেষ দুইটি চরণ—

"তিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গল।"

আমাদের বার বার এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, কবি মোহাম্মদ সগীরের মধ্যে তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যুগের গীতি-লালিত্য "য়ুসুফ-জলিখার" ন্যায় মহাকাব্যকে আশ্রয় করিয়াও ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছে।

কাব্যে "বারমাসীর" আমদানী প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বারমাসীতে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ নায়িকার বিরহ-বেদনাকে বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক সময় পাঠকের বিরক্তিকর মায়াকান্না জুড়িয়া দেন। কবি মোহাম্মদ সগীরও তাঁহার কাব্যে জোলেখার বিরহ-বেদনাকে আশ্রয় করিয়া "বারমাসী" গাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার এই বারমাসীটি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যে প্রাচীনতম বারমাসী। প্রাচীনতম "বারমাসী" হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে ইহার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত, তাঁহার "বারমাসীর" অন্য বৈশিষ্ট্যও বর্ত্তমান। তাঁহার বারমাসীতে কবির বাক্‌সংযমই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই জন্যই এই "বারমাসীটি" তাঁহার পরবর্ত্তী কালে রচিত "বারমাসী" হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাতে যথাসম্ভব অল্প বাক্যব্যয়ে কবি জোলেখার যে বিরহ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই বারমাসীতে নায়িকার বিরহভোগ অপেক্ষা ষড়্‌ঋতুবিলাসিনী বাঙ্গালার ঋতুবিলাসের একটি প্রকৃত চিত্র অঙ্কনে কবি অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিতে পাই। এই চিত্রের কিয়দংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

"আশ্বিন জে পরবেস, বারিসা হইল সেস,
থেনে ঘোর থেনেকে বিদ্যুত।
কেতকি বকুল ফুল, তাহাতে ভ্রমরা রোল,
তা দেখি ধরাইতে নারি চিত॥
খণ্ড খণ্ড মেঘগণ, সসোদর সম্ম রণ,
ডুবকি উঠএ ঘনজিত।
তাহার নির্ম্মল নিসি, সুধা বিস্তারিত হাসি,
তা দেখিয়া মন বিচলিত॥
আইল কার্ত্তিক মাস, চতুর্দ্দিগ পরকাস,
মন্দ মন্দ দেহ প্রতুসাএ।
তা হেরি উদাস পিআ, বিরহে বিদরে হিয়া,
মন পঙ্খি উরিছে উশ্ছাএ॥
নিসি দিসি উঝলিত, তারাগণ বিস্তারিত,
বহএ সমির থির ধারি।
ধবল কাচিআ ফুল, জেহেন পতকা তুল,
মদন চামর চমৎকারি॥

আঘ্রণ আইল রিত, নব সালি সমুদিত,
    শুগন্ধি সৌরষ জাএ দুর।
সারি শুক করে রোল, নানা বর্ণ ধান্য ফুল,
    বিকসিত সব খিতিপুর॥
ঘরে ঘরে ধান্যরাসি, নর পশুগণ হাসি,
    গগন রুচিত পরকাস।
রাজা প্রজা উল্লসিত, প্রবাস বঞ্চিত রিত,
    মোর লৈক্ষে জেন বনবাস॥
পৌস আইল তুসারিত, জোবন পুরিত সিত,
    থোহামএ জেন বৃষ্টিকার।
জুবক জুবতি মিলি, কর্পূর তাম্বুল তুলি,
    বিলাসিত নানা শুখ সার॥
মুঞি বর হতভাগি, অহনিসি রহোঁ জাগি
    প্রভু মোর নিদয়া হৃদএ।
মোহাম্মদে কহে দুখি অবস্য হইবা শুখি
    নিসি সেসে রবির ওদএ॥"

মুহম্মদ এনামুল্ হক্

মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব*

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ১৩৪১ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায় (১-১৩ পৃষ্ঠায়) আমরা লিখিয়াছিলাম, বর্ত্তমান 'মহাভারতে' স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার সমর্থনে যে প্রমাণটি তথায় উপস্থিত করা গিয়াছিল, উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কেন না, তাহার ভিন্নার্থও করা যাইতে পারে। তখনই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আমরা ঐ বিষয়ে একটা নূতন প্রমাণ পাইয়াছি। উহা একেবারে অকাট্য।

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে, অগ্নি পনর দিন ধরিয়া খাণ্ডববন দাহ করিয়াছিল। তৎসম্পর্কে মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন,—

"তদ্বনং পাবকো ধীমন্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।
দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ ॥"[১]

'হে ধীমন্! কৃষ্ণ এবং পার্থ কর্ত্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ ("দশ পঞ্চ চ") দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল।' তাহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি কহিয়াছেন,—

"পাবকশ্চ তদা দাবং দগ্ধ্বা সমৃগপক্ষিণম্।
অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিররাম সুতর্পিতঃ ॥"[২]

'১৫ ("পঞ্চ চৈকঞ্চ") দিবস ধরিয়া মৃগপক্ষিসমাকুল (সেই) বন দগ্ধ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া অগ্নি বিরত হইল।'

এই দ্বিতীয় উক্তিস্থ "পঞ্চ চৈকঞ্চ" অবশ্যই ১৫ এই সংখ্যা খ্যাপন করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা প্রথম বচনের "দশ পঞ্চ চ" অর্থাৎ ১৫ সংখ্যার সহিত উহার বিরোধ হইবে। ইহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে, বর্ত্তমান 'মহাভারত' সঙ্কলনের সময়ে (৫০০ শক-পূর্ব্বাব্দে) হিন্দুস্থানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইত, এবং অঙ্কপাতে তাহাতে বামাগতি অনুসৃত হইত। সুতরাং দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীও তখন জানা ছিল।[৩] এ বিষয়ে অপর স্বতন্ত্র প্রমাণ পূর্ব্বপ্রবন্ধেই প্রদত্ত হইয়াছে।

আরও একটা দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু উহা বড় সন্দেহাস্পদ। বনবাসকালে তীর্থ-মাহাত্ম্যবর্ণনাচ্ছলে পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে বলেন, যমুনা নদীর তীরে ("যমুনামনু") অগ্নিশির নামক তীর্থে সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী ভরত "বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ" অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ হয়মেধানুপাহরৎ।"[৪]

---

* ১৩৪২।১৯এ ফাল্গুন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। 'মহাভারত', নীলকণ্ঠকৃত টীকা সমেত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং 'বঙ্গবাসী' কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শক, আদিপর্ব্ব, ২২৮।৪৩

২। ঐ, আদিপর্ব্ব, ২৩৪।১৫

৩। প্রক্ষিপ্ততাবাদের ও পাঠভ্রান্তির শঙ্কা তুলিয়া দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী ও স্থানীয়মানতত্ত্ব আবিষ্কারের প্রাচীনত্ব বিষয়ে এই নবোপস্থাপিত প্রমাণের মূল্য হ্রাস করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বচন দুইটি প্রক্ষিপ্ত কি না এবং তাহাদের বর্ত্তমান পাঠ অভ্রান্ত কি না, তাহা নির্দ্ধারণের উপায় কি? এই পর্য্যন্ত 'মহাভারতে'র যতগুলি প্রধান প্রধান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিতে উহারা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ এই সুদূর পল্লীগ্রামে লেখকের নাই।

৪। বনপর্ব্ব, ৯০।৮

ঐ বাক্যে বিবক্ষিত সংখ্যা কোন্‌টি? নীলকণ্ঠ মনে করেন, ১৪৮ (=২০×৭+৮)। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "বিংশতিঃ" স্থলে "বিংশতিং" পাঠ ধরিলে, উহাদ্বারা ৩৫ (=২০+৭+৮) সংখ্যা বুঝাইত।[৫] কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত বঙ্গভাষান্তরে[৬] এই শেষোক্ত সংখ্যাই (৩৫) উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সংখ্যাদ্বয়ের কোনটিই বক্তার অভিপ্রেত নহে, বোধ হয়।

'মহাভারতে'র আরও দুই স্থলে রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের যজ্ঞের উল্লেখ আছে। পরমর্ষি বেদব্যাস মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—ভরত যমুনাসমীপে ("যমুনামনু") ১০০, সরস্বতী নদীর তীরে ৩০০ এবং গঙ্গাতীরে ("গঙ্গামনু") ৪০০ অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"সোঽশ্বমেধশতেনেষ্ট্বা যমুনামনু বীর্য্যবান্।
ত্রিশতাশ্বান্ সরস্বত্যাং গঙ্গামনু চতুঃশতান্॥"[৭]

কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, ভরত যমুনাতীরে ১০৩, সরস্বতীতীরে ২০ এবং গঙ্গাতীরে ১৪ অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

"যো বদ্ধা ত্রিশতং চাশ্বান্ দেবেভ্যো যমুনামনু।
সরস্বতীং বিংশতিঞ্চ গঙ্গামনু চতুর্দ্দশ॥"[৮]

এইরূপে দেখা যায়, মহারাজ ভরত যমুনাতীরে কতটি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান 'মহাভারতে' তিন প্রকার উক্তি রহিয়াছে। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, শেষের উক্তিদ্বয় নারদ-সৃঞ্জয়-সংবাদের অন্তর্গত। আদিতে দেবর্ষি নারদ মহারাজ সৃঞ্জয়ের পুত্রশোক অপনোদনের জন্য তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ প্রাচীন যোল জন রাজার কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। অভিমন্যুশোকবিহ্বল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মহর্ষি ব্যাস তাঁহার নিকটে ঐ ষোড়শ-রাজিক উপাখ্যান বিবৃত করেন কুরুক্ষেত্রমহাসমরের পরে যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদনার্থ কৃষ্ণ উহার পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁহাদের দুই জনের উক্তিতে ঐ প্রকার ভেদ অবশ্যই পাঠভ্রমজনিত বলিতে হইবে। প্রকৃত পাঠ যে কি, বিশেষতঃ রাজচক্রবর্ত্তী ভরত যমুনাসমীপে কত অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয়ের উপায়ও দেখা যায় না। 'ভাগবতে'র উক্তি বিষয়টাকে আরও জটিল করিয়া দিয়াছে। তথায় আছে, ভরত যমুনাসমীপে ৭৮ ও গঙ্গাসমীপে ৫৫, মোট ১৩৩ ("ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং") অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

"বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ" বাক্যের 'বিংশতিঃ+সপ্ত চাষ্টৌ চ' এই প্রকারে পদযোজনা করিলে এবং 'সপ্ত চাষ্টৌ চ' পদে নামসংখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে ধরিলে, বিবক্ষিত সংখ্যা হইবে, বামাগতিতে ২০+৮৭=১০৭, অথবা দক্ষিণাগতিতে ২০+৭৮=৯৮। এই শেষের সংখ্যাটীই (৯৮) এক শতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আসন্ন। উহাকেই মহর্ষি ব্যাস স্থূলভাবে শত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অনুমান করা যাইতে পারে। 'সপ্ত চাষ্টৌ চ' সংখ্যাকে ৭৮ বলিয়া গ্রহণ করিলে, 'ভাগবতে'র উক্তির সঙ্গেও কতকটা সঙ্গতি থাকে।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

৫। নীলকণ্ঠের উক্তি এই,—"বিংশতিঃ বিংশতিবারমাবর্ত্তিতঃ সপ্ত অষ্টৌ চেতি অষ্টচত্বারিংশদধিকং শতম্। ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং রাজেতি তু শ্রুতিঃ। বিংশতিমিতি পাঠেঽভ্যস্তহীনসংখ্যত্বাৎ পঞ্চত্রিংশৎ।"

৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনূদিত মহাভারত, কলিকাতা, হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, ১৩১০ সাল, নবতিতম অধ্যায়, ২৫১ পৃষ্ঠা।

৭। দ্রোণপর্ব্ব, ৬৬।৮ ৮। শান্তিপর্ব্ব, ২৯।৪৬

ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি

AN EXTENSIVE

VOCABULARY,

Bengalese and English. & Udiya

VERY USEFUL

TO TEACH THE NATIVES ENGLISH,

AND

TO ASSIST BEGINNERS IN LEARNING
THE BENGAL LANGUAGE.

CALCUTTA,
PRINTED AT THE CHRONICLE PRESS.
MDCCXCIII.

আপজন-এর অভিধানের আখ্যা-পত্র

ক

কাঁটালিকলা	a plantain of an angular kind	କାଁଠାଲି କଦଳି
কাটাইতে	to caufe to cut	କଟାଇବାକୁ
কাটার	a poignard, dagger	କଟାରୀ
কাটারি	a crooked broad knife	କଟାରି
কাটিতে	to cut, to hew	କାଟିବାକୁ
কাটিতে আঁখর	to blot a letter	କାଟିବାକୁ ଅକ୍ଷର
কাটনাকাটিতে	to fpin	କାଟିଣା କାଟିବାକୁ
কাটরা	a fence of boards	କାଠିଆ
কাঠুর্যা	a wood-cleaver	କାଠୁଆ
কাঁটা	a thorn, a fork, a fifh-bone	କଣ୍ଟା
কাঠ	wood	କାଠ
কাঠ বেরাল	a fquirrel	କାଠ ବିଲେଇ
কাঠের	wooden, of wood	କାଠର
কাঠখড়	fire-wood	କାଠଖଡି
কাঠের মাড়	a float of timber	କାଠଭଗାଡ
কাঠা	a meafure, a cotta or piece of ground [4 ells fquare	କାଠା
কাড়াকাড়ি	force, violence	କଡାକଡି
কাড়িয়া আনিতে	to get by force	କାଟିଆଣିବାକୁ

আপজন-এর অভিধানের এক পৃষ্ঠা

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান*

এখন পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে পাদ্রি মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাউঁ রচিত *Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez* নামক পুস্তককেই সর্ব্বপ্রথম বাংলা শব্দসংগ্রহ বা অভিধান বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে[১] পোর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে Francisco Da Sylvaর ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। বইটি সম্পূর্ণ রোমান হরফে ছাপা। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিখ্যাত চার্লস উইলকিন্স সর্ব্বপ্রথম[২] নিজে ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ ঢালাই করেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড কর্ত্তৃক ইংরেজীতে লিখিত বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengal Language* নামক পুস্তকে সেই হরফ প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরে কয়েকটি আইনের পুস্তক মুদ্রিত হয়। ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বাংলা এবং দেশীয়গণ কর্ত্তৃক ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগে ইংরেজী বাংলা এবং বাংলা ইংরেজী শব্দসংগ্রহ (vocabulary) বা অভিধানও প্রস্তুত হইবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা এতদিন পর্য্যন্ত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রিত কোনও অভিধানের সন্ধান পাই নাই।

---

* ১৩৪৪।১৩ই আষাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১. "The First Bengali Grammar and Dictionary were in Portugueze. The title of the work is *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes.........Lisboa, 1743.* Bengali Grammar, pp. 1—40 ; Vocabulary Bengali-Portuguese, pp 41—306 ; Portuguese-Bengali, pp. 307—577. The whole is in the Roman character, the words being spelt according to the rules of Portuguese pronunciation".—Sir George Grierson, Linguistic Survey of India, vol. v, pt. 1, p. 23.

"এই বইয়ের দুইখানি প্রতিলিপি লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আছে। একখানি খণ্ডিত, আর খানি সম্পূর্ণ।.........পৃষ্ঠা সংখ্যা X, 592 ; প্রথম দশ পৃষ্ঠা ভূমিকা প্রভৃতি লইয়া ; তৎপরে ১—৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ব্যাকরণ ; ....তৎপরে ৪১—৫৯২ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শব্দসংগ্রহ, ৪১—৩০৬ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পোর্ত্তুগীস, ও ৩০৭—৫৭০ পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগীস-বাঙ্গালা ; এবং ৫৭১—৫৯২ পর্য্যন্ত বাকী পৃষ্ঠায় নানারূপ শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে—" ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'পাদ্রি মানোএল-দা-আসসুম্পসাম-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—(কলি. বি. বি.) এর প্রবেশক পৃঃ ১৬। এই পুস্তকে মূল বহির টাইটেল পেজ ও চারিটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আছে।

উপরোক্ত দুই জনই বইটি চোখে দেখিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আলোচনা করিয়াছেন, Father H. Hosten, *Bengal : Past & Present*, vol. IX, pt. 1, p. 42 ; vol. XIII, pt. 1, pp. 67—68 (ইহাতে মূল বহির টাইটেল পেজ ও অপর দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আছে) ; ডক্টর সুশীলকুমার দে—*Bengali Literature in the Nineteenth Century* (C. U. 1919) p. 75 ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ এবং কেদারনাথ মজুমদার, 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭ (ইহাতে টাইটেল পেজের প্রতিলিপি আছে)।

২. হালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকা, পৃঃ XXIII-XXIV.

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী পিট্স্ ফরষ্টার ('Senior Merchant on the Bengal Establishment') প্রণীত *A Vocabulary, in two parts, English and Bongalee, and Vice Versa* নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড (ইংরেজী হইতে বাংলা) কলিকাতার 'Ferris and Co.'র প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ii+XX+421। ইহারই দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা ইংরেজী) উপরোক্ত প্রেস হইতে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা 443+IX। লঙ্ সাহেবের মতে এই পুস্তকে প্রায় ১৮০০০ বাংলা শব্দ আছে। (*A Descriptive Catalogue of Bengali Books*, p. 2)। এতদিন পর্য্যন্ত বাংলা হরফে মুদ্রিত অভিধানগুলির মধ্যে এই পুস্তকটিই আদিমতম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ফরষ্টার সাহেবের নিজেরও ধারণা ছিল যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং পরবর্ত্তী অভিধান-কারেরাও (যথা উইলিয়ম কেরী—১৮১৫-২৫, রামকমল সেন—১৮১৭-৩৪, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—১৮২৭, জন মেণ্ডিস—১৮২৮, জি. সি. হটন—১৮৩৩ প্রভৃতি) তাঁহাকেই এই সম্মান দিয়াছেন; ফলে, এখন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যতগুলি ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ফরষ্টারকৃত অভিধানটিই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম অভিধান বলিয়া উল্লিখিত হয়।

এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা ও ইউরোপীয় ভাষায় অভিধান সঙ্কলনের চেষ্টার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতে পড়িতে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্কল্পের পরিচয় মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ নাই। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার *The Origin and Development of the Bengali Language* পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় Augustin Aussant প্রণীত ফরাসী-বাংলা শব্দাভিধানের (১৭৮১-৮৩ খ্রীঃ) উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে *Calcutta Gazette*-এ একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক জন বঙ্গদেশবাসী উপযুক্ত লোককে একটি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের অনুরোধ জানাইতেছেন[৩]। অনুরোধের ধরণ দেখিয়া মনে হয়, তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ব্যবহারার্থ কোনও ইংরেজী-বাংলা অভিধানের প্রচলন ছিল না। সুবিখ্যাত রামকমল সেন তাঁহার *A Dictionary in English and Bengalee* (Serampore Press, 1834) পুস্তকের ভূমিকায় (p. 17) কিন্তু লিখিয়াছেন—

---

৩. "*Card.* The humble request of several Natives of Bengal. We humbly beseech any gentleman will be so good to us as to take the trouble of making a Bengal Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the Common Bengal Country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders; this favor will be gratefully remembered by us and our posterity for ever"—Seton Karr, *Selections form Calculta Gazettes*, vol. II, p. 497.

"In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary. In tracing the progress made, it appears that a Brahmin named *Rámrám Misra* was the first who made any considerable progress in the English language, but it is not known how he learnt it, or by whom he was taught. He himself taught several Baboos and amongst them *Ramnarain Misra*, a clerk to an attorney of the Supreme Court, who was considered to be a scholar and a great lawyer into the bargain, for he could draw up petitions, and knew the forms and practice of the pernicious system of law which has ruined almost every family of note in Calcutta, who were subject to its jurisdiction. By it he made his fortune, there not being his equal at the time. He afterwards kept a school, in which he taught a number of Hindoo youth, and received from them a monthly fee of from 4 to 16 Rs. each. Before his time however there was another individual named *Anondiram Doss*, who knew a still greater number of English words than *Ramnarain*. This man had a vocabulary or collection of words which was considered a treasure of English knowledge, and a number of young Hindoos used to attend daily upon him for hours and to wait his pleasure and convenience to get some scraps from his book. This pious philanthropist used to give out five or six words everyday for their study. A specimen of the words in Bengalee characters with their meaning is as follows.

লার্ড·········(Lord,)····················ইশ্বর।
গাড·········(God,) ইশ্বর।
কম ·········(To come,) আইশ।
গো ·········(To go,) জাও।
গোইন ······(Going,) জাইতেছি।

Ramlochun Napit, *Krishnamohun Bose* and some others also used to teach English in the same manner as many writers in public offices do to this day. Sometime after this, *Bhobani Dutt*, *Sibu Dutt*, and a few others were celebrated as complete English Scholars, among the Hindoos ; *Mr. Franco*, called *Panchico*, also opened a school about this time which was followed by another, kept by one *Aratoon Pitrus*, several of whose scholars are still living. At that time there were no other elementary books than *Thomas Dyche's* Spelling Book and School-master. The Arabian Nights and the tootee nameh came many years after ; those who could read any of these were reckoned learned men, and those who could run over the rules of Grammar at the end of the spelling books, were considered masters of the language."

উপরোক্ত অংশ বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম এই জন্য যে, এই সময়ের ইংরেজী শিক্ষার প্রচেষ্টার ইতিহাস অন্য কোথায়ও পাওয়া যাইতেছে না এবং দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও আর কিছু জানা যায় না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' ও 'সেকাল আর একালে' বাঙ্গালীর প্রথম ইংরেজী শিক্ষার যৎসামান্য ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি টমাস ডিস্, আরাটুন পিট্রুস, রামরাম মিশ্র ও কৃষ্ণমোহন বসুর উল্লেখ করিয়াছেন। *Bengal : Past & Present* এর দ্বাদশ ভ্যলুমে রামকিষণ মিশ্রের অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। ইহাঁদের কাহারও শব্দসংগ্রহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

Sir G. C. Haughton তাঁহার *A Dictionary, Bengali and Sanskrit,* (London, 1833) পুস্তকের ভূমিকায় (পৃঃ VII) লিখিয়াছেন, স্যার চার্লস উইলকিন্স বঙ্গদেশে অবস্থানকালে (১৭৭০-১৭৮৬ খ্রীঃ) তিনটি সংস্কৃতমূলক শব্দের তালিকা সঙ্কলন করেন ; তাহা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে[৪]।

উইলিয়াম কেরী মালদহের মদনাবতীতে অবস্থানকালে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বারমিংহামের মিঃ পি-কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাংলা ভাষার একটি অভিধান লিখিতে আরম্ভ করার কথা আছে[৫]। কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত কোয়ার্টো বাংলা-ইংরেজী অভিধানের মুদ্রণকার্য্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হইয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি এইগুলি ছাড়াও আর দুইটি বাংলা-ইংরেজী শব্দসংগ্রহের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। দুইটি পুস্তকই যে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বাংলাদেশেই মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কি অজ্ঞাত কারণে ফরষ্টার এবং পরবর্ত্তী অভিধান-কারেরা এই পুস্তক দুইটির সন্ধান পান নাই, অথবা সন্ধান পাইয়া থাকিলেও তাহার উল্লেখ মাত্র করেন নাই, তাহা ভাবিবার বিষয়। ইহার প্রথমখানি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়খানি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।* সুতরাং ফরষ্টারের অভিধান প্রথম বাংলা অভিধান হিসাবে এতকাল যে সম্মান পাইয়া আসিতেছিল, এখন হইতে ১৭৯৩ সালে ছাপা অভিধানটিকেই সেই সম্মান দিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে আমরা এই পুস্তকটি লইয়াই আলোচনা করিব। ইহার আবিষ্কারের একটু ইতিহাস আছে। প্রাচীন বাংলা মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীর প্রথম ভালুম ক্যাটালগের (১৮৮৮ খ্রীঃ) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় "Extensive Vocabulary of Bengali, English and Udiya. 2 vols. Calcutta, 1793" এই নামটি দেখিতে পাই। ফরষ্টারের প্রথমতম বাংলা অভিধানের কথা স্মরণ করিয়া '১৭৯৩'কে ছাপার ভুল বলিয়াই ধরিয়া লই। তথাপি ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীকে পত্র লিখি। উত্তরে জানিতে পারি, ভুল নয়, বইখানি

---

৪. "To his friend Sir Charles Wilkins thanks are due for the loan of three Ms. list of words collected during the course of that distinguished scholar's studies while resident in Bengal."

৫. "I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time ;"—*Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society* Vol. 1, Pt III, p. 223.

* দ্বিতীয় শব্দসংগ্রহটি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৬৪। আমরা ভবিষ্যতে এই পুস্তকটিরও বিস্তৃত আলোচনা দিতে চেষ্টা করিব। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, এখন পর্য্যন্ত বাংলা-ইংরেজী অভিধানগুলি বিদেশীয়দের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বাঙালী-রচিত সর্ব্বপ্রথম বর্ণানুক্রমিক বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম করিতে হয়। তাঁহার 'বঙ্গভাষাভিধান' ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই ছাপা, কিন্তু ক্যাটালগের নামে ভুল আছে। বইখানির নাম—"An Extensive Vocabulary, *Bengalese and English.*" *'and Udiya'* শব্দ দুইটি পুস্তকের মূল মালিকের হাতে লেখা ; তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য পুস্তকটিকে 'ইণ্টারলিফ' করিয়া দুই ভালুমে বাঁধাইয়া প্রত্যেকটি শব্দের ওড়িয়া প্রতিশব্দ হাতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যথাসময়ে ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত পুস্তকের টাইটেল পেজ, ভূমিকা ও অভিধান-অংশের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হয়। টাইটেল পেজ ও অভিধান পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই প্রবন্ধে মুদ্রিত হইল।[৬]

পুস্তকটির নাম—

ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি
An Extensive
Vocabulary,
Bengalese and English,
Very useful
To Teach the Natives English,
And
To Assist Beginners in Learning
The Bengal Language.
Calcutta,
Printed at the Chronicle Press.
M D C E X C III

ক্রনিকল প্রেসের নাম মাত্র আছে, গ্রন্থকারের অথবা মুদ্রাকরের কোনও নাম নাই। ক্রনিকল প্রেসের সূত্র ধরিয়া আমরা গ্রন্থকারকে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত সফলকাম হই নাই। গ্রন্থকার ভূমিকাতেও আত্মপরিচয়ের কোনও সূত্র ধরিয়া দেন নাই। ভূমিকাটি যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি।

PREFACE.

The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects ; but as it is the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the Publick. The Printer engages to furnish to every Purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared, gratis.

---

৬. ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত পুস্তকটির আরও একটু ইতিহাস আছে। ইহার মালিক ছিলেন Rev. Brooks, তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কটক হইতে *'An Oriya and English Dictionary'* প্রকাশ করেন। ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত ইংরেজী-বাংলা অভিধান হইতে বুঝা যায়, তিনি এইটিকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার ওড়িয়া অভিধান প্রণয়ন করেন।

সৌভাগ্যক্রমে, এই পুস্তকের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাই[৭], পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারেও ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই। টাইটেল পেজ, ভূমিকা ইত্যাদি না থাকাতে ইহা 'মিলার সাহেবের অভিধান (১৮০১)', এই ভুল নামে তালিকাভুক্ত হইয়া আছে[৮]। আশ্চর্য্যের বিষয়, হাতের কাছে এই পুস্তকের এতগুলি কপি থাকা সত্ত্বেও ইহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের নজর এড়াইয়া গিয়াছে। এই অভিধান সম্পর্কে আমরা সর্ব্বপ্রথম ১৩৪৩ সনের আশ্বিন সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে (পৃঃ ১৫৮১) উল্লেখ করি ও পরে কার্ত্তিক সংখ্যা শনিবারের চিঠির ৩২ ও ১৪৫-৬ পৃষ্ঠায় ইহার সামান্য পরিচয় প্রদান করি।

প্রথমটা আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, রামকমল সেনের ভূমিকায় উল্লিখিত 'আনন্দিরাম দাসে'র শব্দসংগ্রহই পরবর্ত্তী কালে 'ইংরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' নাম লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সন্দেহের সপক্ষে আমারা কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় *Calcutta Chronicle* নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। কলিকাতার ম্যাপ প্রস্তুতকারক সুবিখ্যাত A. Upjohn ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। ইঁহাদের অফিস ও ছাপাখানা ছিল ৮ নং লালবাজার। কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে ১৭৯২ ও ১৭৯৩ এই দুই সালের *Calcutta Chronicle* আছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রেসের নাম ছিল 'Calcutta Chronicle Press'; এই প্রেসটিই অভিধানের টাইটেল পেজে 'Chronicle Press' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এ. আপজন সাহেব Calcutta Chronicle (প্রেস ও পত্রিকা)-এর এক-ষষ্ঠাংশের মালিক ছিলেন। তিনি ১৭৯২ সালের গোড়ার দিক্ হইতেই দুরবস্থায় পতিত হন ও তাঁহার অংশ হস্তান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন। কলিকাতা গেজেটের সেটন-কার-কৃত সঙ্কলনে ও ক্যালকাটা ক্রনিকল সাপ্তাহিকের বিভিন্ন সংখ্যায় আপজন সাহেবের সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ে নানা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়[৯]। কিন্তু এই দুর্দ্দশার মধ্যেও আপজন সাহেবের অদম্য উৎসাহের অন্ত ছিল না; তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে, এই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার পত্রিকায় (Tuesday, March 20, 1792, Vol. VII, No. 322) বিজ্ঞাপন দিয়া বসিলেন,—

New Publications, In the Press, And speedily will be published, An Extensive, Vocabulary, Bengalese and English, Very useful to teach the Natives English and to Assist Beginners in Learning the Bengal Language. Those who wish for the works are requested to send their orders to Mr. Upjohn.

ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের/ সিখিবার কারন এক বহি অতি/ সিঘ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে/ক সাহেব লোকে বাঙ্গলা কথা/ সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে/ ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএ/ব সকল লোকের কেবাএত/ কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা/ইতেছে জে২ লোকে চাহে তা/হারা মেং আবজান সাহেবের/ ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক/ ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী/ তারিখ ১৯ মার্চ্চ সন ১১৯৮/ বাঙ্গালা তারিখ ৯ চৈত্র।

---

৭. বাংলা আলমারীর ১৪২ (জে) সংখ্যক বই।

৮. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকায় ২৩ নং বই।

৯. 'বেঙ্গল : পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট'-এর চতুর্দ্দশ ভালুমেও এ বিষয়ে অনেক খবর আছে।

এই বিজ্ঞাপনটিই ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৭৯৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বার বার বাহির হয়। "Price Twelve Rupees" এই অংশটিও কয়েক বার জুড়িয়া দেওয়া হয়। আপজন সাহেব নিজেই হউক অথবা অপর কাহাকেও দিয়া হউক, অভিধানটি সঙ্কলন ও মুদ্রণ করিতে থাকেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখের ক্যালকাটা ক্রনিকলের একটি বিজ্ঞাপনে অফিস ও প্রেস লালবাজার হইতে চিৎপুর রোডে Le Blanc এর গৃহে উঠিয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। আপজনের সহিত ক্যালকাটা ক্রনিকলের সম্পর্কও ওই সঙ্গে শেষ হয় এবং তৎপরেই ১৬ই এপ্রিলের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখিতেছি,—

Just Published,/ At the Chronicle Office, Chitpore Road,/ (Price fou Rupees,)/ ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি/ বোকেবিলরি/ An Extensive/ Vocabulary,/ Bengalese and English;/ very useful to Teach the natives English/ And/ To Assist beginners in learning the/ Bengal Language.

বারো টাকা হইতে চার টাকায় দাম নামিয়া আসাতে বোধ হইতেছে, পুস্তকটি প্রথমে যত বৃহৎ হইবে বলিয়া প্রকাশক আশা করিয়াছিলেন, ঠিক তত বড় হয় নাই। মনে হয়, সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তরণ ব্যাপারেই নানাবিধ গোলযোগ ঘটে এবং এই পুস্তক তেমন ভাবে প্রকাশ ও প্রচার না হওয়ার ইহাই সম্ভবতঃ কারণ।

এই অভিধান যাহার দ্বারাই সঙ্কলিত হইয়া থাকুক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক এ. আপজন ছাড়া আর কাহারও নামের সহিত এখনও ইহা যুক্ত করা যায় না। সুতরাং আপাততঃ ইহাকে ক্রনিকল প্রেসে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৬ এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে) ছাপা আপজনের ইংরেজী-বাংলা অভিধান বলিয়াই উল্লেখ করিতে হইবে।

পুস্তকটি প্রায় ডবল ক্রাউন ষোলপেজী সাইজের; টাইটেল পেজ ও ভূমিকা স্বতন্ত্র, মূল অভিধানের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৪৫। প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকে বাংলা ও ডান দিকে তাহার ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হইলেও ব্যঞ্জন বর্ণ পূর্ব্বে স্থান পাইয়াছে। ১-৩৯৩ পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক পর্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ, ৩৯৩-৪৪৫ পৃষ্ঠা স্বরবর্ণ। সকল শব্দ ঠিক বর্ণানুক্রমে সাজান নাই। শব্দ ছাড়া অনেক বাক্য ও বাক্যাংশও অনুবাদ-সমেত দেওয়া হইয়াছে।

এই অভিধানের শব্দগুলি ভাষাবিদের বিশেষ আলোচনার যোগ্য; অনেক শব্দ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত, অনেক শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম; দেশজ শব্দ অত্যন্ত বেশী; মুসলমানী শব্দও কম নয়। ফরষ্টারের অভিধান হইতে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত করিবার যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, এই অভিধানে তাহার কোনই চিহ্ন নাই[১০]। এই শব্দ বিচারের জন্যই এই প্রাচীনতম অভিধানটির সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই এই চেষ্টা হইলে শোভন হইবে।

---

১০. এই বিশুদ্ধীকরণ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোনও শব্দতাত্ত্বিক আলোচনা করেন নাই। ১৭৯৯ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রবলবেগে চলিয়াছিল এবং তাহার ফলেই বাংলা অভিধানে সংস্কৃত-প্রভাব অত্যন্ত বেশী হয়। কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

আমরা বারান্তরে ভাষা ও শব্দতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই পুস্তকের সাধ্যমত আলোচনা করিব। যে সকল শব্দ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত অথবা অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা আমরা সেই সঙ্গে প্রকাশ করিব। অক্ষরের নমুনা ও শব্দসঙ্কলনের ধরণ নমুনাপৃষ্ঠা হইতেই সম্যক্ বুঝা যাইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস।

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।* এই সকল প্রবন্ধে কবির কোন কোন কাব্যের—প্রধানতঃ হস্ত-লিখিত পুথি হইতে—পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিজ রামচন্দ্র সেকালের এক জন খ্যাতনামা কবি ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা তাঁহার সকল রচনার সন্ধান পান নাই। অন্য একটি ব্যাপারে অনুসন্ধান কালে আমি দ্বিজ রামচন্দ্রের অনেকগুলি মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি ; বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। এই গ্রন্থপঞ্জী তাঁহার চরিতকারের কাজে লাগিতে পারে।

(১) দুর্গামঙ্গলান্তর্গত 'গৌরীবিলাস'। পৃ. সংখ্যা ১৪০ + ১২৯ + ৩ (শুদ্ধিপত্র) + ৪ (স্বাক্ষরকারিদিগের নাম)।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই। ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে ; তন্মধ্যে ২ খানি কাঠখোদাই, ৪ খানি লাইন-এনগ্রেভিং। গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে—গৌরীবিলাস, তাহার পৃ. সংখ্যা ১-১৪০। দ্বিতীয় ভাগে—কঙ্কালীর অভিশাপ, তাহার পৃ. সংখ্যা ১-১২৯। প্রথম ভাগের শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

এত বলি পার্ব্বতী হানিল অসি দুর্গাসুরে।
পড়িল দনুজপতি পুষ্পবৃষ্টি সুরপুরে॥
দুর্গাসুর সংহারিয়া হৈল মার দুর্গা নাম।
কি কব নামের গুণ নাহি তার অনুপাম॥
ব্রহ্মহত্যা আদি করি পঞ্চম মহাপাতকী।
দুর্গা নামে মুক্ত হয় অশেষ আর নারকী॥
দুর্গানাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ এইত শুনিলা।
অতঃপর ইতিহাস কহি একাম্বর লীলা॥
কঙ্কালী জন্মিল শাঁপে গৌড়ে ভূপতি কন্যা।
দ্বিজ রামচন্দ্র কবি কহে শুনহ সুধন্যা— (পৃ. ১৪০)

ইহার পর দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ। ইহার পৃষ্ঠাঙ্কও পুনরায় ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থের নির্ঘণ্টটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

---

* (১) "দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য"—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১ম সংখ্যা, ১৩০৫।
(২) "দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়"—রমেশচন্দ্র বসু, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৫।
(৩) "দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত হরপার্ব্বতী-মঙ্গল"—দুর্গাদাস রায়, ২য় সংখ্যা, ১৩২৭।
(৪) "রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র"—শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০।

নির্ঘণ্ট পত্র

আলোচ্য গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র পাওয়া না গেলেও, গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ৭২)

(খ) গরিষ্ঠী সমাজধাম গোপাল মুখটি নাম।
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন　জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন
গৌরীগুণ করিল রচন ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ১১৩)

(গ) শ্রীকবি কেশরী নাম　নিজ হরিনাভিধাম
শ্রীদুর্গামঙ্গল রসগানে ॥ (২য় ভাগ, পৃ. ২)

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক (=১৮১৯ সন) এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :—

শশী ঋষি বেদশশী শকনর রায়।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ তারার ইচ্ছায়—

এই গ্রন্থ "শ্রীরামমোহন ধনীর" অর্থে মুদ্রিত। সমগ্র গ্রন্থ গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত, ইহাতে রাগ-রাগিণী দেওয়া আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন :—

পুস্তক প্রস্তুত করি ছিল অভিলাষ।
গায়ক দ্বারায় গীত করিব প্রকাশ ॥
অর্থ বিনা সে সকল না হয় পূর্ণিত।
শ্রীরামমোহন ধনী করিলেন হিত ॥
ছাপিলা পুস্তক করি নিজ অর্থব্যয়।
শ্রমসার্থকতা হয় গুণীগণে লয় ॥
নতুবা পড়িবে পুঁতি দশরা মসরা।
ভেড়ার শৃঙ্গেতে যেন হীরাধার ক্ষরা ॥

ধনী গুণী নিকটেতে প্রার্থনা আমার।
গাথকের দ্বারে কেহ করিলে প্রচার॥
অনুমতি রূপে নাম দিও স্থানে স্থানে।
রাজা রঘুনাথ যথা আছে চণ্ডীগানে॥
অন্নদামঙ্গল গানে কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ।
ভনিতার পূর্ব্বে নাম দিবা সেইরূপ—

গ্রন্থখানি ১৮১৯ সনে রচিত হইবার অল্পদিন পরেই মুদ্রিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। গ্রন্থের শেষে "স্বাক্ষরকারিদিগের নাম"-এর মধ্যে নীলমণি মল্লিক ও রামমোহন রায়ের নাম পাইতেছি; ১৮২১ সনে নীলমণি মল্লিক পরলোকগমন করেন, এবং ১৮৩০ সনে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।

'গৌরীবিলাস' ও তদন্তর্ভুক্ত 'কঙ্কালীর অভিশাপ' যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল এ সংবাদ ইতিপূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না। এই দুইখানি গ্রন্থের হাতে-লেখা পুথির কিছু খণ্ডিত অংশ শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য পাইয়াছেন। ১৩৪০ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তিনি 'গৌরীবিলাস' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত পুথিতে ১৪-১৫, ১৭-১৮, ২৬-৩১ পত্রগুলি নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সব স্থলের গল্পাংশের বর্ণনা তিনি দিতে পারেন নাই। আমরা মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সেই সেই অংশে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।—

১৪-১৫ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ২৬-২৯ পৃঃ)।

লক্ষ্মী কর্ত্তৃক নারায়ণের গলে বরমাল্য দান; দেবাসুরের পুনরায় সমুদ্র মন্থন; অমৃতকুম্ভ লইয়া সমুদ্র হইতে ধন্বন্তরির উত্থান; অসুরদের অমৃত গ্রহণে উদ্যোগ; বিষ্ণু কর্ত্তৃক মোহিনী স্ত্রীরূপ ধারণ এবং অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে অমৃত দান।

১৭-১৮ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ৩১-৩৫ পৃঃ)।

শিব কর্ত্তৃক কালকূট বিষ পান; শিবের মূর্চ্ছা; দেবতাদের ক্রন্দন; শিবানীর স্তব করিবার জন্য দেবগণকে বিষ্ণুর উপদেশ, দেবগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মময়ী শিবানীর স্তব; স্তবে প্রসন্ন হইয়া ক্ষীরোদ-তীরে তাঁহার আগমন; শিবের চেতনা লাভ; দেব ও অসুরগণের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান; সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা।

২৬-৩১ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ৪৯-৬০ পৃঃ)।

পিতামহের উপদেশে দেবগণ কর্ত্তৃক মদনের আহ্বান; শিবের ধ্যান ভঙ্গের জন্য মদনকে শিবসমীপে প্রেরণ; শিব কর্ত্তৃক মদন ভস্ম; রতি বিলাপ; শিবের অন্তর্ধান; হিমালয় কর্ত্তৃক উমাকে গৃহে আনয়ন; পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া উমার তপস্যায় গমন।

(২) দুর্গামঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তী। পৃ. সংখ্যা ৭৯।

শ্রীশ্রীদুর্গাঃ॥/ শরণং॥/ শ্রীশ্রীদুর্গামঙ্গলান্তর্গত নল দময়ন্তী নামক গ্রন্থ/ শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা পয়ারাদি / ছন্দে বিরচিত হইয়া/ শ্রীমাধবচন্দ্র ধর ও শ্রীরূপচাঁদ দে / ইহারদিগের অনুমতানুসারে/ কলিকাতা / জ্ঞানাঞ্জন যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল / এই পুস্তক যাহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তিনি / বটতলার দক্ষিণাংশে তত্ত্ব করিলে / পাইবেন ইতি॥/ সন ১২৬০ সাল তারিখ ১৩ ফালগুণ/

এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

দ্বিজ রামচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৩০৫ সালে 'দুর্গামঙ্গল' নামে প্রকাশ করেন। তিনি একখানি পুথি হইতে ইহা মুদ্রণ করেন; খুব সম্ভব এই পুথি মুদ্রিত পুস্তকের নকল। 'নলদময়ন্তী' যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ সংবাদ শাস্ত্রী মহাশয় জানিতেন না। তিনি তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, দ্বিজ রামচন্দ্র "সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন; সুতরাং এই কাব্যের অনেক স্থলে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের অনুকরণ করিয়াছেন। যে যে স্থানে অবিকল নৈষধচরিতের ভাব অপহরণ করিয়াছেন···।"

প্রকৃতপক্ষে 'নলদময়ন্তী'র পূর্ব্বেকার একটি মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্রে নৈষধচরিতের উল্লেখ কবি নিজেই করিয়াছিলেন। বেহারিমোহন দাস নামে এক ব্যক্তি এই সংস্করণের 'নলদময়ন্তী' পুথির আকারে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। মুন্‌শী আবদুল করিম এই পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

২৪৯। **নলদময়ন্তী**। এই পাণ্ডুলিপিখানিও মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া প্রস্তুত। আবরণ পত্রে লেখা আছে:— শ্রীহরিচরণ সার। নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী৺ দুর্গামঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তি উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তস্ত ম। শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া শীবাদহ নিবাসী শ্রীগোরাচাঁদ শেন দীং শীন্দুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।...

খক্করমিদং শ্রীবেহারি মোহন দাসস্য হক মালিক এই পুস্তক শ্রীযুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ মবিতে মাতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫ চৈত্র রোজ শনিবার ৬এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল।..."

ইহা হইতে আরও জানা গেল, ১৮৩৮ সনের কাছাকাছি 'নলদময়ন্তী'র একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

'নলদময়ন্তী'র শেষে কবি 'কঙ্কালীর অভিশাপে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

নল দময়ন্তী কথা করিলে শ্রবণ।
কলির নাহিক ভয় পাপবিমোচন ॥
অতঃপর বলি কঙ্কালীর অভিশাপ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ ॥

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'নলদময়ন্তী' পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাশ যে ইহা "দুর্গামঙ্গলান্তর্গত"। প্রকৃতপক্ষে 'গৌরীবিলাস,' 'কঙ্কালীর অভিশাপ' ও 'নলদময়ন্তী' এই তিনটি লইয়াই 'দুর্গামঙ্গল' পালা,—ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র ন্যায় 'দুর্গামঙ্গল'ও কোন একখানি পুস্তক-বিশেষের নাম নহে। পরে দেখা যাইবে, কবি তাঁহার 'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে' 'গৌরীবিলাসকে'ও 'দুর্গামঙ্গল' বলিয়াছেন।

(৩) অক্রুর সংবাদ। পৃ. ১১৬।

শ্রীশ্রীহরিঃ। / শরণং / শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত অক্রুর সংবাদ ॥/ নামক গ্রন্থ ॥ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবি কেশরী কর্ত্তৃক / অশেষ মহা [পদ্য ?] রচিত অক্রুর সংবাদ / মথুরা লীলা। / ইদানীং / শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসের

অনুমত্যানুসারে / কুমারটুলির শাস্ত্র প্রকাশ যন্ত্রে যন্ত্রিত / হইল। / এই পুস্তক যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা / কলিকাতার/ শোভাবাজারের বটতলার দক্ষিণাংশে/তত্ত্ব করিলে পাইবেন। / ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৭ চৈত্র মাস।/

কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক খণ্ড 'অক্রুর সংবাদ' আছে। পুস্তকের শেষে রচনাকাল—১৭৪৫ শক (=১৮২৩ সন) দেওয়া আছে :—

সাগরের পূর্ণশশী বাণ বেদ দশকে বসি
এই স্থানে গ্রন্থের বিশ্রাম ॥

(৪) আনন্দলহরী। ১৮২৪। পৃ. সংখ্যা ৬২।

শ্রীশ্রীদুর্গা।— / জয়তি— / শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যনিজকৃতা / আনন্দলহরী / শ্রীরামচন্দ্র।বিদ্যালঙ্কারকৃত স্বদীয়ার্থ সাধু / ভাষা সংগ্রহঃ / কলিকাতার কলুটোলার সমাচার / চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল / সন ১২৩১ সাল /

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। ইহাতে রূপচাঁদ আচার্য্য-ক্ষোদিত একখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। পুস্তকের আরম্ভে গ্রন্থকার নিজ পরিচয়স্বরূপ লিখিয়াছেন :—

হরিনাভি নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র দ্বিজাত্মজঃ।
আনন্দলহরী ভাষাং করোতি সুবোধায় চ॥ (পৃ. ✓০)

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় :—

আনন্দলহরী স্তবমধু সরসিজ ॥
ভাষায় করিল ব্যাখ্যা রামচন্দ্রদ্বিজ ॥
ইন্দু ইন্দুপিতা বেদ বাণ পরিমাণ।
এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান ॥ ১০২ ॥
ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তঃ সন ১২৩০ শাল।
তারিখ ২০ চৈত্র।

এখানে বলা প্রয়োজন, গ্রন্থকার হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহে,—ইনিই কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। জানা যাইতেছে, কবির উপাধি প্রথমে "বিদ্যালঙ্কার" ছিল।

(৫) মাধব মালতী। পৃ. সংখ্যা ১২২।

মাধব মালতী নামক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতং / ইদানীং / শ্রীগুরুচরণ ধরের কমলাসন যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ॥ / এই গ্রন্থ যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাহারা / মোকাম কলিকাতার আহিরীটোলার শ্রীযুত বাবু দুঃখিরামদের ১।১২ নম্বরের বাটিতে তত্ত্ব/ করিলেই পাইবেন ॥ / ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিখ ১৯ চৈত্র রোজ সোমবার।

কবির শেষ-জীবন শোভাবাজার-রাজপরিবারের আশ্রয়ে কাটিয়াছিল। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা করেন। কবি লিখিতেছেন :—

অথ গ্রন্থসূচনা।
পয়ার ॥
মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী।
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি ॥
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব।
যে সব বর্ণনা হয়ে নহে অসম্ভব ॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম।
সেইমত তাহার তাবত দেখি কর্ম্ম ॥
তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ।
সভাস্থের বিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবনবিখ্যাত ॥

মহাকবি বাণেশ্বর নন্দের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর ॥
শিশুরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম ॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ ॥
মান্তের কি কব যার উজিরত্ব পদ।
হুকুম আছিল যার করিবারে বধ ॥
বিলাতের বাদসাহ করিলে সম্মান।
গবর্ণরের ঘরে যিনি সদা চৌকী পান ॥
অধিকার হাতে গড় গঙ্গামণ্ডলাদি।
হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী ॥

রূপের তুলনা নাই মানে গোষ্ঠীপতি।
মুখ্য বিনা কর্ম্ম নাই তাহার সন্ততি ॥
তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ।
কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট ॥
পিতাতুল্য মান্ত নাম তাবত কর্ম্মেতে।
বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ার ধর্ম্মেতে ॥
দেবীবর বল্লালের যে বা ছিল ঘাটি।
কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি ॥
তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম।
নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব্বগুণধাম ॥
আদ্যাশক্তি কমলার কবিত্ব বিশেষ।
কবি রামচন্দ্রে প্রতি করিলা আদেশ ॥

গ্রন্থশেষে কবি 'মাধব মালতী'র রচনাকাল ১৭৫২ শক (=১৮৩০ সন) এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

চন্দ্র চন্দ্রযোনি চন্দ্রললাটবদন।
চন্দ্রহ্রাসবৃদ্ধি যাতে শক নিরূপণ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'মাধব মালতী' আছে।

(৬) হরপার্ব্বতীমঙ্গল। পৃ. ৩৩৯।

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ / জয়তি। / শ্রীহরপার্ব্বতী মঙ্গল / মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে ॥ / তৎসভাসদ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী / ভট্টাচার্য্য কর্তৃক রচিত ॥ / বিচার করিবে গুণ গুণি বিজ্ঞবর। / খলের স্বভাব দোষ দেখিতে তৎপর ॥ / পদ্মবনে ত্যজি মধু মৃণাল ভুজঙ্গ। / ভেক ভক্ষণের আশে তাহার আসঙ্গ ॥ / আহিরীটোলা নিবাসী। / শ্রীমাধবচন্দ্র ধর ও শ্রীরূপচাঁদ দের জ্ঞানাঞ্জন যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ /............[১২৫৮ সাল]

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড জীর্ণ 'হরপার্ব্বতীমঙ্গল' আছে। আখ্যাপত্রে প্রকাশকালটি পড়া যাইতেছে না, কিন্তু ইহা যে ১২৫৮ সাল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। ইহাতে একখানি কাঠখোদাই চিত্র আছে।

এই মহাকাব্যখানিও কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আদেশে রচিত। 'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র আখ্যাপত্রে কবি নিজেকে কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের "সভাসদ" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে' কবির "আত্মপরিচয়" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

ত্রিপদী ॥

জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ, মেদনমল্ল অনুরাগ,
অধিপতি ছিল মদন রায়।
নিজে মামারক গাজী, আপনি হইয়া রাজী,
বনমাঝে দেখা দিলা তাঁয় ॥
সঙ্গেতে সহায় হৈয়ে, নবাবে স্বপন কৈয়ে,
সিরপা পাইল জমীদারী।

দত্ত কুল সমুদ্ভব, গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব,
কায়স্থ কুলের অধিকারী।
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ,
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব, জমীদারী তাহে দর্ত্ত,
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ॥
সহায় আনন্দময়ী, সর্ব্বাংশে হইলা জয়ী,
শ্রীমতী শ্রীমতী যার রাণী।
করিয়া সমাজস্থান কত ভূমি কৈলে দান,
বারুইপুরেতে রাজধানী॥
তস্য পুত্র গুণধাম, শ্রীকালীশঙ্কর নাম,
অল্পকালে হৈলা লোকান্তর।
তস্য পুত্র মহাশয়, শ্রীরাজবল্লভ রায়,
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর॥
শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্যবরা, অবিবাদে পালে ধরা,
গাম্ভীর্য্যতে রঘুপতি রাম।
অধিকার ইংরাজী, কেহ করি কারসাজী
কিছু গ্রাম করায় নিলাম॥
তার মধ্যে বাসস্থান, হরিনাভি সমাখ্যান,
কিনিলেন দুর্গারাম কর।
নহেন সামান্য ব্যক্তি, গুরু দেব দ্বিজে ভক্তি,
কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর॥
উভয়ত গুণযোগী, কিন্তু যার বৃত্তিভোগী,
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুন।
কবীন্দ্র মাতাম কুল, ইষ্ট যার অনুকূল,
পিতৃপরিচয় কিছু শুন॥
মুখটী বিখ্যাত কুলে, মেলবন্ধ যার মূলে,
শঙ্করের তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ,
আদান প্রদানে সম ভাল॥
তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে দ্বিজ
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি, তাহাতে সন্তান চারি,
রামধন তৃতীয় সন্তান॥
তদঙ্গজ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণারবিন্দ,
একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি।
বিনোদরাম সুতাসুত, রচিল বিনয়যুত,
সংপ্রতি নিবাস হরিনাভি॥

উপরি উদ্ধৃত অংশের এক স্থলে কবি নিজেকে বিনোদরাম তর্কপঞ্চাননের "সুতাসুত" অর্থাৎ দৌহিত্র বলিতেছেন। শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কবির মাতামহকুলের যে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্ভুল নহে বলিয়াই মনে হইতেছে।

কবি বারুইপুরের রাজবল্লভের আদেশে 'হরপার্ব্বতীমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন :—

বারুইপুরেতে বাস, শ্রীরাজবল্লভ দাস,
আদেশিলা রচিতে মঙ্গল।
রামচন্দ্র বিরচিত, শ্রীহরপার্ব্বতী গীত,
নায়কেরে করিবে কুশল॥

'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র এক স্থানে কবি 'দুর্গামঙ্গলে'র বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। এই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

অতঃপর যে যে কথা, শ্রীদুর্গামঙ্গল যথা,
করিয়াছি তাহাতে রচনা।
হিমালয়ে সতীর জন্ম, কামদেব ভস্ম কর্ম্ম,
পার্ব্বতীর শিব আরাধনা॥
মিলন হইল উভে, হরগৌরী বিভা শুভে,
উভয়ের কাশীতে প্রস্থান।
গিরি ঘরে গৌরী আনি, আসিয়া পিনাকপাণি,
কৈলাসশিখরে শেষে যান॥
স্তব কৈল দিবিষদ, তারকাসুরের বধ,
গণেশ কার্ত্তিক জন্মাইয়া।
বিরচিল রামচন্দ্রে, অশেষ প্রকার ছন্দ,
দেখিবেন উভে মিলাইয়া॥ (পৃ. ৬১-৬২)

(৭) শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক।

পাদরি লঙের মতে ১৮২০ সনে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পরবর্ত্তী সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে, তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। / শরণং / শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক। / অর্থাৎ / শাতাতপ মুনিকর্তৃক সংগ্রহ / মহাপাপ ও অতিপাপ / ও সামান্য পাপকারি মনুষ্যদিগের/জন্ম জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন যে সকল রোগ / উদ্ভব হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত/ বিবরণ। / তত্ত্বার্থ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা / সংগৃহীত হইয়া। / ইদানী / শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকারের অনুমত্যানুসারে / শ্রীরামপুর / জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দা ১৭৭৬ / [পৃ. সংখ্যা ৬১]

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতেও এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

(৮) কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক। ১৮২৮। পৃ. ৭৮।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে :—

GOPINATHA CHAKRAVARTI. কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীযুক্ত কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান। [*Kautukasarvasva nataka.* A Sanskrit play, with intervening portions appearing in a Bengali version in prose and verse by Ramachandra Tarkalankara.] pp. 78. ১২৩৫ [Calcutta ? 1828.] 8°.

পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও (পৃ. ৭৫) পাইতেছি :—

Kautuk Sarbasa Natak, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra **Tarkalankar** of Harinabhi.

(৯) চন্দ্রবংশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রবিহীন এক খণ্ড 'চন্দ্রবংশ' আছে ; তাহার পৃ. সংখ্যা ৪+১৪৪। এই পুস্তকের রচনাকাল ১৭৫০ শক (=১৮২৮ সন) শেষ পৃষ্ঠায় এই ভাবে দেওয়া আছে :—

শুন ভাই পুণ্যবান ভারতের উপাখ্যান
রসিকজনের রসলভ্য।
মৈত্র বাণ শূন্য ডাকে সমাপন ঐ শাকে
কহে রামচন্দ্র কবিসভ্য॥

গ্রন্থসূচনায় কবি তাঁহার বংশ-পরিচয় দিয়াছেন ; এই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

মুখটী বিখ্যাত কুলে মেলি বন্ধ যার ফুলে
ছোট্ ঠাকুর কানাই আছিলা।
গঙ্গানন্দে কৈলা ত্রাণ ছলে কন্যা নিয়া দান
সারূপ্য তাহাকে পদ দিলা॥
কি আর বিস্তর কব তস্য বংশে সমুদ্ভব
মুখটী গোপাল ভঙ্গ নিজ।
তস্য পুত্র রামধন দৌহিত্র যা ার হন
কামদেব সার্ব্বভৌম দ্বিজ॥
রামধন সুত তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন
বিনত্রাম তনয়া নন্দন।
নিবসতি হরিনাভি উমা পাদপদ্ম ভাবি
কাব্য কিছু কহিব বচন॥

ইহার পর কবি এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্ব ন্ধ লিখিয়াছেন :—

শুন ভাই সর্ব্বজন চন্দ্র বংশ বিবরণ
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি সার
নহুষের অবতংশে জন্ম যার চন্দ্রবংশে
যযাতি ভূপতি নাম যার।
কব কাব্য আদ্যরস যাহাতে রসিক বশ
কাল গুণে আদর অধিক।
ভক্তি মুক্তি রসপ্রতি অনেকে না লয় মতি
দেখিলাম প্রায় চারি দিক।

কিন্তু পূর্ব্ব কবি যারা   প্রকাশ করেছে তারা
আদ্য রস সংস্কৃতে গুপ্ত।
সাহিত্য নাটক যত   প্রায় হইয়াছে হত
ইংতে সংস্কৃত রস লুপ্ত॥
ভাষায় কিঞ্চিৎ করা   অনেকের মন হরা
গুণি জনে না ধরিবে দোষ।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয়   যদ্যপি অগ্রাহ্য হয়
বিচক্ষণে পাইবে সন্তোষ॥

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। তাহার প্রকাশকাল ১৮৪১ সন; পৃ. সংখ্যা ৪+১২৩।

(১০) আচাব-রত্নাকর। ১৮৪১।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে মুন্‌শী আবদুল করিম লিখিয়াছেন :—

৪৩১। আচার-রত্নাকর। ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে অরুণোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার কথিত হইয়াছে। আবরণে লেখা আছে :—"শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ইদানীং শিবাদহের শ্রীপীতাম্বর সেন দীং সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৮ সাল। ('বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৮)

(১১) কালীপুরাণ। ১৮৪৮। পৃ. সংখ্যা ৪+২৭৫।

শ্রীশ্রীদুর্গা / শরণং / মূল কালীপুরাণ। / অর্থাৎ / কামাখ্যা বর্ণন এবং ভগবতী পূজা ইত্যাদি / বহুবিধ প্রকরণ আছে। / বক্তা মহামুনি ঔর্ব্ব গোস্বামী॥ / শ্রোতা সূর্য্যবংশোদ্ভব সগর রাজা॥ / তদ্ভাষা / শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক / বিরচিত হইয়া / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের / কলিকাতা / সারসংগ্রহ যন্ত্রাক্ষরৈর্ম্মুদ্রিতা। / এই পুস্তক যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক মোং / শোভাবাজারের বটতলার উত্তরাংশে উক্ত যন্ত্রালয়ে / পাইবেন ইতি / সন ১২৫৫ সাল। /

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'কালীপুরাণ' আছে। গ্রন্থশেষে ইহার রচনাকাল ১৭৫৬ শক (=১৮৩৪ সন) এই ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ ব্যাসের বচন।
ভাষা করি রামচন্দ্র করিল রচন॥
মুখটি বিখ্যাত কুলে হরিনাভী বাস।
পয়ার প্রবন্ধে রচি ব্যাসের আভাষ॥
রসবাণ সমুদ্র পশ্চাত সুধাকর।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ শক নৃপবর॥

গ্রন্থারম্ভে কবি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে শোভাবাজার-রাজবংশের পরিচয় দিয়া জানাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থও কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে রচিত। আমরা এই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

নিবাস জাহ্নবী তীর করিনাত্তী গ্রাম।
সমাজ কায়স্থ দ্বিজ কত কব নাম॥
মেলি বঙ্গ ফুলেতে মুখুটি অবদাত।
অধুনা উপাধি তর্কালঙ্কার বিখ্যাত॥
পূর্ব্বে কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচনা।
বহু রস বহু ছন্দে তাহার সূচনা॥
গৌরীর বিলাস নল দময়ন্তী কথা।
মাধব মালতী চন্দ্র বংশোদয় গাঁথা॥
কৌতুক সর্ব্বস্ব হরপার্ব্বতী মঙ্গল।
আনন্দলহরী ভাষা আচার সকল॥
কর্ম্ম বিবেকার্থ আর আছয়ে অনেক।
অক্রূর সম্বাদ ষষ্ঠী সিতলা কতেক॥
করেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান।
সংপ্রতি রচিব ভাষা কালীকা পুরাণ॥
বিক্রমআদিত্য তুল্য নবকৃষ্ণরাজ।
নবরত্ন সম যার।পণ্ডিত সমাজ॥
তাহার তনয় রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।
রূপে গুণে দয়া ধর্ম্মে তাবতে প্রচুর॥
তাহার তনয় অষ্ট সবে বিলক্ষণ।
শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কালীকৃষ্ণ মধ্যম বর্ণনে বর্ণ হারে।
শাপে সুরপতি অবতীর্ণ এ সংসারে॥
শান্ত ধীর দেবীকৃষ্ণ নামেতে তৃতীয়।
চতুর্থ অপূর্ব্বকৃষ্ণ সর্ব্বজনপ্রিয়॥
পঞ্চম মাধবকৃষ্ণ বিজ্ঞ গুণবান।
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ষষ্ঠ উপেন্দ্র সমান॥
সপ্তম নরেন্দ্রকৃষ্ণ মদন মুরতি।
যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ নাম অষ্টম সন্ততি॥
কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণসখ দেওয়ান বাটীর।
সসম্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর॥
বৃহস্পতিতুল্য সভাপণ্ডিত শ্রীকান্ত।
মধ্যমের গুণ বলি ধীর দয়া শান্ত॥
সুশীল পণ্ডিত সুকুমার অনুপম।
ক্ষমা ধৈর্য্য দয়াশীল ধার্ম্মিক উত্তম॥
সভাসত রামচন্দ্র আজ্ঞা দিল তারে।
কালিকা পুরাণ ভাষা গীত রচিবারে॥
সেই বাক্য অনুসারে হইল রচিত।
সম্প্রতি ছাপার গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত॥
রচিব মানস আরো যদি আয়ু পাই।
নিবেদন মাগি কিছু সাধুজন ঠাঁই।
কিবল পয়ারচ্ছন্দ রচিত প্রচুর।
অন্য ছন্দে রচিলে ভাবার্থ হয় দূর:
এই হেতু যথার্থ মূলের সহ ঐক্য।
রচিয়াছি বিজ্ঞগণে করিবে কটাক্ষ॥
যদি তায় থাকে দোষ কর মোরে ক্ষম।
আছয়ে শাস্ত্রের কথা মুনি মতিভ্রম॥
অতএব কর কৃপা কটাক্ষাবলোকন।
কবি রামচন্দ্রে এই বরে নিবেদন॥

উপরের উদ্ধৃত অংশে কবি তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ‘গৌরীবিলাস’ হইতে ‘অক্রূরসংবাদ’ পর্য্যন্ত গ্রন্থের নাম ছাড়া ষষ্ঠী ও শীতলা সম্বন্ধেও গ্রন্থরচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে; বোধ হয় ইহা ষষ্ঠীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ‘অমরভাষা’ বা অমরকোষের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আয়ুতে কুলাইলে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিতেও তাঁহার বাসনা ছিল দেখা যাইতেছে। কিন্তু ‘কালীপুরাণে’র পরে তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে-সম্বন্ধে কোন সংবাদ এ যাবৎ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতেও এক খণ্ড ‘কালীপুরাণ’ আছে, তাহার প্রকাশকাল ১২৭২ সাল।

‘কৌতুকসর্ব্বস্ব’ ও ‘আচার-রত্নাকরে’র কথা বাদ দিলে, কবির প্রায় সকল গ্রন্থই আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু ‘গৌরীবিলাস’ ও ‘আনন্দলহরী’ ছাড়া সেগুলি মূল সংস্করণের

পুস্তক নহে,—কবির মৃত্যুর * পর প্রকাশিত প্রধানতঃ বটতলার সংস্করণ। এই কারণে সেগুলির সাহায্যে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল পাইবার উপায় নাই। † তবে 'নলদময়ন্তী,' 'কর্ম্মবিপাক' ও 'চন্দ্রবংশ' যে ১৮৩০ সনের পূর্ব্বেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮২৯ সনে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকায় এই তিনখানি পুস্তক পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত বলিয়া সংবাদপত্রে উল্লেখ আছে। ‡

দ্রষ্টব্য

এই প্রবন্ধের অধিকাংশ মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের এক খণ্ড 'নলদময়ন্তী' পাওয়া গিয়াছে। ইহা ১২৩৪ সালে (১৮২৭ সনে) প্রকাশিত সংস্করণের পুস্তক। ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীপরমেশ্বর / শরণং। / **নলদময়ন্তী** উপাক্ষ্যণ। / অর্থাৎ / শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কত্রিক অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাজ্যশ্চ্যুত / এবং / কলিপরিত্যাগানন্তর পুনঃরাজ্যাভিশিক্ত। / কলিকাতা। / মহেন্দ্রলাল প্রেসে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শাঁখারিটোলা / ১২৩৪ / [পৃ. সংখ্যা ২+৯২]

এই 'নলদময়ন্তী'খানি প্রথম সংস্করণের পুস্তক বলিয়াই মনে হইতেছে।§

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* "ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম। রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার প্রথমা পত্নী গৌরীমণি দেবী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দ্বারিকানাথ মিলিয়া তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করেন; সুতরাং বুঝা যায়, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র মারা যান।"—"রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র"—শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০, পৃ. ১১৪।

† মুন্শী শ্রীআবদুল করিম 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫-৯৬) 'মাধব মালতী'র একখানি পুথির সন্ধান দিয়াছেন।

‡ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

§ ১৩৪৪।২৭এ আষাঢ়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

"বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ"

(আলোচনা)

এই নামে একটি প্রবন্ধ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এই প্রবন্ধে ১৮১৬ সনে রামচন্দ্র-বিরচিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' নামক ইংরেজী ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

(১) গ্রন্থকারের নাম শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহার উপাধি কি ছিল, জানা যায় নাই ;

(২) রামচন্দ্র···"ইঙ্গলিষশাস্ত্রাভিলাসি বঙ্গদেশনিবাসি মহাশয়েরদিগের অনায়াসে ঐ শাস্ত্রের রীত্যবধারণ কারণ" ইংরাজী ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন।

লেখকের এই দুইটি উক্তি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে ; সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

(১) 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ'-রচয়িতা "রামচন্দ্র" কে ছিলেন, তাঁহার উপাধিই বা কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন :—

> শ্রীযুত কাম্পেনী বাহাদুরের সম্পর্কীয় কার্য্য সচিব বিবিধবিদ্যানিধান শ্রীমান জান মষ্টর John Master. সাহেবের উপদেশক্রমে সেই ভূপাল চূড়ামণির সামদান দণ্ড ভেদ ইত্যাদি যন্ত্র নির্ম্মাণের আবেশনাধ্যক্ষ নানাশাস্ত্র বিশারদ বিশ্বকর্ম্মা শ্রীযুত ডাক্তর বিলেম কেরী Dr. W. Carey. সাহেবের প্রধান সর্বাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনুসেবক শ্রীরামসেবক কর্ত্তৃক দূরস্থ ইঙ্গ্লিষ বিদ্যা সামীপ্যকারক ইঙ্গ্লিষ দর্পণ নামে দূরদর্শক অর্থাৎ দূরবীন নির্ম্মিত হইল—

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "অনুসেবক" রামচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহকারী পণ্ডিত রামচন্দ্র রায়। এই কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর উইলিয়ম কেরী এবং প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।* রামচন্দ্র রায় ১৮০৩ হইতে ১৮১৬ সন পর্য্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ সনে প্রকাশিত রোবাকের (Roebuck-এর) *The Annals of the College of Fort William* পুস্তকের পরিশিষ্টে (পৃ. ৫০) বাংলা বিভাগের পণ্ডিতগণের মধ্যে রামচন্দ্র রায়ের নাম আছে, এবং তিনি যে ১৮০৩ সনে কলেজে পণ্ডিতী কর্ম্মে প্রথম বাহাল হন, তাহারও উল্লেখ আছে।

জন্ মাষ্টারের উপদেশক্রমে রামচন্দ্র 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' রচনা করেন। এই জন্ মাষ্টার এক জন সিভিলিয়ান ; দেশীয় ভাষা—বিশেষতঃ বাংলা শিখিবার জন্য ১৮১৩ সনের ২০ নবেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন এবং পর-বৎসর জুন মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। † খুব সম্ভব, রামচন্দ্র তাঁহাকে বাংলা পড়াইয়াছিলেন।

---

* বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠী ছিল ; সেখানে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত।—William Ward : *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos*, iv. 495 (3rd ed., 1820.)

† Roebuck : *Annals of the College of Fort William*, Appendix, p. 68.

এই সকল কারণে রামচন্দ্র রায়কেই 'ইঙ্‌লিষ দর্পণ'কার বলিয়া আমি মনে করি।

(২) ১৮১৬ সনে প্রকাশিত রামচন্দ্রের 'ইঙ্গ্‌লিষ দর্পণ'ই যে বাংলা ভাষায় "প্রথম" ইংরেজী ব্যাকরণ, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না; কারণ, ঠিক এই বৎসরেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-রচিত আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। আমি তাহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

A / Grammar, / in / English and Bengalee : / containing / what is necessary to the knowledge / of the / English Tongue. / To which is added / a / Translation of Words / from / one to three Syllables, / laid down in a plain and familiar way. / By Gungakissore, Bhutachargee. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. / [পৃ. সংখ্যা ২১৬]

এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর লিখিতেছেন :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

প্রতুলকর্ত্রী

এতদ্দেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরব্ধ করিয়া অত অল্প কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছল্য এবং অশ্রেদ্ধা জন্মে তাহার কারণ এই অভিপ্রায় হয় যে বালকত্ব ধর্ম্ম হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মোনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকরণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনেরা দেন তাহা মোনে রাখিতে পারেণ না অতএব শুৎরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক মনুষ্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠীন্ এবং শ্রম সাধ্য হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি শুসাধ্য হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল…।

শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন
পরোপকৃতয়ে কৃতঃ—

দেখা গেল, ১৮১৬ সনে বাংলা ভাষায় দুইখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; তবে কোন্‌খানি আগে এবং কোন্‌খানি পরে, তাহা আপাততঃ জোর করিয়া বলা যাইতেছে না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-বার্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

তারিণীচরণ মিত্র—'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট'। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত তারিণী-চরণ মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৫। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২, মোহন-বাগান রো, কলিকাতা।

১৮০৩ সালে জন গিলক্রিস্টের তত্ত্বাবধানে 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' নামে হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত ও রোমান অক্ষরে প্রকাশিত কতগুলি গল্পের বঙ্গানুবাদ অংশের বঙ্গাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।

বি. ভি. দাসগুপ্ত—Govinda's Kadcha : A Black Forgery. ১০, দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন রোড হইতে এম. এন্. দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গোবিন্দ কর্ম্মকারের নামে প্রচলিত গোবিন্দদাসের কড়চা নামক গ্রন্থের অর্বাচীনতা ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন।

প্রবন্ধ

শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য—সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যপ্রকাশ। বঙ্গশ্রী, চৈত্র '৪৩, পৃ: ৩৬৯-৩৭৪।

কাব্যপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থের প্রতি উল্লাসের সংক্ষিপ্তসার।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য—চণ্ডীদাসের কথা। বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন '৪৩, পৃ: ১৮৮-৯২।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামক গ্রন্থের অসারতা ও অর্বাচীনতা প্রতিপাদন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মঙ্গলোদয়। প্রবর্ত্তক, চৈত্র '৪৩, পৃ: ৬০৪-৫।

[বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস প্রবন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪২।৭) উল্লিখিত]

১২৬৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত মঙ্গলোদয় নামক সাপ্তাহিক পত্রের ১৪শ সংখ্যার বিবরণ।

শ্রীপ্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—অন্ধ কবি ৺কেনারাম নন্দী। প্রবর্ত্তক, চৈত্র '৪৩, পৃ: ৬৪৮-৯।

শতবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের অন্তর্গত চাতরা নামক স্থানে প্রাদুর্ভূত কেনারামের কবিত্বের পরিচয়।

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য—শিলচর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হস্ত-লিখিত পুঁথির তালিকা। শিক্ষাসেবক, মাঘ '৪৩, পৃ: ১০১-১২।

বিষয়বিভাগানুসারে সজ্জিত বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথিগুলির তালিকা ও স্থলবিশেষে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—তামাকুমাহাত্ম্য। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৭৮-২৮১।

রামপ্রসাদ নামক এক কবির রচিত তাম্রকূটের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণাত্মক ক্ষুদ্র বাংলা কাব্যের ১২০৮ সনে লিখিত পুঁথির সংস্করণ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। শনিবারের চিঠি, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৫৩৭-৬৬।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তারিণীচরণ মিত্রের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৬৯১-৯৯।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ—টেক্‌নিকের অনুরূপ বাঙ্গালা। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৪২২-৩।

টেক্‌নিক শব্দের তাৎপর্য নির্দেশপূর্বক সম্পাদনা-শিল্প এই বাংলারূপ নির্ধারণ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬৩১-৫।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কলিকাতা শোভাবাজারের কালীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত।

এম, আশরফ হোসেন—শ্রীহট্টের নাগরী সাহিত্য। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১।৯৭-৯, ১১৮-২৫।

সিলেটী নাগরীতে প্রচারিত সাহিত্যের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১।১০০-১১১।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশিত ও তৎকালে সমাদৃত এই পুস্তকের বিস্তৃত পরিচয়।

ইতিহাস

প্রবন্ধ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৮৬-৮।

সঙ্গীতের উৎপত্তিসম্বন্ধে ভারতীয় মত নির্দেশ ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রবর্তক ভরতের মতানুসারে শার্ঙ্গদেব কর্তৃক রচিত অর্বাচীন গ্রন্থ 'সঙ্গীতরত্নাকরে'র পরিচয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—ভারতীয় চিত্রকলার দ্বৈতরূপ। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৩২-৪০।

ভারতীয় চিত্রকলায় স্বাভাবিকতার নিদর্শন নিরূপণ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মন্—মালদহে দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কার। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬৩৮-৪০।

মালদহের জাজিলপাড়া গ্রামে নবাবিষ্কৃত এই তাম্রশাসনের পরিচয়।

মুহম্মদ এনামুল হক—বঙ্গে ইস্‌লাম বিস্তার। মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৬৩-৭০, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৩২১-৮।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সমস্ত ধর্মপ্রচারক বাংলায় ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—পিতাপুত্র। প্রবাসী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৫০৯-১৮।

বাঁটোয়ারার পর হইতে বিষয় সম্পত্তি ও দেনাপাওনা সম্বন্ধে রামকান্ত রায় ও জগমোহন রায় যে রামমোহন রায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিলেন, সরকারী চিঠিপত্র, জগমোহন রায়ের দস্তখতী চিঠিপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র সাহায্যে তাহা প্রতিপাদন।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৬৮৪-৯২।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ওরফে হরিহরানন্দনাথের সহিত রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিবরণ।

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ—মহারাজ দিব্য। প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮৩৭-৪৩।

বঙ্গের পালবংশীয় রাজা মহীপালের সময় আবির্ভূত দিব্য বা দিব্বোকের পরিচয় ও কৃত কার্যের বিবরণ।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ—দাবা খেলার ইতিহাস। বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ২২৭-৩২।

'চতুরঙ্গদীপিকা' নামক সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে চতুরঙ্গক্রীড়ার বিবরণ ও ইহা হইতে বিভিন্ন দাবা-খেলার উৎপত্তি আলোচনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন—প্রাচীন ভারতে ব্যবহারশাস্ত্র। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮১; ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৩৭৩-৭।

সংহিতা গ্রন্থে নির্দিষ্ট ব্যবহার বা মোকদ্দমার পদ্ধতি ও বর্তমান পদ্ধতির তুলনা মূলক আলোচনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের প্রত্নসম্পদ্। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৫৭২-৬।

বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটী প্রাচীন মূর্ত্তির বিবরণ।

দর্শন

গ্রন্থ

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বেদান্তচন্দ্রিকা। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৪। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

১৮১৭ সনে প্রথম প্রকাশিত বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক গ্রন্থের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।

প্রবন্ধ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র—বাঙ্‌লার বাউল ও সহজিয়া সাধন। প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৫০৯-১২। বাউল। বিচিত্রা, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ২৯১-৩০১।

সহজিয়া সাধনের প্রকারভেদ ও মূল তত্ত্বনির্দেশ।

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী—কঠোপনিষদের প্রতিপাদ্য। প্রবর্ত্তক, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৩৯৫-৮।

কঠোপনিষদে অদ্বৈতবাদের ও জগন্মিথ্যাত্ববাদের কোনও সূচনা পাওয়া যায় না—পক্ষান্তরে ভক্তিবাদের আভাস পাওয়া যায়, এই মত প্রতিপাদন।

শ্রীশশিভূষণ দাস গুপ্ত—ভক্তিধর্মের বিবর্ত্তন। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৪৯৭-৫০৪।

ভাগবত তথা চৈতন্য-প্রচারিত ভক্তিবাদের উপর দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বর্তমান, এই মত প্রতিপাদন।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু—প্রজ্ঞানের প্রগতি (৩)। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৫২৫-৫৩৪।

সক্রেটীস ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ—বার্কলীর দর্শন। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬১৭-৮।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্কলীর মতবাদের বিবৃতি।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—'স্বপ্ন' কি? বিচিত্রা, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ২৮৩-৮।

স্বপ্নের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীঅনিলবরণ রায়—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। বিচিত্রা, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ১৫৭-৬০।

গীতোক্ত আলোচ্য উক্তিটির তাৎপর্যনির্দেশ।

বিজ্ঞান

প্রবন্ধ

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত—বঙ্গদেশের ভেষজ উদ্ভিদ্। প্রকৃতি ১৩।২৪৯-৬৪, ৩৩২-৪৫।

প্রবন্ধে উদ্ভিদ্গুলির বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম, প্রকৃতি, ঔষধে ব্যবহৃত অংশ, বাসস্থান ও ব্যাবহারিক গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীসুনীলবিহারী সেনগুপ্ত—ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা। প্রকৃতি, ১৩,২৮৯-৪।

বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক কৃত গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহা—স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ। প্রকৃতি, ১৩।২৯৪-৯৯।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিবরণ।

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী—কৃষিকার্য্য-পরিচালনার আধুনিক প্রণালী। প্রবাসী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৪৯৯-৫০৩।

শস্যক্ষেত্রে জলসংগ্রহ ও জলনিষ্কাশন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা।

শ্রীনীলরতন ধর—ভারতে কৃষির উন্নতি। প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮০৩-৬।

ভারতে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক উপায় নিরূপণ।

শ্রীসহায়রাম বসু—কাষ্ঠধ্বংসী ছত্রাক 'পলিপোর'। প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮০৬-৮১০।

এই ছত্রাকের পরিচয় ও উহার আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ।

শ্রীকমলেশ রায়—জড় ও শক্তির রূপ। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬২১-৬২৬।

জড় ও শক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদের দিগ্দর্শন।

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যার 'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান' প্রবন্ধে (পৃ. ১৬৩-৭০) কয়েকটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে সংশোধন দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৩	২২	'বাঙ্গালা পোর্ত্ত গীস'	'বাঙ্গালা-পোর্ত্তুগীস'
১৬৪	১	'Bengal'	'Bongal'
১৬৪	২৮	'gentleman'	'gentlemen'
১৬৪	৩২	'Seton'	'Seton-'
১৬৪	৩৩	'form Calculta'	'from Calcutta'
১৬৫	২০	'লার্ড'	'লাড'
১৬৫	২৭	'Sibu'	'Siboo'
১৬৫	৩২	'tootee nameh'	'Tooteenameh'
১৬৬	২৪	'list'	'lists'
১৬৭	২০	'E'	'C'
১৬৭	৩৪	'ইংরেজী-বাংলা'	'বাংলা-ইংরেজী'
১৬৮	১১	'আমারা'	'আমরা'
১৬৮	২৮	'works'	'work,'
১৬৮	৩২	'মার্চ্চ'	'মার্চ'
১৬৮	৩২	'বাঙ্গালা	'বাঙ্গলা'
১৬৯	৮	'fou'	'four'
১৬৯	২২-২৩	'ব্যঞ্জন বর্ণ'	'ব্যঞ্জনবর্ণ'